শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

স্বামী সারদানন্দের জীবনী

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

স্বামী সারদানন্দের জীবনী

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-রচয়িতা স্বামী সারদানন্দ প্রায় আটাশ বৎসর পূর্বে দেহরক্ষা করেন। তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা-মাতার অন্তরঙ্গ সেবক এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আজীবন সম্পাদক ছিলেন, একথা সুবিদিত। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও তাঁহার একখানি সম্পূর্ণ জীবনী লিখিত হয় নাই, লেখার চেষ্টা যদিও হইয়াছে। যতই দিন যাইবে, পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক জীবনী রচনা ততই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অনুরাগী শিষ্যগণ বিচলিত হন, এবং তাঁহাদেরই একজন—ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ রায় অগ্রণী হইয়া এই কাজে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য বারবার লেখককে অনুরোধ করেন। সেই ঐকান্তিক আগ্রহ উপেক্ষা করা আমার সাধ্য ছিল না। ইতঃপূর্বে, ইচ্ছা সত্ত্বেও, শারীরিক অপটুতা ও অন্যান্য অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া ইহাতে লিপ্ত হইতে সাহস করি নাই। যাহা হউক, সকলের সমবেত চেষ্টায় ও নিষ্ঠার সহিত লাগিয়া থাকার ফলে, সম্বৎসরের মধ্যেই প্রয়োজনীয় উপাদান-সংগ্রহ ও লেখার কাজটি সম্পূর্ণ হইয়া যায়।

স্বামী সারদানন্দের জীবনী-বিষয়ক নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল: (১) স্বামী ভূমানন্দ-লিখিত 'স্বামী সারদানন্দ (যেমন দেখিয়াছি)', (২) ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য-সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীসারদা-নন্দপ্রসঙ্গ', (৩) ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র-সঙ্কলিত ও দেবেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত 'স্বামী সারদানন্দ (জীবনকথা)'। প্রথম গ্রন্থখানি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। উহাতে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত অপরের নিকট শ্রুত বিবরণও স্থান পাইয়াছে, দীর্ঘ বিশ বৎসরের কথা প্রধানতঃ স্মৃতির সাহায্যে লিখিত হইয়াছে, এবং ভুলভ্রান্তিও যে ঘটিয়াছে তাহা স্থানে স্থানে লীলাপ্রসঙ্গের বর্ণনার

সঙ্গে অমিল দেখিয়া, এবং অন্যান্য কারণেও, বুঝিতে পারা যায়। বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থোক্ত বিষয়সমূহের সঙ্গে নিজেদের ঐকমত্য অস্বীকার করিয়াছিলেন। তবে এই গ্রন্থের সকল বিবরণই তাঁহারা ভ্রান্তিপূর্ণ মনে করেন বলিয়া মনে হয় না; পরবর্তী কালে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত কোন কোন পুস্তকে উহা হইতে উপাদান গৃহীত হইয়াছে দেখিতে পাই। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি ১৯৩৫ অব্দে ৺কাশীধাম হইতে প্রকাশিত। ইহাতে শিষ্য বা শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তি-গণের দ্বারা লিপিবদ্ধ সাধনাবিষয়ক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ স্থান পাইয়াছে এবং সংক্ষিপ্তাকারে জীবনকথা কীর্তিত হইয়াছে। তৃতীয় গ্রন্থখানি ১৯৩৬ অব্দে বসুমতী সাহিত্যমন্দির হইতে প্রকাশিত হয়। সঙ্কলনকর্তা পুজনীয় শরৎ মহারাজের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন; স্বভাবতই পারিবারিক বিবরণ গ্রন্থের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়াছে। উহাতে মঠ ও মিশন-সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি ও সারদানন্দ-দিনলিপির বহু উদ্ধৃতি থাকায় উহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সমধিক।

এই তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত, স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে, ৺বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল-কৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃতে, স্বামী নির্লেপানন্দ-কৃত 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে' গ্রন্থে এবং মৎসঙ্কলিত 'স্বামী সারদানন্দের পত্রমালা'য় সারদানন্দ-জীবনীর অনেক উপাদান বিকীর্ণ হইয়া আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং নিজ জীবনের অনেক কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোন ঘটনা যেন অপর কাহারও সম্বন্ধে ঘটিয়াছিল এমনভাবে লিখিত। পূর্ব হইতে জানা না থাকিলে ঘটনাগুলি তাঁহার নিজজীবনের বলিয়া ধরিতে বুঝিতে পারা একটু কঠিন। যাহা হউক, আমাদের পক্ষে এই বাধা তিনি সশরীরে বিদ্যমান থাকিতেই অপসৃত হইয়াছিল।

'স্বামী সারদানন্দের জীবনী'র প্রধান আকরগ্রন্থগুলির কথামাত্র

উল্লেখ করিলাম। কোন কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনাংশে বিভিন্ন গ্রন্থে পার্থক্য আছে। ঐরূপস্থলে শিষ্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বর্ণনাকে গ্রহণ করাই সমীচীন মনে করিয়াছি; কারণ, গুরুমুখে শ্রুত বিবরণ তাঁহারা স্বল্পকালের ব্যবধানে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

স্বামী সারদানন্দের সেবাবহুল কর্মবৈচিত্র্যময় জীবন, অতুলন হৃদয়বত্তা ও আশ্রিতবাৎসল্য পূর্ববর্তী লেখকেরা সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সাধকজীবন—সেই সাধনার ব্যাপকতা ও গভীরতা, এবং তাঁহার আচার্যভাবটি ইতঃপূর্বে তেমন আলোচিত হয় নাই। আমরা ঐ দুইটি বিষয়কেই প্রাধান্য দিয়াছি। সংক্ষেপে হইলেও, অপর একটি বিষয়ে আমাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-প্রণয়নের ইতিহাস রচনা এবং ঐ মহাগ্রন্থের বিষয়বস্তু ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিতপূর্ণ আলোচনা। এতদ্ব্যতীত, আমাদের সংগৃহীত বহু নূতন কথা এই জীবনীতে স্থান পাইয়াছে, এবং ঘটনাবলীর পারম্পর্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চরিত্রের বিশেষত্বগুলি যাহাতে ফুটিয়া উঠে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

যে সময়ে সারদানন্দপ্রসঙ্গের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছিলাম, ঠিক তখনই জীবনী-লেখার আহ্বান আসে। সেইজন্য উহা আর স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইল না; উহার কিয়দংশ মূলজীবনীতে গিয়াছে, কিয়দংশ পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে এবং কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টের প্রসঙ্গসমূহ মূলজীবনীর অঙ্গরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য; যেহেতু উহাদের মধ্যেও আচার্যদেবের বহুদর্শিতা, শিষ্যপ্রীতি, শিক্ষাদানের রীতি ও সমুদার দৃষ্টিভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পূর্বগ গ্রন্থকারগণ ব্যতীত,যাঁহাদের অকৃত্রিম সাহায্য ও সহানুভূতি সারদানন্দ-জীবনীর সুষ্ঠু প্রণয়ন ও প্রকাশে লেখককে সমর্থ করিয়াছে;

স্বামী নির্লেপানন্দ যিনি শেষের দিকে দ্বাদশ বৎসরকাল তাঁহার আশ্রয়-দাতা স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছেন এবং সানন্দে নিজের দৃষ্ট-শ্রুত যাবতীয় বিষয়ই জানাইয়া দিয়াছেন ; ঠাকুরের প্রবীণ ভক্ত শ্রীকুমুদবন্ধু সেন যিনি দূর অতীতের বহু ঘটনার দ্রষ্টা, এবং ঐ সকল ঘটনার যথাযথ বিবরণ দিতে যাইয়া বৃদ্ধবয়সেও শ্রমস্বীকার করিয়াছেন ; বন্ধুবর শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যিনি কোষ্ঠীবিচারের মাধ্যমে সারদানন্দ-চরিত্রের উপর আলোকপাত করিয়াছেন ; বীরভূম শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীমুকুন্দবিহারী সাহা যাঁহার সুবন্দোবস্তে অনুকূল পরিবেশে থাকিয়া মুখ্য লেখার কাজটি করিতে পারিয়াছি ; এবং জনৈক ডাক্তার-বন্ধু যিনি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া, মুদ্রণের অধিকাংশ ব্যয় বহন করিয়া ও অন্যান্য নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

যাঁহার আশীর্বাদ ও দেবসঙ্গে অধ্যাত্মজীবন পুষ্ট হইয়াছে, আমাদের পরমপ্রিয় পরমাত্মীয় সেই 'শরৎ মহারাজে'র পুণ্য চরিতকথা যথা-সম্ভব সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত হইতেছে—ইহা দেখিয়া, এবং ভাবিয়াও, বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেছি। যাঁহাদের প্রেরণা ও করুণা অলক্ষ্যে থাকিয়া একাজে আমাদিগকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি, তাঁহারা প্রসন্ন হউন, এবং গ্রন্থখানি তাঁহাদেরই পূজার নৈবেদ্যস্বরূপ হউক—এই প্রার্থনা। ইতি—

৺রথযাত্রা, ১৩৬২

বিনীত নিবেদক—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

দ্রষ্টব্য : [লী]=শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

[প্র]=সারদানন্দপ্রসঙ্গ।

১৫৭ পৃষ্ঠার ২য় পংক্তির 'ব্রহ্মা' শব্দের স্থানে 'ব্রহ্ম' হইবে।

৩০৭ " ৭ম " 'বৃদ্ধি' " " 'বৃদ্ধ' "

১২২৫-২৬]

আভাষ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও সাধনা যেসকল মহাপুরুষে মূর্ত হইয়া ত্যাগ ও সেবায় শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, স্বামী সারদানন্দ তাঁহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সেই স্থানটি আগে জানিয়া লইয়া উহারই পটভূমিকায় তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী দেখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইব।

ভাবঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ ভক্তগণের জীবন অল্পবিস্তর সর্বভাবের সম্মিলনভূমি হইলেও ব্যক্তিবিশেষে তাঁহার কোন কোন ভাব বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হইয়া মানবের আদর্শ ও শিক্ষার স্থল হইয়াছে। আবার তাঁহার কোন কোন চিহ্নিত ভক্তের জীবন লোকে তাঁহাদের সম্বন্ধে তেমন কিছু জানিবার বুঝিবার পূর্বেই যেন দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

সপ্তর্ষির অন্যতম, 'অখণ্ডের ঘর', নরাবতার শ্রীবিবেকানন্দ যে বিশেষভাবে ঠাকুরের সর্বভাবের অধিকারী ছিলেন একথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। জগদম্বাকে আশ্রয় করিয়া ঠাকুরের যে অপূর্ব চিন্ময়বালকত্ব প্রকটিত হইয়াছিল, তাঁহাকেই মাতৃস্থানীয় করিয়া ঐ সদানন্দমূর্তি শিশু বিশেষভাবে তাঁহার মানসপুত্র শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের মধ্যে খেলা করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরের পুরুষদেহে প্রকৃতিভাব ও মহাভাবরূপী প্রেম, মহাভাবকালে তাঁহাকে স্পর্শ করিবার একমাত্র অধিকারী, 'নৈকষ্যকুলীন' শ্রীপ্রেমানন্দ-বিগ্রহে কামগন্ধহীন প্রেমের খেলা দেখাইয়াছে। তাঁহার পুরুষকারের জলন্ত অভিব্যক্তি

বিবেকানন্দ-চরিত্রের একদিক—তীব্র বিবেকবৈরাগ্য লইয়া সাধনা-সহায়ে জগৎকারণের উপলব্ধি ও তন্ময় হইয়া থাকিবার প্রয়াস—শ্রীঅদ্ভুতানন্দ, শ্রীতুরীয়ানন্দ প্রভৃতি আধারে বিশেষভাবে বিকশিত; এবং ঐ চরিত্রের অন্যদিক—কারণকে কার্যে অভিব্যক্ত দেখিয়া, ঈশ্বরকে জীবজগতে অবস্থিত দেখিয়া কর্মের মধ্য দিয়া সর্বভূতের সেবায় আত্ম-বিসর্জন—শ্রীসারদানন্দ-জীবনে পুর্ণভাবে প্রদর্শিত। ঐ আদর্শ যাঁহার মধ্যে স্ফূর্তিলাভ করিবে তাঁহাকে সর্বদাই জগতের সম্পর্কে আসিয়া সর্বাবস্থায় সকলকে লইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং লোকব্যবহার হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরানুভূতি পর্যন্ত সর্ববিষয়ে তাঁহার জীবন নিখুঁত হওয়া আবশ্যক। কারণ, কর্মপ্রবণ স্থূলদৃষ্টি মানব চিরকাল তাঁহারই মধ্যে নিজের আদর্শ সহজে দেখিবার চেষ্টা করিবে। স্বামিজী একদিন বলিয়াছিলেন,—ঠাকুরের দিক দিয়ে রাজার (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) স্থান যেমন অতি উর্ধ্বে, জগতের দিক দিয়ে শরতের (স্বামী সারদানন্দের) স্থানও তেমনি উর্ধ্বে।[১]

১ স্বামিজীর মুখে একথা তাঁহার সেবক স্বামী নির্ভয়ানন্দ শুনিয়াছিলেন।

বিকাশের পথে

> শরৎ সুধীর শান্ত গম্ভীরচেহারা।
> যোগী-ঋষি-তপস্বীর বালকের পারা॥
> —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি

কলিকাতা নগরীর ক্রোড়ে—বর্তমান হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের সংযোগস্থলে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর, সন ১২৭২ সালের ৯ই পৌষ, শনিবার, রাত্রি ৬টা ৩২ মিনিট সময়ে পিতা গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও মাতা নীলমণি দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান শরচ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসময়ে মিথুনরাশি পূর্ব দিক্‌চক্রবাল অতিক্রম করিয়া সমুদিত হইতেছিল এবং শুক্লা ষষ্ঠীর চন্দ্র পশ্চিমাকাশে কুম্ভরাশিতে থাকিয়া স্নিগ্ধকিরণে দেশ আপ্লাবিত করিতেছিলেন। কুম্ভের অধিপতি শনি তখন তুঙ্গী থাকায় এবং সুরগুরু সমধিক প্রভাবসম্পন্ন হওয়ায় জাতকের সর্বসৌভাগ্য সূচিত হইতেছিল।[১] বাস্তবিক শরচ্চন্দ্র অতি সম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরেই শুভাগমন করিয়াছিলেন। তিন কন্যার পরে প্রথম পুত্রসন্তান জাত হওয়ায় গৃহখানি আনন্দমুখর হইয়া উঠিল।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ময়াল-ইছাপুর গ্রাম গিরীশচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞ পিতা রামানন্দ জনাই গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। কলিকাতা পটলডাঙ্গার বিখ্যাত ধনী গোবিন্দচন্দ্র দত্ত রামানন্দের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। গোবিন্দের সংসারে থাকিয়া ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া গিরীশ পাশ্চাত্য শিক্ষায়

---

১ কোষ্ঠীবিচার পরিশিষ্টে দেখুন।

কৃতবিদ্য হন এবং আশ্রয়দাতার 'ড্রাগিষ্টস্ হল' নামক ঔষধালয়ে পরপর শিক্ষানবিস ও অংশীদাররূপে যোগদান করেন। কর্মকুশলতা ও অধ্যবসায়গুণে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ করিয়া তিনি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ ক্ষুদ্র বসতবাটীখানি—যাহা তিনি পূর্বেই ক্রয় করিয়াছিলেন—বৃহৎ অট্টালিকায় রূপান্তরিত করেন। হ্যারিসন রোডের প্রসারে অধুনালুপ্ত এই বাড়ীতেই শরচ্চন্দ্র যখন ভূমিষ্ঠ হন গিরীশ তখন অভ্যুদয়ের শিখরে।

একটা স্নেহময় আনন্দময় পরিবেশে শরচ্চন্দ্র বর্ধিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দ দত্তের এক দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী গিরীশের প্রার্থনায় তাঁহারই সংসারে থাকিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। গিরীশ তাঁহাকে পিসীমা সম্বোধন করিতেন এবং তাঁহার ছেলেমেয়েরা তাঁহাকে দিদি বলিয়া ডাকিত। নিঃসন্তান বিধবা তাঁহার পরিপূর্ণ স্নেহপাত্রটি শরতের উপর নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

শরৎ শিশুকাল হইতেই শিষ্ট শান্ত। মাতা গৃহদেবতা নারায়ণের পুজায়োজন করেন, সে কাছে বসিয়া নিবিষ্টমনে দেখে এবং খেলার সময়েও উহারই অনুকরণ করে। বালকের পুজায় অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া জননী কালীঘাট হইতে ক্ষুদ্রাকার একপ্রস্থ পুজার বাসন কিনিয়া দিলে সে ঐ বাসন লইয়া আপনমনে পুজা-পুজা খেলা করিত এবং পুজা করিবার জন্য পুতুলের দোকান হইতে দেবদেবীর মূর্তিসমূহ লইয়া আসিত।

প্রখর প্রবল বুদ্ধি অনেক সময়ে ছেলেদের চঞ্চল দুরন্ত করিয়া তুলে। শরতের ঠাণ্ডা প্রকৃতি ও বয়সের অনুপাতে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখিয়া অনেকেই তাহাকে বুদ্ধিহীন গোবেচারা জ্ঞান করিত। এমন কি তাহার গৃহশিক্ষকও এই মনোভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। পাছে ঐরূপ ধারণার বশে তিনি বালককে তাড়না করেন সেইজন্য যতক্ষণ

তিনি পড়াইতেন, 'দদি' কাছে বসিয়া থাকিতেন। শরৎকে এলবার্ট স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবার পর দেখা গেল, পরীক্ষায় প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া প্রতিবৎসরই সে পুরস্কৃত হইতেছে।

ছয়সাত বছর বয়সে কঠিন রক্তামাশয় হইয়া শরতের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়, নতুবা তাহার স্বাস্থ্য বরাবর ভালই ছিল। দৈহিক উন্নতির জন্য সে নিত্য নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করিত এবং মুদ্গর চালনাই ছিল তাহার ব্যায়ামচর্চার প্রধান অঙ্গ। স্বাস্থ্যের অনুপাতে তাহার ভোজনশক্তিও ছিল অসাধারণ, কোন কোন আহার্যে বিশেষ রুচিও প্রকাশ পাইত। ভেটকী মাছের সে নাম দিয়াছিল উত্তম মাছ এবং বাড়ীতে ভেটকী মাছ আসিলে বালক ঐ আনন্দসংবাদ সকলকে জানাইয়া দিতে ভুলিত না। বিদ্যালয় হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া নির্দিষ্ট জলখাবার ব্যতীত খানিকটা আলু বা কপি সিদ্ধ করিয়া কিংবা উচ্ছে পোড়াইয়া খাইয়া সে আনন্দ পাইত। সকল খাবারই ভাইভগিনীদের সঙ্গে একত্র বসিয়া খাইত ; বিশেষতঃ মিষ্টদ্রব্য সে কখনও তাহাদিগকে না দিয়া খাইতে চাহিত না।

শান্ত সপ্রেম স্বভাবের জন্য বালক কখনও কাহারও সঙ্গে ঝগড়া বা মারামারি করে নাই। নিষ্কারণে উপযাচক হইয়া ক্বচিৎ কেহ তাহার অঙ্গে আঘাত করিলে প্রতিকারে সক্ষম হইয়াও সে তাহা সহ্য করিয়া গিয়াছে, প্রতিবাদটি পর্যন্ত করে নাই।

এই কোমলপ্রাণ বালকের কাছে প্রার্থী হইয়া দীনদুঃখী লোক কখনও বিমুখ হইত না। পয়সার অভাবে দরিদ্র সহপাঠী কাগজপেন্সিল বা পাঠ্যপুস্তক কিনিতে পারিতেছে না দেখিলে সে সাধ্যানুযায়ী তাহার অভাবপূরণে অগ্রসর হইত। তাহার সম্বলের মধ্যে ছিল নিত্যকার জলখাবারের পয়সা যাহা সে উদরসাৎ না করিয়া এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই সঞ্চয় করিয়া রাখিত। ভোজনপ্রিয় বালকের এই স্বার্থত্যাগ স্বল্প

হৃদয়বত্তার পরিচায়ক নহে। যখন ইহাতেও কুলাইত না তখন সে নিজের ব্যবহার্য জামা, কাপড়, ছাতা, জুতা, এমন কি শীতবস্ত্র পর্যন্ত বিলাইয়া বসিত।

হৃদয়ের সহজাত প্রেরণা স্বতই বালককে সেবাপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল। আবাল্য সে রোগীর সেবা করিয়াছে আত্মীয়-অনাত্মীয়-নির্বিশেষে। একবার গিরীশচন্দ্রের পাশের বাড়ীর ঝির কলেরা হয়; গৃহস্বামী চিকিৎসার কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া মেয়েটিকে খোলা ছাদের একপাশে ফেলিয়া রাখে। শরৎ উহা দেখিতে পাইয়াই ছুটিয়া যায় এবং রোগিণীকে ভেদবমি হইতে মুক্ত করিয়া ও সেকতাপ দিয়া সমস্তরাত্রি তাহার পরিচর্যা করে। পরদিন সকালে ঝির মৃত্যু হইলে পেশাদার বৈষ্ণব আনিয়া সে অনাথার সৎকারেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল।

মাতাপিতার দৃষ্টান্তে ও শুভসংস্কারবশতঃ যে ঈশ্বরভক্তি বালকের হৃদয়ে মুকুলিত হইয়া উঠিতেছিল উপনয়নের পর উহার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। ত্রয়োদশ বর্ষে উপনয়ন-সংস্কার হইয়া গেলে নারায়ণশিলার স্পর্শ ও পুজাধিকার লাভ করিয়া সে যারপরনাই আনন্দিত হইল। স্বহস্তে অনেকদিন পর্যন্ত দেবতার পুজা ও আরতি করিয়া সে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত।

প্রবল জ্ঞানার্জনস্পৃহা বালকের অধ্যয়নশক্তিকে সাধারণ পাঠ্য-পুস্তকে নিবদ্ধ না রাখিয়া বিবিধবিষয়ক গ্রন্থপাঠে নিয়োজিত রাখিত। উহার ফলে যে জ্ঞানরাশি সঞ্চিত হইত, বিতর্কসভায় আলোচনার সুযোগে সকলকে উহার ভাগী করিয়া সে আত্মপ্রসাদ লাভ করিত।

শরতের সৌম্যমূর্তি, সুগঠিত দেহ, সংযত চরিত্র, সত্যনিষ্ঠ মন, সহানুভূতিশীল হৃদয় ও স্বাভাবিক ধর্মানুরাগ তাহাকে সহপাঠিগণের

শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এবং শিক্ষকগণও তজ্জন্য তাহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে কৈশোর অতিক্রম করিয়া বালক যৌবনে পদার্পণ করিল। ঐ সময়ে তাহার স্কুলের পড়াও শেষ হইয়া আসিতেছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শরচ্চন্দ্র উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে প্রবেশ করিলেন।

৩

শ্রীগুরু-সন্দর্শন

সতীর্থগণের মুখে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মিতার কথা শুনিয়া শরচ্চন্দ্র সমাজমন্দিরে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমদিকে কৌতূহলবশতঃ গমন করিলেও, পরে ঐ মতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি তদনুযায়ী উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যাপার তাঁহার প্রবেশিকা পরীক্ষার কিছুকাল পূর্বে ঘটে বলিয়া অনুমিত হয়। শরতের পিতৃব্যপুত্র ও তদপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ শশিভূষণ দেশের বাড়ী হইতে আসিয়া কলিকাতায় গিরীশচন্দ্রের ভবনে থাকিয়া এফ্-এ পড়িতেছিলেন, তিনিও ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া আসা করিতেন।[১]

শশী, শরৎ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরা মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে পাড়ায় একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির অবশ্যকরণীয় বিষয়-সমূহের মধ্যে ছিল—সৎচর্চা, সদ্গ্রন্থের আলোচনা, সত্যভাষণ, শারীরিক ব্যায়াম ও রোগীর সেবা। এই সমিতির বার্ষিক আনন্দোৎসব উপলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া শরচ্চন্দ্র প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দর্শন লাভ করেন। মতান্তরে, শশিভূষণের সহপাঠী কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর মুখে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কথা শুনিয়া, এবং ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন জানিয়া, শরৎ ও শশী তাঁহাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হন এবং কালীপ্রসাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া দুইজনেই একদিন দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে গমন করেন। পূর্বোক্ত আনন্দোৎসব উপলক্ষ্য করিয়া পরমহংসদেবের দর্শনমানসে ইঁহারা দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন, এমনও হইতে পারে। তখন ১৮৮৩

---

১ শশিভূষণের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র গিরীশের খুল্লতাতপুত্র ও তদপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস, সন ১২৯০ সালের কার্তিক মাসের শেষভাগ হইবে।

প্রথম দর্শনেই ঠাকুর শরৎ ও শশীকে তাঁহার অতি আপনজন—অন্তরঙ্গ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া, লৌকিকভাবে তাঁহাদের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দুইজনেই কেশবের সমাজে যাওয়া আসা করেন শুনিয়া প্রীত হইয়া কহিলেন, 'বেশ, বেশ!' তারপর দুইজনকেই শীঘ্রই আবার একদিন তাঁহার কাছে একা একা আসিতে বলিয়া দিলেন। ইহার ফল হইল এই যে, দুইজনেই তাঁহার কাছে যাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পরস্পরের অগোচরে।

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই শরচ্চন্দ্র "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন—কেন, কি কারণে, এবং উহা কতদূর গড়াইবে, সেকথা অবশ্য কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই, কিন্তু 'ইনি বেশ লোক, যথার্থ সাধুভক্ত এবং ইঁহার নিকট সময় পাইলেই আসিব'—এইরূপভাবে কেমন একটা অব্যক্ত টানের উদয় হইয়াছিল।" [লী ২।৬]

শোনা যায়, প্রথম দর্শনের দিনই ঠাকুর শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'ছেলেটির দেখছি তীব্র বৈরাগ্য।' শরৎ আজন্ম ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত। সরলা ভক্তিমতী মাতা—যিনি দেবসেবা লইয়াই থাকিতেন, উদারচেতা পিতা—যিনি বাধা দেওয়া দূরে থাক, প্রত্যেক হিতকর কাজেই ছেলেকে উৎসাহিত করিতেন, রক্তসম্পর্কহীনা স্নেহময়ী দিদি, অনুগত ভাইভগিনী, দাসদাসী, স্পৃহনীয় স্বাস্থ্য ও শক্তি—কোন্‌টিই বা তাঁহার না ছিল? অথচ তাঁহার অন্তরাত্মা ভগবদ্দর্শনের জন্য কাঁদিয়া মরে, তাঁহার তত্ত্ব পাইবার জন্য হেথাসেথা ঘুরিয়া বেড়ায়—একথা তাঁহার অনুপম গাম্ভীর্যের আবরণ ভেদ করিয়া অপরে বুঝিতে না পারিলেও অন্তর্দর্শী ঠাকুরের কাছে অবিদিত থাকে নাই। পরেও

ঠাকুর তাঁহার অপরাপর ভক্তদিগকে বলিয়াছেন, 'শরতের সংসারে কোন অভাব নাই, তবু ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল।'

বৃহস্পতিবার সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে ছুটির দিন। শরচ্চন্দ্র সঙ্কল্প করিলেন, প্রতিবন্ধক না ঘটিলে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারই তিনি ঠাকুরের কাছে যাইবেন, আর তদ্রূপ করিতেও লাগিলেন।

ক্রমশঃ তিনি ঠাকুরের অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিলেন, এবং তাঁহার নিজের ন্যায় উঁহাদের ও অপর সাধারণের জীবনে ঠাকুরের অসাধারণ আধ্যাত্মিক প্রভাব কিভাবে কার্যকরী হইতেছে তাহাও দেখিবার সুযোগ পাইলেন।

২৬শে নভেম্বর সোমবার কোন কারণে কলেজ বন্ধ থাকায়, শরচ্চন্দ্র ঐদিন ঠাকুরকে দর্শন করিতে সমুৎসুক হন। ইতঃপূর্বে তিনি দুইবার কি তিনবার মাত্র তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার দুই বন্ধু শ্রীবরদাসুন্দর পাল ও শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অনুগামী হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং তিনজনে মিলিয়া গহনার নৌকায় করিয়া দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নৌকার আরোহিগণের ভিতর অন্য এক ব্যক্তিও সেদিন ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন; তাঁহার নাম শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল। পরস্পর পরিচিত হইয়া যখন তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ করিতেছিলেন সেই সময় নৌকামধ্যে এক ব্যক্তি ঠাকুরের নিন্দাবাদে মুখর হইয়া উঠে এবং বৈকুণ্ঠনাথ বিষম ঘৃণার সহিত উত্তর দিয়া তাহাকে অপদস্থ করেন। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া যখন তাঁহারা ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হইলেন তখন বেলা প্রায় আড়াইটা হইবে।

তাঁহারা প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর কহিলেন, 'তাইতো তোমরা আজ এলে। আর একটু পরে হলে দেখা হত না। আজ কলকাতায় যাচ্চি, গাড়ী আনতে গেছে। সেখানে উৎসব—ব্রাহ্মদের উৎসব।

যা হোক দেখা যে হল এই ভাল, বস। দেখা না পেয়ে ফিরে গেলে মনে কষ্ট হত।'

ঘরের মেজেতে একটি মাতুরে তাঁহারা বসিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মশায়, আপনি যেখানে যাচ্চেন সেখানে আমরা গেলে কি ঢুকতে দেবে না?' ঠাকুর বলিলেন, 'তা কেন? ইচ্ছা হলে তোমরা অনায়াসে যেতে পার। সিঁহুরিয়াপটি মণি মল্লিকের বাড়ী।' একটি নাতিকৃশ গৌরবর্ণ রক্তবস্ত্রপরিহিত যুবক এই সময়ে গৃহে প্রবেশ করিতেই ঠাকুর কহিলেন, 'ওরে, এদের মণি মল্লিকের বাড়ীর নম্বরটা বলে দে তো।' যুবক বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, '৮১নং চিৎপুর রোড, সিঁহুরিয়া পটি।' যুবকের বিনীত স্বভাব ও সাত্ত্বিক প্রকৃতি দেখিয়া শরচ্চন্দ্রের মনে হইয়াছিল, তিনি ঠাকুরবাটীর কোনও ভট্টাচার্যের পুত্র হইবেন; কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার পুর্ব ধারণা ঠিক নহে। এই যুবকের নাম শ্রীবাবুরাম, যিনি পরে স্বামী প্রেমানন্দ নামে সুপরিচিত হন।

শীঘ্রই গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবুরামকে গামছা ও মশলার বেটুয়াদি লইতে বলিয়া ও জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। পুর্বোক্ত দ্রব্যসমূহ লইয়া বাবুরামও গাড়ীর অন্যদিকে উপবিষ্ট হইলেন। প্রতাপচন্দ্র হাজরা নামে অপর এক ব্যক্তিও সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে কলিকাতায় গিয়াছিলেন।

ঠাকুর চলিয়া যাওয়ার পরেই যুবকগণ একখানি গহনার নৌকা পাইয়া কলিকাতার বড়বাজার ঘাটে উত্তীর্ণ হইলেন এবং উৎসবের বিলম্ব আছে ভাবিয়া কিছুক্ষণ এক বন্ধুর বাসায় অপেক্ষা করিলেন। সন্ধ্যাকালে মল্লিকবাটীর সম্মুখের রাস্তায় পৌঁছিতেই মধুর সঙ্গীত ও মৃদঙ্গের রোল তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। দ্রুতপদে বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন,—ঘরের ভিতরে বাহিরে লোকের

ভিড় লাগিয়াছে ; প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখে এবং পশ্চিমের ছাদে এত লোক দাঁড়াইয়াছে যে সেই জনতা ভেদ করিয়া ঘরে প্রবেশ করা অসম্ভব ; সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া গৃহমধ্যে স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে, পাশে কে আছে-না-আছে তাহার হুঁসই নাই। বৈঠকখানার উত্তরের এক দ্বারপার্শ্ব হইতে—ভিড় এখানে অপেক্ষাকৃত কম ছিল—কোনরূপে গৃহমধ্যে মাথা গলাইয়া শরচ্চন্দ্র দেখিলেন,—

'অপূর্ব দৃশ্য! গৃহের ভিতরে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে ; সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উদ্দামনৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে ; আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখন দ্রুতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখন বা ঐরূপে পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছেন এবং ঐরূপে যখন যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, সেই দিকের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার অনায়াস গমনাগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। তাঁহার হাস্যপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যজ্যোতি ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যের সহিত সিংহের ন্যায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব নৃত্য! তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ্রসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি বা অঙ্গসংযম-রাহিত্য নাই ; আছে কেবল, আনন্দের অধীরতায় মাধুর্য ও উদ্যমের সম্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি। নির্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মৎস্য যেমন কখন ধীরভাবে এবং কখন দ্রুত সন্তরণ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রূপ। তিনি যেন আনন্দসাগর ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গসংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন। ঐরূপে নৃত্য করিতে করিতে তিনি কখন বা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেছিলেন, কখন বা তাঁহার পরিধেয় বসন শ্বলিত হইয়া যাইতেছিল এবং অপরে উহা তাঁহার কটিতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতেছিল, আবার কখন বা কাহাকেও ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হইতে দেখিয়া তিনি তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাহাকে পুনরায় সচেতন করিতেছিলেন। বোধ হইতেছিল যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এক দিব্যোজ্জ্বল আনন্দধারা চতুর্দিকে প্রসৃত হইয়া যথার্থ ভক্তকে ঈশ্বরদর্শনে, মৃদুবৈরাগ্যবানকে তীব্রবৈরাগ্যলাভে, অলস মনকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে সোৎসাহে অগ্রসর

হইতে সামর্থ্য প্রদান করিতেছিল এবং ঘোর বিষয়ীর মন হইতেও সংসারাসক্তিকে সেই ক্ষণের জন্য কোথায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার ভাবাবেশ অপরে সংক্রমিত হইয়া তাহাদিগকে ভাববিহ্বল করিয়া ফেলিতেছিল এবং তাঁহার পবিত্রতায় প্রদীপ্ত হইয়া তাহাদের মন যেন কোন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে আরোহণ করিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের ত কথাই নাই, অন্য ব্রাহ্মভক্তসকলের অনেকেও সেদিন মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। আর সুকণ্ঠ আচার্য চিরঞ্জীব সেদিন একতারা সহায়ে 'নাচ্‌রে আনন্দময়ীর ছেলে তোরা ঘুরে ফিরে'—ইত্যাদি সঙ্গীতটি গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া যেন আপনাতে আপনি ডুবিয়া গিয়াছিলেন। ঐরূপে প্রায় দুই ঘণ্টারও অধিককাল কীর্তনানন্দে অতিবাহিত হইলে, 'এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিল কে?' এই পদটি গীত হইয়া সকল ধর্ম-সম্প্রদায় ও ভক্ত্যাচার্যদিগকে প্রণাম করিয়া সেই অপূর্ব কীর্তনের বেগ সেদিন শান্ত হইয়াছিল।" [লী ৫।১।২]

শ্রীরামকৃষ্ণভাবজলধির উচ্ছ্বসিত উদ্বেল রূপ শরচ্চন্দ্র এই প্রথম দর্শন করিলেন। শুধু দর্শন করিলেন বলিলেই সবটা বলা হয় না, তিনি উহার তরঙ্গাভিঘাত বিশেষভাবে অনুভবও করিয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাই, এই ঘটনার মাত্র দুইদিন পরেই ঠাকুর মাথাঘসা পল্লীর জয়গোপাল সেনের বাটীতে শুভাগমন করিবেন জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার বন্ধু বরদাসুন্দরের সঙ্গে সেখানেও যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৪

নরেন্দ্র-সঙ্গম

ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা, চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে তেমনিধারা ভক্তগণের চিত্ত আকর্ষণ করিত। আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা আসাযাওয়া করিতেন, ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে দেখিবার বুঝিবার সুযোগ পাইতেন, আর ধীরে ধীরে তাঁহাদের চিত্তপটে মুদ্রিত হইতে থাকিত ঠাকুরের ত্যাগোদ্দীপ্ত জীবন, সংস্কারমুক্ত সত্যনিষ্ঠ মন ও আনন্দময় বিগ্রহের ছবি।

ঐরূপ হইলেও কিন্তু, ঠাকুরের দুরবগাহ চরিত্র—তাঁহার প্রত্যেক কথা ও আচরণের গভীর অর্থ ও উদ্দেশ্য সকলে সমানভাবে ধরিতে বুঝিতে পারিতেন না, তাঁহার ঐশ্বরিক স্বরূপ বুঝিতে পারা তো দূরের কথা। নিজের অনুকূল ভাবের সহজ প্রকাশ সকলেই ঠাকুরের মধ্যে দেখিতে পাইতেন এবং তদ্ভাবমাত্র অংশতঃ গ্রহণ করিয়াই সাধারণ ভক্তেরা সন্তুষ্ট থাকিতেন। আন্তরিক হইলে সকল ভাবের ভাবী ভগবানকে যেকোন একটা ভাব দিয়াই ধরিতে পারা যায়। ব্যক্তিগত জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে উহাই যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে। ঠাকুর যেমন বলিতেন, নিজেকে বধ করিতে হইলে একটা নরুণ বা একখানা ক্ষুরই যথেষ্ট।

কিন্তু তাঁহার চিহ্নিত পার্ষদগণ কেবল নিজ নিজ সংকীর্ণ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই জন্মগ্রহণ করেন নাই। শ্রীভগবানের অভিপ্রেত কার্য সম্পাদনে—যুগধর্ম-সংস্থাপনে তাঁহাদিগকে যুগদেবতার অনুগামী ও প্রধান সহায় হইতে হইবে। আর ঐরূপ হইতে হইলেই এবারকার যুগধর্মের সর্বভাবসমন্বিত যে রূপ—উহার ব্যাপকতা ও গভীরতা, নিজেদের জীবনে যথাসম্ভব বিকশিত করিয়া তুলিতেও হইবে। ছাঁচ

নির্মিত হইয়া যদিও আছে, তথাপি ঐ ছাঁচে অর্থাৎ "শ্রীরামকৃষ্ণরূপ মুষায় জীবন প্রকৃষ্টরূপে দ্রুত" করিবার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন। শরচ্চন্দ্রকে গ্রহণ করিয়াই ঠাকুর সেই প্রস্তুতিকার্যে মনোনিবেশ করিলেন এবং ঐ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হইবে জানিয়াই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার মিলন সংঘটিত করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া শরচ্চন্দ্র ঠাকুরের মুখে নরেন্দ্রনাথের গুণানুবাদ শুনিয়া মুগ্ধ হন। তিনি লিখিয়াছেন :

"রতন নামক যদুনাথ মল্লিকের উদ্যানবাটীর প্রধান কর্মচারীর সহিত কথা কহিতে কহিতে আমাদিগকে দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'এরা সব ছেলে মন্দ নয়, দেড়টা পাস করিয়াছে, শিষ্ট, শান্ত, কিন্তু নরেন্দ্রের মত একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না। যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে কইতে, আবার তেমনি ধর্ম-বিষয়ে! সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না! আমার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু মেকি নাই, বাজিয়ে দেখ—টং টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোখকান টিপে কোনও রকমে দুতিনটে পাস করেছে, ব্যস্, এই পর্যন্ত—ঐ করতেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়, হেসে খেলে সব কাজ করে, পাস করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়! সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্য সকল ব্রাহ্মের ন্যায় নয়,—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতির্দর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি?'...নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার মানসে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'মহাশয়, নরেন্দ্র কোথায় থাকে?' তদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'নরেন্দ্র বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, বাড়ী শিমলায়।'" [লী ৫।৬।১]

অনতিবিলম্বে শিমলায় যাইয়া শরচ্চন্দ্র নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিলেন। পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল এবং একটা গভীর প্রীতির সম্পর্কে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। উহা জানিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'গিন্নী জানে, কোন্ হাঁড়ির মুখে কোন্ সরা রাখতে হয়।'

ঠাকুরের মুখে নরেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিবার স্বল্পকাল পূর্বে শরচ্চন্দ্র নরেন্দ্রের এক প্রতিবেশীর নিকট তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু উহা প্রশংসাবাদ নহে। প্রতিবেশী বলিয়াছিল, 'এই বাড়ীতে একটা ছেলে আছে, তার মত ত্রিপণ্ড ছেলে কখনো দেখি নি। বি-এ পাস করেচে বলে ধরাকে যেন সরা দেখে, বাপখুড়োর সামনেই তবলায় চাঁটি দিয়ে গান ধরলে, পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনেই চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে চল্ল।' বদ্ ছেলেদের সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্রের কিছুমাত্র কৌতূহল না থাকায় তিনি 'ত্রিপণ্ড' ছেলেটি সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদই করেন নাই। ইহারও কয়েকমাস পূর্বে তিনি এক বন্ধুর বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের দর্শন পাইয়াছিলেন কিন্তু ভ্রমধারণাবশতঃ তাঁহার সহিত আলাপ করিতেও চাহেন নাই। ঘটনাটি এইরূপ ঃ

শরচ্চন্দ্রের সহপাঠী এক বাল্যবন্ধু শিমলাপল্লীস্থ গৌরমোহন মুখার্জি লেনে থাকিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদনা ও সাহিত্যচর্চা করিতেন। লোকমুখে তাঁহার স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে শুনিয়া বন্ধুবৎসল শরচ্চন্দ্র বেদনা অনুভব করেন, এবং রটনা সত্য বা মিথ্যা নির্ধারণ করিবার জন্য একদিন সহসা তাঁহার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হন। ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক যুবক ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং নিঃসঙ্কোচে একটি তাকিয়ায় অর্ধশায়িত হইয়া গুন্‌গুন্ করিয়া হিন্দী গানের অংশবিশেষ গাহিতে লাগিলেন। গানের দুইটি পদ 'কানাই' ও 'বাঁশরী' স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। সৌখীন না হইলেও যুবকের পরিচ্ছদ পরিষ্কার, কেশ পরিপাটি ও দৃষ্টি উন্মনা। গৃহমধ্যে যে আর একজন বসিয়া আছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া তিনি আপন মনে তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া শরচ্চন্দ্রের ধারণা জন্মিল, তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুরই ইনি বিশ্বস্ত অনুচর হইবেন।

সহপাঠী এই সময়ে বাহিরে আসিলেন এবং বহুকাল পরে সাক্ষাৎ-লাভ ঘটিলেও বাল্যবন্ধুকে দুইএকটি কথামাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই সানন্দে যুবকের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এই উদাসীনতা শরচ্চন্দ্রের ভাল লাগিল না ; তথাপি ভদ্রতার খাতিরে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া তাঁহাদের বাক্যালাপ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যে কোন ভাবপ্রকাশক রচনা সাহিত্যপদবাচ্য কিনা এই নিয়া আলোচনা চলিয়াছিল এবং উপসংহারে যুবক বলিয়াছিলেন,—

"সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগসকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বদা জীবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। They idealise what is apparently real. পশুদিগের সহিত তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাতনিত্য ভোগসুখাদিলাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শসকল অন্তরে অনুভব করিয়া বহিঃস্থ সকল বিষয় সেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। They want to realise the ideal ঐরূপ মানবই যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে আবার যাহারা সর্বোচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া উহা জীবনে পরিণত করিতে ছুটে, তাহাদিগকে প্রায়ই সংসারের বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইতে হয়। ঐরূপ আদর্শ জীবনে পূর্ণভাবে পরিণত করিতে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবকেই কেবলমাত্র দেখিয়াছি। সেজন্যই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।" [লী ৫।৬।১]

যুবকের গভীর ভাবপূর্ণ বাক্য ও পাণ্ডিত্যে সেদিন চমৎকৃত হইলেও তাঁহার কথায় ও কাজে মিল নাই ভাবিয়া শরচ্চন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

"সাধারণ মানব ঐরূপে নরেন্দ্রনাথের বাহ্য আচরণসমূহ দেখিয়া তাঁহাকে দাম্ভিক, উদ্ধত এবং অনাচারী প্রভৃতি বলিয়া অনেক সময়ে ধারণা করিয়া বসিলেও, ঠাকুর কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কখনও ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয়েন নাই। প্রথম দর্শনকাল হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নরেন্দ্রের দম্ভ ও ঔদ্ধত্য তাঁহার অন্তর্নিহিত অসাধারণ মানসিক শক্তিসমূহের ফলস্বরূপ বিশাল আত্মবিশ্বাস হইতে সমুদিত হয়,

তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বাধীন আচরণ তাঁহার স্বাভাবিক আত্মসংযমের পরিচায়ক ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাঁহার লোকমান্যে উদাসীনতা তদীয় পূত স্বভাবের আত্মপ্রসাদ হইতেই সমুত্থিত হইয়া থাকে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কালে নরেন্দ্রের অসাধারণ স্বভাব সহস্রদল কমলের ন্যায় পূর্ণবিকশিত হইয়া নিজ অনুপম গৌরব ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন তাপদগ্ধ সংসারের সংঘর্ষে আসিয়া তাঁহার ঐ দম্ভ ও ঔদ্ধত্য অসীম করুণাকারে পরিণত হইবে, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব আত্মবিশ্বাস হতাশ প্রাণে বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবে, তাঁহার স্বাধীন আচরণ সংযমরূপ সীমায় সর্বথা অবস্থিত থাকিয়া যথার্থ স্বাধীনতা লাভের উহাই একমাত্র পথ বলিয়া অপরকে নির্দেশ করিবে।" [লী ৫।৬।১] ঠাকুর যাহা বুঝিয়াছিলেন, শরচ্চন্দ্র তাহাই কালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে, শীতের এক মধ্যাহ্নে, শরচ্চন্দ্র ও শশিভূষণ নরেন্দ্রনাথের শিমলাপল্লীস্থ ভবনে যাইয়া উপস্থিত হন। সেদিন নরেন্দ্রনাথ কেবল ঠাকুরের কথাই বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাণস্পর্শী কথাসমূহ শুনিতে শুনিতে শ্রোতৃদ্বয় কখনো বিস্ময়াবিষ্ট, কখনো বা তন্ময় হইয়া পড়িতেছিলেন। ইহার ফলে ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্বধারণা—তিনি একজন ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি বা সিদ্ধপুরুষ মাত্র—একেবারে পালটাইয়া যায়। শরচ্চন্দ্র লিখিয়াছেন :

"ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া নিজ জীবনে যে দিব্যানুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছে সে সকলের কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ সেদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্য আপনাতে আপনি মগ্ন থাকিয়া অন্তরের অদ্ভুত আনন্দাবেশ পরিশেষে কিন্নরকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

প্রেমধন বিলায় গোরা রায়।
চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয়,
তোরা কে নিবি রে আয়!
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!

প্রেমে শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়,
গৌরপ্রেমের হিল্লোলেতে নদে ভেসে যায়!

"গীত সাঙ্গ হইলে নরেন্দ্রনাথ যেন আপনাকে আপনি সম্বোধনপূর্বক ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, 'সত্য সত্যই বিলাইতেছেন। প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাকে তাহাই বিলাইতেছেন। কি অদ্ভুত শক্তি! (কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পরে বলিতেছেন) রাত্রে ঘরে খিল দিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে হাজির করাইলেন—শরীরের ভিতর যেটা আছে সেইটাকে; পরে কত কথা কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে দিলেন। সব করিতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন।'

"সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া তামসী রাত্রিতে পরিণত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছি না, প্রয়োজনও হইতেছে না। কারণ, নরেন্দ্রের জলন্ত ভাবরাশি মরমে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরে এমন এক দিব্য মাদকতা আনিয়া দিয়াছে যাহাতে শরীর টলিতেছে এবং এতকালের বাস্তব জগৎ যেন দূরে স্বপ্নরাজ্যে অপসৃত হইয়াছে; আর অহেতুকী কৃপার প্রেরণায় অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের শান্তবৎ হইয়া উদয় হওয়া এবং জীবের সংস্কারবন্ধন বিনষ্ট করিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করা রূপ সত্য, যাহা জগতের অধিকাংশের মতে অবাস্তব কল্পনাসম্ভূত তাহা তখন জীবন্ত সত্য হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে! সময় কোথা দিয়া কিরূপে পলাইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সহসা শুনিতে পাইলাম রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বিদায় গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছি, এমন সময়ে নরেন্দ্র বলিলেন, 'চল তোমাদিগকে কিছুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া আসি।' যাইতে যাইতে আবার পূর্বের ন্যায় কথাসকলের আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় আমরা এতদূর তন্ময় হইয়া যাইলাম যে, চাঁপাতলার নিকটে বাটীতে পৌঁছিবার পরে মনে হইল, নরেন্দ্রকে এতদূর আসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই। সুতরাং বাটীতে আহ্বান করিয়া কিছু জলযোগ করাইবার পরে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহাদের বাটী পর্যন্ত তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলাম।" [লী ৫।৬।২]

ঐদিন শরচ্চন্দ্রের বাটীতে প্রবেশ করিয়াই নরেন্দ্রনাথ সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'এ বাড়ী যে আমি পূর্বে দেখেচি! এর কোথা দিয়ে কোথা যেতে হয়, কোথায় কোন্ ঘর আছে, সবই যে আমার পরিচিত—আশ্চর্য!' নরেন্দ্রনাথ পরে বলিতেন, ইহজন্মে

যেসকল বস্তু; ব্যক্তি বা স্থানের সহিত তাঁহাকে পরিচিত হইতে হইবে, জন্মিবার পূর্বে চিত্রপরম্পরায় তিনি সেই সকলকে কোনরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন ; এই সমস্ত স্মৃতি সেই দর্শনেরই ফল। শরচ্চন্দ্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ যে বিধাতৃনির্দিষ্ট, পূর্বোক্ত গৃহ-পরিচিতি তাহারই ইঙ্গিত বহন করে। পরেও তিনি বহুবার এই বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন।

৫

ঠাকুরের নিকট শিক্ষা ও সাধনা

"করুণাময় ঠাকুর তাঁহার নিকট যাহারা আসিত তাহাদের প্রায় সকলকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতেন, একবার গ্রহণ করিলে তাহারা ছাড়াছাড়ি করিলেও আর ছাড়িতেন না, এবং কখন কোমল, কখন কঠোর হাতে তাহাদের জন্মজন্মার্জিত সংস্কাররাশিকে শুষ্ক, দগ্ধ করিয়া নিজের নূতন ভাবে অদৃষ্টপুর্ব অমৃতময় ছাঁচে নূতন করিয়া গঠন করিয়া তাহাদিগকে চিরশান্তির অধিকারী করিতেন।" [লী ২।৫]

শ্রীগুরুর সংস্পর্শে আসিয়া শরচ্চন্দ্র যেসব শিক্ষা পাইয়াছিলেন, ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ ও ইচ্ছাশক্তির অমোঘ প্রভাব স্বতই যেসব উপলব্ধি বা উপলব্ধির আভাস তাঁহার জীবনে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল, তাহার সমস্ত ইতিহাস কখনও জানিতে পারা যাইবে না। তবে নানা সূত্র ধরিয়া এইটুকু অনুমান করা কঠিন নয় যে, শান্তসুধীর শরচ্চন্দ্রের জীবনে একদিনে হঠাৎ কিছু আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। ঐরূপ ব্যাপার তাঁহার সমগ্র জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলিয়া মনে হয়। ঠাকুর বলিতেন, 'সারবান গাছ বিলম্বে বাড়ে।'

শরচ্চন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন; কিন্তু তিনি কখনও উহার খাতায় নাম লিখাইয়াছিলেন, বা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন, কিংবা সাকার ঈশ্বর ও দেবদেবী মানিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন, এমন কোনও কথা শোনা যায় না, তাঁহার নিজের লেখা হইতেও অনুমিত হয় না। তথাপি বিকাশোন্মুখ মনে ব্রাহ্ম-সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব তিনি বিশেষভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন, আর সেইজন্যই কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে 'ভারতবর্ষীয়' ও

'সাধারণ' ব্রাহ্মসমাজ দুইটির নিকট ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই ।

সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে অধ্যয়নকালে শরচ্চন্দ্র খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞানসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া ঐ কলেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞানাচার্য ফাদার লাফোঁ স্বয়ং সযত্নে তাঁহাকে বাইবেল পড়াইয়াছিলেন।

সনাতন হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক ও উপাসনাঙ্গ চিন্তায় সাকার-নিরাকারের ঐকান্তিক দ্বন্দ্ব নাই, বরং দুইটি ভাবই যেন মধুর সামঞ্জস্যে একত্র মিলিত হইয়া আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গায়ত্রী-উপাসনার কথা বলা যাইতে পারে। এই কারণে, উপনয়নকাল হইতে পূজা-অর্চায় অভ্যস্ত শরচ্চন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্বে পড়েন নাই বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ তিনি পণ্ডিত ও সাধক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্র উভয়েই তান্ত্রিক সাধক ছিলেন।

তথাপি কালের প্রভাবে তিনি ঐরূপ দ্বন্দ্বে পড়িয়াছিলেন বলিয়াই যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও একথা নিশ্চিত যে উহা তাঁহার মনে দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। ঠাকুরের কাছে আগমনের পরেই উহা আপনা হইতে বা অল্পায়াসে বিদূরিত হইয়াছিল।

নবানুরাগের টানে শরচ্চন্দ্র যখন ঠাকুরের কাছে আসাযাওয়া করিতেছেন, এই সময় একদিন ঠাকুর হাত চাপড়ে একটি ব্রাহ্মসঙ্গীত গাহিয়া শুনাইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'এর মধ্যেকার যেকোন একটি ভাব আয়ত্ত করলেই তোমার সব হবে।' গানটি এই—

নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার, প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে বলিবার আপনার॥
তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য জ্ঞান বুদ্ধি বল,
তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার।

তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার।
তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা, তুমি হে উপাস্য,
দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার॥

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখোচ্চারিত ও তৎকর্তৃক সাধকবিশেষের জন্য বিহিত যেকোন কথা মহাশক্তিতে পূর্ণ থাকিত; আর সেই কথামাত্র সম্বল করিয়া চলিতে চলিতে কালে ঐ ব্যক্তি আপনা হইতেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আসিয়া উপনীত হইতেন—শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকার 'শ্রীম' এই কথাটি বলিতেন। শরচ্চন্দ্রের বেলায় যে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই, গানের অন্তর্নিহিত ভাব আয়ত্ত করিতে করিতে আপনাতে ডুবিয়া গিয়া সারাৎসার সর্বস্বকে প্রাপ্ত হওয়া রূপ লক্ষ্যে তিনিও যে উপনীত হইয়াছিলেন, আর বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা সহায়ে স্বল্পকালেই উপনীত হইয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে বা স্ব-ভাবে তিনি তখন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক হইয়া থাকিলে সেই নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতি ঘনীভূত হইয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল—দিব্যভাবময় ধৃতবরাভয় শ্রীরামকৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান অসমীচীন নহে।

পরবর্তী জীবনে পুজনীয় শরৎ মহারাজকে একজন[১] বলিয়াছিলেন যে, সাধনভজন যথাসাধ্য করিলেও তিনি বিশেষ কিছু উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, এবং তাঁহার কোন বিশেষ 'রূপে' আবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভাল লাগে না। তাহাতে মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'বোধ হয় তোমার নিরাকারের ভাব। নিরাকারের ভাব ফুটতে বিলম্ব হয়। হয়তো মাঝে মাঝে কখন একটু ঘাইফুট দেয়। কেউ সাকার দিয়ে নিরাকারে যায়, আবার কেউ নিরাকার দিয়ে সাকারে যায়। যারা

১ স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ।

সাকার থেকে নিরাকারে যায় তারা যেন একটা পাওয়া পেল এরূপ মনে করে। আর যারা নিরাকার থেকে সাকারে যায় তারা সেরূপ মনে করে না।' [প্র]

বারান্তরে আর একজন[২] বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের নামরূপের ধ্যানজপ তাঁহার ভাল লাগে না, সর্বব্যাপী চৈতন্যের দিকেই তাঁহার মনের গতি। শরৎ মহারাজ তাহাতে বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরকেই সর্বব্যাপী চৈতন্যরূপে চিন্তা করবে।' [প্র]

শরচ্চন্দ্রকে তাঁহার পরমাত্মীয়রূপে ধরা দিয়াই ঠাকুর নিবৃত্ত হইলেন না ; ইহাও তিনি জানাইয়া দিলেন যে, জন্মজন্ম ধরিয়া শরৎ তাঁহারই, আর তিনিও শরতের। ইতঃপূর্বে ঋষিকৃষ্ণ-অবতারে শরৎ তাঁহার ইষ্টসাধন করিবার জন্য দেহধারণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভক্তকেও ঠাকুর বলিয়াছেন, 'শশী আর শরৎকে দেখেছিলুম, ঋষিকৃষ্ণের দলে ছিল।' 'যারা অন্তরঙ্গ তাদের দুটি জিনিষ জানলেই হল, প্রথম আমি কে, তারপর তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি।'—ইহা ঠাকুরের শ্রীমুখের কথা।

* * *

সপ্তাহে একদিন, সাধারণতঃ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার, শরচ্চন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। কলেজ বন্ধ থাকিলে ঐ নিয়মেব ব্যতিক্রম হইত এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাসও করিতেন। ঠাকুরের একদিনের দিব্যসঙ্গ একপক্ষ কাল তাঁহার মন অধিকার করিয়া ঈশ্বরীয় ভাবে পুর্ণ করিয়া রাখিত।

সেবাকার্যে নিষ্ঠাবান শরচ্চন্দ্রের ছোটখাট সেবা গ্রহণ করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেন আর নিজেও সুখী হইতেন। শান্তপ্রকৃতি শরৎ ঠাকুরের আদিষ্ট সকল কাজই অতি সন্তর্পণে মৃদু হস্তপদ সঞ্চালনে

২ স্বামী সারদেশানন্দ।

সম্পন্ন করিতেন। রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর উহা হুবহু নকল করিয়া সকলকে, বিশেষতঃ শরচ্চন্দ্রকে হাসাইতেন।

শরতের সেজদিদি শ্রীমতী কাদম্বিনীর হাতের রান্না অতি উত্তম জানিতে পারিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'একদিন একটা তরকারী আনিস দিকি।' শরচ্চন্দ্র আনিয়া দিলে ঠাকুর খাইয়া বলিলেন, 'চমৎকার, বেশ হাত।' তদবধি কাদম্বিনীর রান্না তরকারী মাঝে মাঝে শিমলার চাষাধোবাপাড়া হইতে দক্ষিণেশ্বরে আনীত হইতে লাগিল।

শরচ্চন্দ্র ধনীর সন্তান; চিরদিন দিয়াই আসিয়াছেন, প্রতিগ্রহ করেন নাই। ঠাকুর তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা করিতে পাঠাইতেন; বলিতেন, 'ভিক্ষার অন্ন বড় পবিত্র।' শরৎ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া রন্ধন করিলে কখন কখন তিনি অগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া সেবকের মনস্কামনা পুর্ণ করিতেন। কখনো বা ঠাকুর শরচ্চন্দ্রকে গান গাহিতে বলিতেন, আর শরৎ সুমিষ্টকণ্ঠে প্রাণ ঢালিয়া গাহিতে থাকিলে শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। [লী ২।৪][৩]

মাঝে মাঝে ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুর নিজের দিব্যোন্মাদ ও সাধনার কথা, দর্শন ও উপলব্ধির কথা, দেহতত্ত্ব ও কুলকুণ্ডলিনীর কথা অনর্গল বলিয়া যাইতেন, আর মেজেতে পাতা মাদুরের উপর বসিয়া শরচ্চন্দ্র একচিত্ত হইয়া উহা শ্রবণ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের

---

৩ শরচ্চন্দ্র নরেন্দ্রনাথের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। একদিন নরেন্দ্রনাথের ঘরে উপস্থিত হইয়া ও তাঁহাকে অধ্যয়নরত দেখিয়া শরৎ কহিলেন, 'পড়াশোনা এখন রাখ, একটু গান গাও শুনি।' অমনি নরেন্দ্রনাথ তানপুরাটা লইয়া সুর বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, 'তবে তুই বাঁয়াটা নে।' শরৎকে তখন স্বীকার করিতে হইল যে ঐ বিদ্যা তাঁহার আয়ত্ত নহে। 'খুব সোজা' বলিয়াই মুখে বোল বলিতে বলিতে ও হাতে বাজাইয়া দেখাইয়া নরেন্দ্র একদিনেই কয়েকটি ঠেকা অভ্যাস করাইলেন। এইরূপে, শিক্ষাদানের কৌশলে, তিনি অল্পদিনেই তবলার সব ঠেকাগুলি শরৎকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

পাঁচটি খণ্ড এই শ্রবণকীর্তনরূপ সুধাফলের সঞ্জীবনরসে সিক্ত হইয়া আছে।

কিছুদিন এইরূপে কাটিয়া যাওয়ার পর একদা নিভৃতে ঠাকুর শরচ্চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কোন্ ভাব ভাল লাগে?' শরৎ উত্তর দিলেন, 'গণেশের ভাব।' শরচ্চন্দ্রের আপন লেখা হইতে জানা যায় "গজতুণ্ডাস্ফালিতবদন লম্বোদর দেবতাটির" উপর পূর্বে তাঁহার বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না; পরে ঠাকুরের মুখে গণেশের কাহিনী শুনিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, গণেশ জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য। স্ত্রীমূর্তি জীবসমূহ স্বীয় জননীর অংশে এবং পুংমূর্তি জীবসমূহ পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া গণেশ বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। 'শিবশক্ত্যাত্মকং জগৎ'—এই জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরকাল ব্রহ্মচারীই থাকিয়া যান।

কথিত আছে শরতের উত্তর শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'না, গণেশের ভাব তোমার নয়, তোমার শিবের ভাব। শক্তি তোমার ইষ্ট। তোমার ইষ্ট—তোমার শক্তিসামর্থ্য যা কিছু সব (নিজের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া) এইখানে।'

স্থূলদেহবুদ্ধিসম্বদ্ধ সাধারণ মানুষ আমরা এসকল দেববাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে সহজেই অপারগ। ভাববিশেষের ভিতর দিয়া স্বয়ং ভগবান ভক্তকে ধরা দিয়া কৃতার্থ করেন। তাঁহার অনন্ত ভাবরাজ্যের প্রধান প্রধান ভাব, বা সমজাতীয় ভাবসমূহের মধ্যে তরতম বিভেদ, ঠিক ঠিক ধরিতে বুঝিতে পারা তত্তদ্ভাবের সিদ্ধ সাধক ভিন্ন অপরের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

শরচ্চন্দ্রের ইষ্ট নির্দেশ করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত থাকেন নাই। ইষ্ট-প্রাপ্তির সাধন বা মন্ত্রাদিও তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, সাধনায় নিযুক্ত রাখিয়া পদে পদে পথের বিঘ্নসমূহ স্বয়ং বিদূরিত করিয়াছিলেন, এবং

পরিশেষে ইষ্টসাক্ষাৎকার বা তৎসাযুজ্যে উপনীত করিয়া তাঁহাকে কৃতকৃত্য করিয়াছিলেন। কতদিন ধরিয়া এই ভাঙ্গাগড়ার কাজ চলিয়াছিল তাহার কিছুই বলিবার উপায় নাই। ব্যক্তিগত সাধনা, উহার বিভিন্ন ক্রম বা স্তরে লব্ধ অনুভূতি ও পরিণামে বস্তুলাভ ইত্যাদি বিষয়ে ঠাকুরের সকল শিষ্যেরাই নীরব দেখিতে পাওয়া যায়। ঐসকল প্রকাশ করিতে শ্রীগুরুর নিষেধ ছিল।

যাহা হউক, ঠাকুরের নির্দেশে, অন্যের অগোচরে, শরচ্চন্দ্র বেলতলা, পঞ্চবটী, কালীমন্দির ইত্যাদি স্থানে বহু ধ্যানজপ করিয়াছিলেন। কখন কখন তাঁহাকে ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে লইয়া ঠাকুর স্বগৃহে তান্ত্রিক চক্রের অনুষ্ঠান করিতেন, একথা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর উক্তি হইতে জানা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা সমীচীন বোধ করিতেছি। শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ভক্তগণের শ্রীশ্রীমা পরবর্তী কালে বলিয়াছেন, 'শরৎ আর যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।' ঠাকুর ও মা যে অভেদ একথা তাঁহাদের উভয়েরই শ্রীমুখের বাণীতে সুপ্রকাশ। সুতরাং এই বিশেষ নির্দেশের কারণ অনুমান করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। ঠাকুরের তিরোভাব ঘটিলে পরপর ঐ দুই মহাপুরুষই মায়ের সন্নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবার কঠিন দায়িত্ব-ভার দীর্ঘকাল যাবৎ বহন করিয়াছেন, বাহ্যতঃ এইমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ঠাকুরের আদেশে মাতাঠাকুরাণী স্বয়ং তাঁহার একতর অন্তরঙ্গ ও সেবক শ্রীযোগীন্দ্রকে ৺বৃন্দাবনে মন্ত্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং অন্য-তরের বেলায়ও ঐরূপ করিয়া থাকিবেন, অর্থাৎ তাঁহাকেও মন্ত্রাদি দিয়া থাকিবেন, কেহ কেহ লেখকের কাছে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। কলিকাতায়

মায়ের বাড়ীতে একদিন মায়ের এক দুর্বিনীত শিষ্য বলিয়া ফেলিয়াছিল, 'শরৎ মহারাজ আবার কে, তিনি তো আমারই গুরুভাই।' সেকথা শুনিতে পাইয়াই মহারাজ উত্তর করিয়াছিলেন, 'আমি কি বলচি যে গুরুভাই নই ?' এই জাতীয় উক্তি-প্রত্যুক্তি একটা ভাবের দিক দিয়াও হইয়া থাকিতে পারে।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুরের অধিকাংশ ভক্তেরাই শ্রীশ্রীমাকে একদিনও চাক্ষুষ দর্শন করিতে পান নাই। মায়ের অন্তরঙ্গ সেবকদ্বয় কিন্তু দুর্লভ এই সৌভাগ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত ছিলেন না। গভীর নিশীথে পঞ্চবটীর দিকে যাইবার কালে যোগীন্দ্র নহবতঘরের বারান্দায় সমাধিমগ্না মায়ের মুক্তকেশী রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। আর শরৎ দেখিয়াছিলেন অন্নপূর্ণা-মূর্তি—মা অন্নথালা হাতে করিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইতে আসিয়াছেন, তাঁহার সিঁথায় সিন্দুর ও পরিধানে কস্তাপেড়ে লাল শাড়ী। বরাবর তিনি মাকে এই অন্নপূর্ণারূপেই চিন্তা করিতেন, নিজে বলিয়াছেন।

মানুষের মনের গড়ন বা সংস্কারাবলীর পরিচয় তাহার অঙ্গলক্ষণে পরিস্ফুট হয়। 'মন সৃষ্টি করে এ শরীর।' সৃষ্ট শরীর তেমনি আবার মনের বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে। মন্দলক্ষণাক্রান্ত শরীর মনের মহত্তর পরিণতি বা বিকাশের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। ঠাকুর সেই কারণে তাঁহার শিষ্যগণের অঙ্গলক্ষণের উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতেন। কার্যকারণনিয়মে জগতের যাবতীয় ব্যাপার পরিচালিত হইলেও, মায়ার রাজ্যে অনেক গোল আছে—তিনি বলিতেন। মায়ার রাজ্যে দেহ ধারণ করিতে যাইয়া তাঁহার বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ শরচ্চন্দ্রের দেহ যোগিলক্ষণাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও একটি চক্ষু ট্যারা হইয়া যায়। ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার এই চক্ষুদোষ কাটাইয়া দিয়াছিলেন।[৫] ট্যারাচক্ষু লোক

দুষ্টবুদ্ধি হয়, ঠাকুর বলিতেন। শরৎ মহারাজের মত সরল উদার মহাপুরুষ জীবনে আমরা অল্পই দেখিয়াছি।

শরচ্চন্দ্ররূপী স্বীয় যন্ত্রটিকে শক্তিশালী ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িবার জন্য ঠাকুর যে কিরূপ ব্যগ্র ছিলেন, পূর্বোক্ত ঘটনায় তাহারও একটা আভাস পাওয়া যায়। কথিত আছে, একদিন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে শরচ্চন্দ্র ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া আছেন এমন সময় ঠাকুর আপন মনে পাদচারণ করিতে করিতে হঠাৎ আসিয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হন। ভক্তেরা ঐরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি জানিতে চাহিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'দেখলুম, ও কতটা ভার সইতে পারবে।'

---

৪ স্বামী ঋতানন্দের জিজ্ঞাসার উত্তরে পূজনীয় হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) এইকথা প্রকাশ করেন।

৬

ঠাকুরের সেবা ও সাধনা

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র এফ্‌-এ পাস করেন। গিরীশচন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁহার প্রতিভাবান জ্যেষ্ঠপুত্র ডাক্তার হন, সেজন্য তিনি শরৎকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। নিজেদের প্রকাণ্ড ঔষধালয় থাকায় গিরীশচন্দ্রের পক্ষে এরূপ ইচ্ছা স্বাভাবিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, তিনি ডাক্তার ও উকিলের হাতে জলগ্রহণ করিতে পারেন না। সেজদিদির রান্না তরকারী শরৎ দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান ও ঠাকুর কত আহ্লাদ করিয়া খান, আর ঠাকুরের তৃপ্তিতে নিজেও অনির্বচনীয় তৃপ্তি অনুভব করেন—এখন হইতে কি উহার অবসান হইবে? সমস্যায় পড়িয়া শরচ্চন্দ্র নরেন্দ্রনাথের উপদেশ চাহিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন আইন পড়িতেছিলেন, তিনি ডাক্তারী পড়ার অনুকূলে অভিমত দিলে শরৎ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইলেন।

নরেন্দ্রনাথের বুদ্ধিবিবেচনার উপর শরচ্চন্দ্রের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাই জাগতিক ব্যাপারে নরেন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করাই তিনি সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সকল কথা জ্ঞাত হইয়া ঠাকুর যখন পরিষ্কার বলিয়া দিলেন, 'তুই ডাক্তার হলে তোর হাতে খেতে পারব না', তখন শরচ্চন্দ্র আবার সমস্যায় পড়িলেন। যাহা হউক, এই জটিল সমস্যার উপযুক্ত সমাধান করিয়া লইতে তাঁহার অধিক দিন বিলম্ব হইল না। তাঁহার জীবনদেবতাই, যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলী একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের অভিমুখে এযাবৎ পরিচালিত করিয়া আসিয়াছেন, এবিষয়ে তাঁহার

প্রধান সহায় হইলেন। ইহা সম্যক অনুধাবন করিতে হইলে আমাদিগকে এখন প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিতে হইবে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত হয়, তিনি গলায় একটি বেদনা অনুভব করিতে থাকেন। অধিক কথা কহিলে বা সমাধিস্থ হইলে বেদনা বৃদ্ধি পায় বলিয়া ডাক্তার ঐ দুই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে ভক্তদিগকে বলিয়া দেন।

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন পানিহাটিতে বৈষ্ণবগণের একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্বে কয়েকবার ঐ মহোৎসবে যোগদান করিয়া ঠাকুর কীর্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন, এই বৎসর তিনি তাঁহার ইংরাজী-শিক্ষিত ভক্তগণকে তথাকার 'আনন্দের মেলা—হরিনামের হাটবাজার' দেখাইয়া আনিতে অভিলাষী হইলেন। ভক্তগণের কেহ কেহ ইহাতে তাঁহার অসুখ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিয়া নিরস্ত করিতে চাহিলে ঠাকুর কহিলেন, 'ভাবসমাধি বেশী হলে গলার ব্যথাটা বাড়তে পারে বটে, একটু সামলে চল্লেই হবে।'

বহুভক্ত সমভিব্যাহারে ঠাকুর মহোৎসবক্ষেত্রে গমন করিলেন। প্রবীণ ভক্তেরা তাঁহাকে কীর্তনসম্প্রদায়সমূহের সহিত মিলিত হইয়া মাতামাতি না করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেও, কার্যকালে ঠাকুর সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ভাবাবেশে সংকীর্তনে যোগদান করিয়া কখনো সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতে, কখনো বা সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিয়াছেন, 'ঠাকুরের সঙ্গে একঘণ্টার কীর্তনে যা আনন্দ হত তাতে সারাজীবনের দুঃখকষ্ট পুষিয়ে যেত।' আজ তিনঘণ্টারও অধিককালব্যাপী কীর্তনোল্লাসে ভক্তেরা যে বস্তু পাইয়া গেলেন ওরসে চিরবঞ্চিত আমরা কিরূপে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারিব! বিশেষতঃ ঠাকুরের সেদিনকার ভাবোল্লাস ও নৃত্য

নাকি একটা স্বতন্ত্র রকমেরই ব্যাপার ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন ঃ

"ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের শরীরে সেই দিন যে দিব্যোজ্জ্বল সৌন্দর্য দর্শন করিয়াছি সেইরূপ আর কখনও নয়নগোচর হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। দেবদেহের সেই অপূর্ব শ্রী যথাযথ বর্ণনা করা মনুষ্যশক্তির পক্ষে অসম্ভব। ভাবাবেশে দেহের অতদূর পরিবর্তন নিমেষে উপস্থিত হইতে পারে একথা আমরা ইতিপূর্বে কখনও কল্পনা করি নাই। তাঁহার উন্নত বপু প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল, ভাবপ্রদীপ্ত মুখ-মণ্ডল অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চতুষ্পার্শ আলোকিত করিয়াছিল, এবং মহিমা করুণা শান্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই অনুপম হাসি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য সকল কথা ভুলাইয়া তাঁহার পদানুসরণ করাইয়াছিল। উজ্জ্বল গৈরিকবর্ণের পরিধেয় গরদখানি ঐ অপূর্ব অঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অগ্নিশিখাপরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল।" [লী ৫।১০]

পানিহাটি হইতে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিতে রাত্রি ৮টার অধিক হইয়া গেল, এবং ঠাকুরের ঘরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কলিকাতার ভক্তেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলে নৌকারোহণ করিতেছেন এমন সময় শরচ্চন্দ্রের মনে হইল জুতা ভুলিয়া আসিয়াছেন। উহা আনিবার জন্য তিনি পুনরায় ঠাকুরের গৃহাভিমুখে ছুটিয়া গেলে ঠাকুর ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ও পরিহাস করিয়া কহিলেন, 'ভাগ্যে নৌকা ছাড়বার আগেই মনে পড়ল, তা না হলে আজকের সমস্ত আনন্দটা ঐতেই পণ্ড হয়ে যেত।' শরৎ ঐ কথায় হাসিয়া তাঁহাকে প্রণামপুর্বক চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ কেমন দেখলি বল্ দেখি? যেন হরিনামের হাটবাজার বসেচে—না?' শরতের সম্মতিসূচক উত্তর পাইয়া, তিনি উৎসবস্থলে যেসকল ভক্তের ভাবাবেশ হইয়াছিল তাহাদের নামোল্লেখ করিলেন ও ছোট নরেন্দ্রের কথায় কহিলেন, 'কেলে ছোঁড়াটা অল্পদিন হয় এখানে আসা-

যাওয়া করচে, এরি মধ্যে তার ভাব হতে সুরু হয়েচে। সেদিন তার ভাব আর ভাঙ্গে না—এক ঘণ্টার উপর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। সে বলে তার মন আজকাল নিরাকারে লীন হয়ে যায়! ছোট নরেন বেশ ছেলে—না? তুই একদিন তার বাড়ীতে গিয়ে আলাপ করে আসবি—কেমন?' শরচ্চন্দ্র তাঁহার সকল কথায় সায় দিয়া কহিলেন, 'কিন্তু মশায়, বড় নরেনকে আমার যেমন ভাল লাগে এমন আর কাকেও না, সেজন্যে ছোট নরেনের বাড়ীতে যেতে ইচ্ছা হচ্চে না।' ঠাকুর বলিলেন, 'তুই ছোঁড়া তো ভারি একঘেয়ে! একঘেয়ে হওয়াটা হীনবুদ্ধির কাজ। ভগবানের পাঁচ ফুলে সাজি—তাঁর রকমারি ভক্ত। তাদের সবাইর সাথে মিলে আনন্দ করতে না পারাটা বিষম হীন-বুদ্ধির কাজ। তুই ছোট নরেনের কাছে একদিন নিশ্চয় যাবি—কেমন যাবি তো?' শরৎ সম্মতি জানাইয়া ও পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই শরচ্চন্দ্র ছোট নরেনের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ছোট নরেন সেদিন বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের প্রত্যেক কথা প্রত্যেকটি কাজ অপরের মঙ্গলেচ্ছা-প্রণোদিত ও স্বার্থগন্ধমাত্রশূন্য। ভক্তের মহিমা খ্যাপনের জন্য ভগবানই বুঝি বা তাঁহার মুখ দিয়া তখন কথা কহিতেছিলেন, নতুবা যে কথা শরচ্চন্দ্র নিজেও জানিতেন সেই কথাই অপরের মুখে শুনিয়া তিনি সেদিন এত অনুপ্রাণিত হইবেন কেন? 'আমাদের তিনি যা করতে বলেন আমাদেরই ভালর জন্যে বলেন; তাঁর নিজের কি স্বার্থ আছে ভাই?' ছোট নরেনের মুখনিঃসৃত ছোট এই কথাটুকু শরতের সেই জটিল সমস্যার গ্রন্থি তৎক্ষণাৎ উন্মোচিত করিয়া দিল। তিনি মেডিকেল কলেজ ছাড়িয়া দিলেন। চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন এইরূপে সূচনাতেই পরিত্যক্ত হইলেও শরচ্চন্দ্র বি-এ পড়িবার জন্য অপর কোনও

কলেজে ভর্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের লেখা হইতেই জানা যায় যে, চিকিৎসার্থ ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ঠাকুরকে যখন কলিকাতায় লইয়া আসা হয় তখন তিনি কলেজে পড়িতেছিলেন।

* * *

পানিহাটির মহোৎসবে যোগদানের ফলে ঠাকুরের গলার বেদনা বাড়িয়া গেল। মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছে, অথচ চিকিৎসায় কোনই ফল হইতেছে না দেখিয়া ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন। একদিন তাঁহারা বাগবাজারের জনৈক স্ত্রীভক্তের গৃহে নৈশভোজে আমন্ত্রিত হইয়া একত্র মিলিত হইয়াছেন, এমন সময় দক্ষিণেশ্বর হইতে একজন ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, ঠাকুরের কণ্ঠতালুদেশ হইতে রুধিরস্রাব হইয়াছে। তাঁহারা পরামর্শক্রমে স্থির করিলেন, ঠাকুরকে কলিকাতায় রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ঠাকুর কলিকাতায় আসিলেন এবং বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে সপ্তাহকাল থাকিয়া শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের ৫৫ নম্বর ভাড়াটে বাড়ীতে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রবীণ ভক্তেরা মিলিত-ভাবে ব্যয়ভার বহনের এবং নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যুবক ভক্তেরা সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। সুযোগ্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে চিকিৎসার্থ আনয়ন করা হইল। পথ্য প্রস্তুত করার সুবন্দোবস্ত হইতেছে না জানিতে পারিয়া মাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া আসিয়া, বহু অসুবিধার মধ্যেও, সেই ভার গ্রহণ করিলেন।

শ্যামপুকুরে যুবকভক্তগণের মধ্যে চারিপাঁচ জন মাত্র—শরৎ, শশী, কালী, ছোট গোপাল প্রভৃতি—শ্রীগুরুর প্রতি প্রেমে জীবনোৎসর্গ করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা বাড়ী হইতে আহার করিয়া আসিতেন, কিন্তু ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহারা কলেজে অধ্যয়ন ও বাড়ীতে যাওয়া

পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন অভিভাবকেরা প্রথমতঃ সন্দিগ্ধ ও পরে ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ছেলেদিগকে ফিরাইবার জন্য তাঁহারা ন্যায্য অন্যায্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রাণনা যুবকদিগকে কর্তব্যে অবিচল করিয়া রাখিল; এবং ঠাকুরের সেবা, সাহচর্য ও সাধনভজন ক্রমশঃ তাঁহাদের জীবনের গতিপথ ও লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করিয়া দিল।

কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির প্রকোপ বাড়িল বই কমিল না। কিন্তু তাঁহার শরীর যতই পড়িয়া যাইতে লাগিল, দিব্যভাবের প্রকাশ সেই অনুপাতে যেন বাড়িয়াই চলিল, এবং ঐ প্রকাশ সময় সময় দেখিতে পাইয়াই তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্তগণ নৈরাশ্য বোধ না করিয়া সমধিক উৎসাহ সহকারে তাঁহার সেবাকার্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ঐ প্রকাশ কখনো ভাগ্যবান ব্যক্তি-বিশেষের জন্য তাঁহার প্রতি করুণায়, কখনো বা সকল ভক্তেরই জন্য তাঁহাদের প্রতি অহেতুক ভালবাসায়, আসিয়া উপস্থিত হইত। বলরাম-ভবনে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গভাবাবেশে জনৈক গোস্বামিসন্তানের বুকে পা রাখিয়া তাঁহাকে পূর্ণকাম করেন—শরচ্চন্দ্র দেখিয়াছিলেন। শ্যামপুকুরে অনুরূপ যেসব ব্যাপার তিনি প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তন্মধ্যে একদিনেরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘটনা এইরূপ:

শ্রীরামকৃষ্ণের শয্যাপার্শ্বে গন্ধপুষ্প ধূপদীপ ও ফলমূলমিষ্টান্নরূপ নৈবেদ্য আনিয়া রাখা হইতেছে—আজ ৺শ্যামাপূজা। পূর্বদিনে ঠাকুর তাঁহার কোন কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'পূজার উপকরণ সংক্ষেপে সংগ্রহ করে রাখিস—কাল কালীপূজা করতে হবে।'

দেখিতে দেখিতে সূর্যাস্ত হইয়া রাত্রি সাতটা বাজিয়া গেল। ধূপ-

দীপ প্রজ্বলিত হওয়ায় সৌরভে ও আলোকে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল। ত্রিশজনের অধিক ভক্ত নীরবে বসিয়া একমনে ঠাকুরকে দেখিতে লাগিলেন—কেহ তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন, কেহ বা জগদম্বার চিন্তা করিতেছেন। এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইলেও ঠাকুর স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হইলেন না, বা পূজা করিবার জন্য কাহাকেও আদেশ দিলেন না। নিশ্চিন্তমনে স্থির হইয়া বিছানায় বসিয়া রহিলেন।

ইহাতে ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র ঘোষের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, ঠাকুরের দেবদেহরূপ চিন্ময় প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করিয়া ভক্তেরা আজ ধন্য হইবে বলিয়াই এই আয়োজন। অধীর উল্লাসে সহসা পুষ্পচন্দন লইয়া তিনি ঠাকুরের পাদ-পদ্মে জয় মা বলিয়া অঞ্জলি দিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল ও তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার জ্যোতির্ময় মুখে দিব্যহাসি ফুটিয়া উঠিল ও হস্তে বরাভয়মুদ্রা দেখা দিল। শরচ্চন্দ্র দেখিলেন, অন্যান্য ভক্তেরাও দেখিলেন, জ্যোতির্ময়ী দক্ষিণা মূর্তিতে দেবী সহসা তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন লইয়া ও ইচ্ছানুরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভক্তেরা প্রত্যেকেই শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিলেন। 'জয় মা! জয় মা!' শব্দে গৃহ মুখরিত হইল। স্তুতি ও প্রার্থনারূপে একে একে অনেকগুলি সঙ্গীত গীত হইল। ঠাকুর ক্রমে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন, এবং সম্মুখে ধৃত নৈবেদ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া ভক্তগণকে আশীর্বাদ করিলেন।

ঠাকুরের সেই "দিব্যহাস্যফুল্ল প্রসন্ন আনন ও বরাভয়যুক্ত করদ্বয়" শরচ্চন্দ্রের প্রাণে চিরজাগরূক হইয়া রহিল—অনাগত ভবিষ্যতের দুঃখদুর্দিনে তাঁহার জীবন যে সর্বথা দেবরক্ষিত এই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য।

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শরচ্চন্দ্রকে সাকার ও নিরাকার ধ্যানের উপযোগী আসন ও অঙ্গ-সংস্থান দেখাইতে লাগিলেন। "পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া বাম করতলের উপরে দক্ষিণ করপৃষ্ঠ সংস্থাপনপূর্বক ঐভাবে উভয় হস্ত বক্ষে ধারণ ও চক্ষু নিমীলন করিয়া" বলিলেন, 'সব রকম সাকার ধ্যানের এটি প্রশস্ত আসন।' "ঐ আসনেই উপবিষ্ট থাকিয়া বাম ও দক্ষিণ হস্তদ্বয় বাম ও দক্ষিণ জানুর উপরে রক্ষাপূর্বক প্রত্যেক হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত ও অপর সকল অঙ্গুলি ঋজু রাখিয়া এবং ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করিয়া" বলিলেন, 'নিরাকার ধ্যানের এটি প্রশস্ত আসন।' বলিতে না বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে জোর করিয়া মনকে সাধারণ জ্ঞানভূমিতে নামাইয়া কহিলেন, 'আর দেখানো হল না। আসন করে বসলেই উদ্দীপনা হয়ে মন সমাধিতে ডুবে যায় আর বায়ু উপরে উঠে গলার ঘায়ে আঘাত লাগে। তাইতো যাতে সমাধি না হয় তার জন্যে ডাক্তার অত করে বলে গেছে।' শরৎ কাতর হইয়া কহিলেন, 'আপনি কেন দেখাতে গেলেন, আমি তো দেখতে চাই নি।' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'তা তো বটে, কিন্তু তোদের একটু আধটু না বলে, না দেখিয়ে থাকতে পারি কৈ?'

* * *

কলিকাতার দূষিত বায়ু ঠাকুরের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের প্রতিকূল বিবেচিত হওয়ায় ডাক্তার স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন এবং ভক্তেরা কলিকাতার এক ক্রোশ উত্তরে কাশীপুরে বৃহৎ এক উদ্যান-বাটী ভাড়া করিয়া ঠাকুরকে তথায় লইয়া আসিলেন। সেদিন ১১ই ডিসেম্বর, শুক্রবার। ফল-পুষ্প-সরসীশোভিত সেই উদ্যান ও প্রশস্ত দ্বিতল বসতবাটী দেখিয়া ঠাকুর ও মাতাঠাকুরাণী আনন্দিত হইলেন

বলিয়া মনে হইল এবং তাঁহাদের আনন্দে সেবকগণের মনও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

কলিকাতা হইতে দূরবর্তী স্থানে, নূতন পরিবেশে, ছোট বড় অসুবিধা কাটাইয়া সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে কয়েক দিন লাগিল। শরচ্চন্দ্র-প্রমুখ যুবকেরা সকল কাজের শৃঙ্খলা না হওয়া পর্যন্ত স্বল্পকালের জন্যও স্বগৃহে গমন করেন নাই। যাঁহারা নিতান্ত প্রয়োজনে গিয়াছিলেন তাঁহারা কয়েক ঘণ্টা পরেই ফিরিয়াছিলেন; এবং বাড়ীতে এই সংবাদটিও কোনরূপে দিয়াছিলেন যে, ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা আর পূর্বের ন্যায় গৃহে যাতায়াত করিতে পারিবেন না। অভিভাবকেরা যে একথা শুনিয়া সুখী হইতে পারেন নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। ছেলেদের মাথা বিগড়াইয়াছে ভাবিয়া, এবং তাড়াহুড়া করিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বুঝিয়া, তাঁহারা ছেলেদের আচরণ আপাততঃ সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে যুবক ভক্তেরা প্রায় সকলেই কাশীপুরে আসিয়া জুটিলেন। ঠাকুরের সেবাকাল ছাড়া অপর সময়ে নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে ধ্যান ভজন শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদিতে এমনভাবে নিযুক্ত রাখিতেন যে, সময় কোথা দিয়া যাইতেছে তাঁহারা বুঝিতেই পারিতেন না। ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা এবং নরেন্দ্রনাথের সখ্য ও উন্নত-সঙ্গ একত্র মিলিয়া অচ্ছেদ্য এমন এক বন্ধনে তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিল যে, এক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও পরস্পরকে তাঁহারা অধিকতর আপনার জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঠাকুরের দেহের অসুখকে নিমিত্ত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণসংঘরূপ মহামহীরুহ জন্মগ্রহণ করিল, যাহার শীতল ছায়ায় বসিয়া সংসারের তাপদগ্ধ নরনারী, অনাগত ভবিষ্যতের বুকে দীর্ঘকাল ধরিয়া, জুড়াইতে থাকিবে।

পর্যায়ক্রমে প্রভুর পরিচর্যা করিয়াও শরচ্চন্দ্র অপরকে বিশ্রাম দিবার জন্য তাহার হইয়াও পরিচর্যা করিতেন। গৃহী ও ব্রহ্মচারী ঠাকুরের সব ভক্তেরাই একযোগে ও একান্ত নিষ্ঠায় সেবাব্রতে যোগদান করায় সকল কাজ যন্ত্রচালিতবৎ সুষ্ঠু নিষ্পন্ন হইতেছে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ দুইএক দিনের জন্য বাড়ী যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। রাত্রে একথা সকলকে জানাইয়া তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া পড়িলেন, এবং শরৎ ও গোপাল জাগিয়া আছেন দেখিয়া কহিলেন, 'চল, বাগানে বেড়াই আর তামাক খাই।' বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন, 'ঠাকুরের যে ভীষণ ব্যাধি, তিনি দেহরক্ষার সংকল্প করেচেন কিনা কে বলতে পারে? সময় থাকতে তাঁর সেবা আর ধ্যানভজন করে যে যতটা পারিস আধ্যাত্মিক উন্নতি করে নে, নতুবা তিনি সরে গেলে পরিতাপের সীমা থাকবে না। এটা করার পরে ভগবানকে ডাকব, ওটা হয়ে গেলে সাধন-ভজনে লাগব, এই করেই তো দিনগুলো যাচ্চে আর বাসনাজালে জড়িয়ে পড়চি। বাসনাতেই সর্বনাশ, মৃত্যু—বাসনা ত্যাগ কর্, ত্যাগ কর্।'

"পৌষের শীতের রাত্রি নীরবতায় ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। উপরে অনন্ত নীলিমা শতসহস্র নক্ষত্রচক্ষে ধরার দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। নীচে সূর্যের প্রখর কিরণসম্পাতে উদ্যানের বৃক্ষতলসকল শুষ্ক এবং সম্প্রতি সুসংস্কৃত হওয়ায় উপবেশনযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। নরেন্দ্রের বৈরাগ্যপ্রবণ ধ্যানপরায়ণ মন যেন বাহিরের ঐ নীরবতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইতে লাগিল।" [লী ৫। পরিশিষ্ট] তিনি এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন, এবং ঘাসপাতা ও ডালপালার এক শুষ্কস্তূপ নিকটেই আছে দেখিয়া কহিলেন, 'দে ওতে আগুন ধরিয়ে। সাধুরা এই সময়ে গাছের

তলায় ধুনি জ্বালে ; আয় আমরাও তেমনি ধুনি জেলে মনের গোপন বাসনা সব পুড়িয়ে দিই।'

অগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং সেই অগ্নিতে শুষ্ক ইন্ধন আহুতি দিয়া, বাসনাসমূহ দগ্ধ করিতেছি ভাবিয়া, তরুণ সাধকেরা অপূর্ব উল্লাস অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, সত্য সত্যই পার্থিব বাসনাসমূহ ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মন প্রসন্ন নির্মল হইয়া শ্রীভগবানের সামীপ্য লাভ করিতেছে। এইরূপে দুইতিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সুবিধা পাইলেই পরে পরে আবার ধুনি জ্বালাইবেন স্থির করিয়া তাঁহারা যখন শয়ন করিতে ঘরে গেলেন, রাত্রি তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী আসিয়া উপস্থিত হইল। কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করায় ঠাকুর মুক্তবায়ুতে কিছুক্ষণ বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং অপরাহ্ণ তিনটার সময় সেবক লাটুর সঙ্গে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া, নীচেকার হলঘরটি দেখিয়া, উদ্যানের পথে অগ্রসর হইলেন। সেদিন ছুটি থাকায় বহু গৃহী ভক্ত সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ সানন্দে ঠাকুরকে অনুসরণ করিতেছেন দেখিয়া লাটু ফিরিলেন এবং শরচ্চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঠাকুরের বিছানাপত্র রৌদ্রে দিতে ও তাঁহার থাকিবার ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে ব্যাপৃত হইলেন।

ঠাকুর দক্ষিণমুখে চলিয়া, বসতবাটী ও ফটকের মধ্যপথে গিরিশ, রাম প্রভৃতি ভক্তগণকে দেখিতে পাইয়া দাঁড়াইলেন। গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত বিশ্বাসপূর্ণ বাক্য নিমিত্ত করিয়া তাঁহাতে দিব্য কল্পতরুভাবের প্রকাশ হইল, এবং 'চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া, উপস্থিত প্রায় সকলেরই বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের সুপ্ত চৈতন্যকে জাগাইয়া দিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইল ;

ভাবাবেশে কেহ হাসিতে, কেহ কাঁদিতে, কেহ ধ্যান করিতে, কেহ বা অহেতুক দয়ানিধির কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য অপর সকলকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেদিনকার এই 'পাগলের মেলা'য় ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা কেহই উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাদের কেহ কেহ রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত থাকায় ঘুমাইতেছিলেন, কেহ বা স্থানান্তরে কর্মরত ছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ঠাকুর আগে বহু তপস্যা তাঁহাদের দ্বারা করাইয়া লইবেন, এবং সেই তপস্যা দ্বারা আধার সুসংস্কৃত ও শক্তিসম্পন্ন করিয়া মহামূল্য অধ্যাত্মরত্নরাজি তাহাতে রক্ষা করিবেন বলিয়াই তাঁহার ইচ্ছায় ঐরূপ সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহাদের চরিত্র দেখিয়া এরূপ মনে হয় না যে, ঠাকুরের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন ঠাকুর তাঁহাদেরই আর ঠাকুরের সম্পত্তির প্রধান উত্তরাধিকারীও তাঁহারাই।

তীব্র বৈরাগ্যে সাংসারিক উন্নতির কামনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নরেন্দ্রনাথ এইকালে ঠাকুরের নিকট বাস করিতেছিলেন এবং তৎকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য নানা প্রকার সাধনায় মগ্ন রহিতেন। বৃক্ষতলে ধুনি জ্বালাইয়া সমস্ত রাত্রি ধ্যান জপ ভজন পাঠ ইত্যাদি লইয়া তিনি থাকিতেন; আর শরৎ, কালী ও ছোট গোপাল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন এবং নিজেরাও যথাসাধ্য ধ্যানভজন করিতেন।

গঙ্গাসাগরযাত্রী সন্ন্যাসীদের কলিকাতায় সমাগম হইয়াছে দেখিয়া বুড়োগোপালের ইচ্ছা হইয়াছিল নববস্ত্র ক্রয় করিয়া তাঁহাদিগকে দান করিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ঠাকুর তাঁহার সন্নিহিত সেবকগণকে দেখাইয়া কহিলেন, 'এদের মত সাধু কোথায় পাবে তুমি?

যদি সাধুদের কাপড় দিতে চাও তো এদের দাও।' তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী বুড়োগোপাল গৈরিকরঞ্জিত করিয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা লইয়া আসিলে, ঠাকুর স্বহস্তে তাঁহার একাদশ জন সেবকশিষ্যকে ঐ গৈরিক বস্ত্র ও মালা প্রদান করেন।[১]

এইকালে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সঙ্গে দিবারাত্র বুদ্ধদেবের অদ্ভুত জীবন, সংসারবৈরাগ্য ও ত্যাগতপস্যার কথা আলোচনা করিতেন। নীচেকার যে ছোট ঘরটিতে তাঁহারা সর্বদা উঠাবসা করিতেন তাহার দেয়ালে ললিতবিস্তরের এই শ্লোকটি লিখিয়া রাখা হইয়াছিল ঃ

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥

একদিন গৈরিক ধারণ করিয়া ও সকলকে জানিতে না দিয়া নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ বুদ্ধগয়ায় চলিয়া গেলেন। তিনি আর সংসারে ফিরিবেন না মনে করিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত গুরুভ্রাতারা ইহাতে বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং শরচ্চন্দ্র তাঁহার সহিত মিলিত হইবার মানসে বুদ্ধগয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। ঠাকুর তাঁহার মানস-পুত্র শ্রীরাখালের মুখে এই কথা শুনিতে পাইয়া শরৎকে কহিলেন, 'কেন ভাবচিস? কোথায় যাবে সে? কদিন বাইরে থাকতে পারবে? দেখ্ না এল বলে।' তারপর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিছু নাই। যা কিছু আছে সব

---

১ যাঁহাদিগকে ঠাকুর স্বয়ং গেরুয়া দিয়াছিলেন ঃ নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, বুড়োগোপাল, কালী, শশী, শরৎ।

একখানি বস্ত্র বাকি থাকে অবশেষে।
পরদিনে দান কৈলা শ্রীগিরিশ ঘোষে॥

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

(নিজের শরীর দেখাইয়া) এইখানে।' শরচ্চন্দ্রের মন ঠাকুরের এই কথায় নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। দিন কয়েক পরেই নরেন্দ্রনাথও কাশীপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। [লী ২।৩]

শিবরাত্রির দিন শরচ্চন্দ্র-প্রমুখ তিনচারি জন যুবক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বেচ্ছায় ব্রতোপবাস করিলেন এবং সমস্ত রাত্রি পুজা ও ধ্যানভজন করিয়া কাটাইলেন। গোলমালে ঠাকুরের আরামের ব্যাঘাত যাহাতে না ঘটে তজ্জন্য বসতবাটীর পুর্বদিকে অবস্থিত ও রন্ধনশালার জন্য নির্মিত একটি গৃহে পুজার আয়োজন করা হইয়াছিল।

* * *

সংসারসম্পর্ক ভুলিয়া এইরূপে শরচ্চন্দ্র যখন ঠাকুরের সেবায় ও তদুপদিষ্ট সাধনায় কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন, এবং সেবানন্দে ও ভজনানন্দে মাসের পর মাস কোথা দিয়া যে চলিয়া যাইতেছে তাহা বুঝিতেও পারিতেছেন না, তাঁহার অভিভাবকেরা তখন তাঁহাকে গৃহে ফিরাইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পিতার অনুযোগ, মাতার অশ্রু ও দিদির স্নেহ-ব্যাকুলতা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। মৌন উদাসীনতায় তিনি তাঁহাদের সকল জিজ্ঞাসাই এড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা গিরীশচন্দ্র তখন কৌশলে কার্যসিদ্ধি করিতে মনস্থ করিলেন এবং একদিন সিদ্ধ তান্ত্রিক বলিয়া কথিত স্বীয় গুরুদেব পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকে সঙ্গে লইয়া পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য—তর্কালঙ্কার মহাশয় শরতের সমক্ষে সাধনরহস্য সম্বন্ধে গুটিকতক নিগূঢ় ও কঠিন প্রশ্ন পরমহংসদেবকে করিবেন ; তিনি যদি ঐসকল প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন, আর পারিবেন না তো নিশ্চয়ই, তাহা হইলে উহাতেই কাজ হইবে—তাঁহার বুদ্ধিমান পুত্র তখন বিগতমোহ হইয়া সংসারে ফিরিবে। কিন্তু

তাহাতে ফল হইল বিপরীত; জগন্মোহন তুইচারিটি কথা কহিয়াই কি বুঝিলেন বলিতে পারি না, অন্তরালে গিরীশকে বলিলেন, 'শরৎ যে আশ্রয় পেয়েচে, আমি কোন মতেই তাকে তা ছাড়তে বলতে পারব না।'

শরতের মহাপুরুষসংশ্রয় লাভ হইয়াছে ও গুরুসেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন ইহা অতীব সৌভাগ্যের কথা, আর মনুষ্য-জন্মের ইহাতেই সার্থকতা—জগন্মোহনের উক্তিতে এইরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াও গিরীশ নিরস্ত হইতে পারিলেন না, তিনি এখন পুত্রকে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরবর্তী কালে শরৎ মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেনঃ আমার বিবাহের জন্যে বাবা ঠাকুরকে বলচেন, 'আপনি একটু বল্লেই ও বিয়ে করবে।' আমি সেকথা শুনেই বল্লুম, 'উনি বল্লেই আমি বিয়ে করব কিনা! যা কর্তব্য মনে করেচি, উনি অনুরোধ করলেও তার অন্যথা হবে না।' ঠাকুর শুনে এক গাল হেসে বল্লেন, 'শুনেচ, ও কি বলে? আমি আর কি করব!' [প্র]

সংসারে যে অনেকের প্রিয়পাত্র সে যদি ঈশ্বরের অভিমুখে যায় তো অজ্ঞাতসারে তাহাদের মনকেও সেইদিকে আকর্ষণ করে। মায়িক ভালবাসা এইরূপেই সার্থকতা লাভ করে এবং অনিত্য সম্পর্ক ক্রমে নিত্য সম্পর্কে পরিণত হয়। শরচ্চন্দ্রের জননী ও ভ্রাতারা—তাঁহাদের অনেকেই তখন নেহাৎ ছোট—ক্রমে ক্রমে ঠাকুরের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।[২]

তাঁহার জননী নীলমণি দেবী ও অনুজ চারুচন্দ্র ঠাকুরকে দর্শন করিতে কাশীপুরে কয়েকবার আসিয়াছিলেন। দাদা যে মহাপুরুষের

২ শরচ্চন্দ্রের চারুচন্দ্র-প্রমুখ পাঁচ সহোদর ভাই পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন।

কাছে থাকেন তাঁহাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া চারুচন্দ্র যেদিন প্রথম কাশীপুরে আসেন, ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হন এবং কাছে বসাইয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা ও অনেক সতুপদেশ দান করেন। শরচ্চন্দ্র ঐসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেলেটি তোর ভাই?' তিনি স্বীকার করিলে আবার কহিলেন, 'বেশ ছেলে, তোর চেয়ে এর বুদ্ধি বেশী। দেখি সদ্‌বুদ্ধি কি অসদ্‌-বুদ্ধি।' তারপর চারুচন্দ্রের ডান হাতের কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্যন্ত অংশ নিজের হাতের উপর রাখিয়া ওজন করিতে করিতে কহিলেন, 'সদ্‌বুদ্ধি।' পুনরায় ঠাকুর শরচ্চন্দ্রকে প্রশ্ন করিলেন, 'একেও টানব নাকি রে, কি বলিস?' 'বেশ তো মশায়, তাই করুন' —শরতের এই উত্তর শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তার পর ঠাকুর কহিলেন, 'না—থাক। একটাকে নিয়েচি, আবার এটাকেও নিলে তোর বাপ-মার বড় কষ্ট হবে—বিশেষতঃ তোর মার। জীবনে অনেক শক্তিকে রুষ্টা করেচি, এখন আর কাজ নাই।' তারপর চারুচন্দ্রকে কহিলেন, 'যে বুদ্ধিতে ভগবান লাভ হয় সেই বুদ্ধি ঠিক। আর যে বুদ্ধিতে সংসারের উন্নতি হয়—টাকা হয়, বাড়ী হয়, সে বুদ্ধি হীন বুদ্ধি।' চারুচন্দ্র কথাগুলি প্রাণে প্রাণে গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া দিলেন।

* * *

দীর্ঘকাল ঠাকুরের কাছে থাকিয়া শরচ্চন্দ্র অনেক কিছুই দেখিবার শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সেই দর্শনাদি হইতে সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার তিনি যোগ্য পাত্রের জন্য উন্মুক্ত রাখিতেন। পরবর্তী কালে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিতে স্বামী জগদানন্দ শুনিয়াছিলেন—জগদানন্দজী বেদান্তের অধ্যাপনা করিতেন:

"কোন বিলাতফেরৎ ডাক্তার ঠাকুরের অসুখের সময় তাঁর কাছে

এসেচেন। ঠাকুরের শরীর বিশেষ অসুস্থ দেখে তিনি বল্লেন, 'আপনার শরীর অসুস্থ, তা না হলে আমি আপনার কাছে অনেক শিখতে পারতুম, আপনিও আমার কাছে অনেক শিখতে পারতেন।' কথা-প্রসঙ্গে পুনঃপুনঃ তিনবার এই কথা আবৃত্তি করাতে অবশেষে ঠাকুর উত্তর দেন, 'তোমার কাছে আমার কিছুই শিখবার নাই।'

"মহেন্দ্র-ডাক্তার ঠাকুরকে দেখতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন?' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'যেমন ছিলুম ঠিক তাই আছি। যেমন ছিলুম ঠিক তাই যদি রইলুম তো চিন্তা কি?'"

সেবাপ্রয়োজনে দীর্ঘকাল ঠাকুরের কাছে থাকিয়া নিজ জীবনে শরচ্চন্দ্র যেসব অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, স্বভাবতই সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতে তিনি চাহিতেন না। তথাপি অপরের কথা বলিতে যাইয়া, উহারই মাধ্যমে, তিনি যে স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। লীলাপ্রসঙ্গের একস্থলে গৃহস্থভক্তগণ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন—কেমন করিয়া, নিজেদের দুঃসময়েও, ঠাকুরের সেবার ব্যয়ভার বহনের প্রেরণা তাঁহারা লাভ করিতেন—সেই কথার মধ্যে তাঁহার নিজের অনুভূতি দেদীপ্যমান। তিনি লিখিয়াছেন:

"ঠাকুরের অসাধারণ অলৌকিকত্ব তাঁহাদিগের প্রাণে যে দিব্য আশা, আলোক, আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল, কেবলমাত্র তাহারই প্রেরণায় তাঁহারা ভবিষ্যতের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পূতধারা যে সর্বক্ষণ একটানে বহিতে থাকিবে এবং ভবিষ্যতের ভাবনা উহার ভাঁটার সময়ে তাঁহাদিগকে বিকল করিবে না, একথা বলিতে যাওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক। ফলে ঐরূপ হয়ও নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐরূপ সময় উপস্থিত হইলেই তাঁহারা ঠাকুরের ভিতরে এমন নবীন আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল দেখিতে পাইতেন যে, ঐ দুর্ভাবনা কোথায় বিলীন হইয়া যাইত এবং তাঁহাদিগের অন্তর পুনরায় নূতন উৎসাহ ও বলে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তখন আনন্দের উদ্দাম উল্লাসে যেন বিচারবুদ্ধির অতীত ভূমিতে আরোহণপূর্বক তাঁহারা

দিব্যালোকে দেখিতে পাইতেন যে, যাঁহাকে তাঁহারা জীবনপথের পরম অবলম্বনস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তিনি…জীবকুলের পরমগতি—দেবমানব নারায়ণ! তাঁহার জন্ম কর্ম তপস্যা আহার বিহার, এমন কি দেহের অসুস্থতানিবন্ধন যন্ত্রণাভোগ পর্যন্ত, সকলই বিশ্বমানবের কল্যাণের নিমিত্ত। নতুবা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যধি-দুঃখদোষাদির অতীত সত্য-সঙ্কল্প পুরুষোত্তমের দেহের অসুস্থতা কোথায়? সেবাধিকার প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ করিবেন বলিয়াই তিনি অধুনা ব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। [লী ৫।১২।২]

উপরিধৃত উদ্ধৃতির শেষাংশের কথাগুলি যে শরচ্চন্দ্রের প্রাণের কথা একদিনের অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। জীবের পাপতাপের ভোগ নিজদেহে গ্রহণ করিয়া পরমকরুণ শ্রীরামকৃষ্ণ যে দুঃসহ ব্যাধির যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন সেই ব্যাধির ঔষধ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। দুর্বলচেতা দেহসর্বস্ব জীব ঐ ভীষণ ব্যাধির সংক্রমণের ভয়ে ভীত হইবে ইহা অস্বাভাবিক নহে। ব্যাধির প্রবল বিক্রমের সময় ঠাকুর রক্তপুঁজমিশ্রিত মুখামৃত যে পাত্রে রক্ষা করিতেন, স্বহস্তে সেই পাত্র পরিষ্কার করিতে কেহ কেহ সঙ্কুচিত হয় বুঝিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্রবিশ্বাসীদের সমুচিত শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন, এবং একদিন মুখামৃতে ভরা পাত্রটি হস্তে ধারণ করিয়া সর্বসমক্ষে উহার কিয়দংশ গলাধঃকরণ করিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়াই নিরঞ্জন, শশী ও শরৎ বিনা দ্বিধায় উহার অবশিষ্টাংশ পান করিয়াছিলেন।

একদিন শরচ্চন্দ্র যখন ঠাকুরের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে, তুই যে কিছু চাইলি নি?' ইতোমধ্যে অনেকেই অনেক কিছু তাঁহার কাছে চাহিয়াছেন ও পাইয়াছেন। এমন কি নরেন্দ্রনাথের নির্বিকল্প সমাধিও ঐকান্তিক প্রার্থনার ফলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। দিনের পর দিন ঐসব দেখিয়া এবং

শুনিয়াও নিজের জন্য শরৎ ব্যস্ত হইয়া উঠেন নাই। অন্তর বুঝিয়া অন্তর্যামী স্বয়ং উপযাচক হইয়া আজ যখন তাঁহাকে কিছু চাহিতে বলিলেন, তখন শরচ্চন্দ্র কহিলেন, 'কি আর চাইব, আমি যেন সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করি—এই করে দিন।' ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, 'ও যে শেষকালের কথা রে!' শরৎ উত্তর করিলেন, 'তা আমি জানি না মশায়।' তখন ঠাকুর বলিলেন, 'তা তোর হবে।' [প্র]

অচ্ছেদ্য প্রেমের ডোরে ভক্তগণকে একত্র গ্রথিত করিয়া—জগৎ-কল্যাণে তাঁহার ত্যাগব্রতী সেবকগণকে কিভাবে পরিচালিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ে নরেন্দ্রনাথকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়া—ঐ নেতৃত্বের উপযুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে বিবিধ সাধনাসম্পন্ন ও সিদ্ধি-ভূষিত করিয়া ঠাকুর স্থূলে লীলাসম্বরণের উদ্যোগ করিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে লিখিত আছে যে, লীলাসম্বরণের পূর্বে তিনি তাঁহার এগার জন ভক্তকে সন্ন্যাস দিয়াছিলেন।[৩] শরচ্চন্দ্র ঐ এগার জনের একজন।

---

৩ আর দিন বিধিমত ক্রিয়া সমাপনে।
সন্ন্যাস দিলেন প্রভু ভক্ত দশ জনে॥
নরেন্দ্র, যোগীন, লাটু, নিত্যনিরঞ্জন।
বাবুরাম, কালী চন্দ্র বণিকনন্দন॥
সুন্দর শরৎ-শশী, তারক ঘোষাল।
শেষজন নাম যাঁর মুরুব্বি গোপাল॥
রাখাল না ছিলা আজি গিয়াছিলা ঘরে।
পশ্চাতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত আইলে গোচরে॥
এই একাদশে আজ্ঞা দিলা গুণমণি।
যার তার খাস তোরা হইবে না হানি॥

৭

পর্যটন ও তপস্যা

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট ঠাকুরের তিরোভাব ঘটিলে ভক্তেরা অকূল পাথারে ভাসিলেন। 'তোমরা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে তাই শরীর ছাড়তে একটু কষ্ট হচ্চে'—ভক্তবৎসল ঠাকুর একথা আগেই তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই কাঁদিবার দিন আসিয়াছে। বিরহ-জনিত খেদে তিনদিন একভাবে অতিবাহিত হইল।

যোগীন্দ্র শ্রীশ্রীমাকে লইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। কেহ কেহ তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। থাকিবার স্থানাভাববশতঃ শরচ্চন্দ্র এবং অপর কেহ কেহ অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৃহে যাইয়া রহিলেন। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া গুরুভ্রাতৃগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহাদের অশান্তি বাড়িয়া গেল। পড়াশোনায় মন দিতে চেষ্টা করেন, মন বসে না। "যখন নির্জনে থাকেন তখন সেই আনন্দময় মূর্তি মনে পড়ে। রাস্তায় চলেন, উদ্দেশ্য-বিহীন, একাকী কেঁদে কেঁদে বেড়ান।" [১]

এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের কর্তব্যও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ঘরছাড়া ভাইদিগকে একত্র রাখিবার দায়িত্ব তাঁহার উপরেই ঠাকুর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। অবস্থার চাপে পড়িয়া, গৃহে থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ সংসারে জড়াইয়া পড়িবে না তো? রাখালচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্রনাথ ঘন ঘন শরতের নিকট যাওয়াআসা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে প্রায় দুইমাস অতিবাহিত হইলে, ঠাকুরের ইচ্ছায় অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের পত্তন হইল, ভূতের আবাস বলিয়া কথিত জীর্ণ পুরাতন এক দ্বিতল বাড়ী ভাড়া

---

১ কথামৃত ২। পরিশিষ্ট।

করিয়া। ঠাকুরের সংসারত্যাগী সন্তানগণ আপনাদিগকে দৈত্যদানা নামে অভিহিত করিতেন, ভূতের ভয় তাঁহাদের ছিল না। কাশীপুরের উদ্যানবাটী হইতে ঠাকুরের গদি ও জিনিষপত্র সেই ভাড়াটে বাড়ীতে আনীত হইল এবং নির্ভীক শরচ্চন্দ্রই সেখানে প্রথমদিন রাত্রিবাস করিলেন।

নরেন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন প্রভৃতির মত শরৎ গৃহ হইতেই মঠে যাতায়াত করেন এবং মাঝে মাঝে রাত্রিতেও থাকিয়া যান। ঠাকুরের তিরোভাবের পর শরৎকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া তাঁহার মাতাপিতা প্রভৃতি যেমন আশান্বিত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া তেমনি আবার আশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। পুত্রকে গিরীশ অনেকপ্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল ফলিল না দেখিয়া শেষে একদিন তাঁহাকে কক্ষে আবদ্ধ করিয়া চাবি দিলেন। অনুমাত্র বিচলিত না হইয়া শরৎ সেই রুদ্ধ কক্ষে বসিয়া ধ্যানধারণায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহার তৎকালীন সর্বকনিষ্ঠ সহোদর প্রকাশচন্দ্র কোনরূপে চাবি হস্তগত করিয়া সেই কক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিল। মুক্তি পাইয়া শরচ্চন্দ্র একবস্ত্রে বরাহনগর মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলে গুরুমহারাজের জয়ধ্বনি দিয়া ভাইরা তাঁহাকে সংবর্ধনা করিলেন।

এইরূপে চিরদিনের মত সংসার ত্যাগ করিবার পুর্বে শরচ্চন্দ্র যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়িয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাগ্‌জন্ম সংস্কার ও ঠাকুরের ত্যাগোজ্জ্বল জীবনের সংস্পর্শ মিলিত হইয়া বহুপুর্বেই তাঁহার জীবনের গতিপথ সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সংসারের ভোগসুখে তাঁহার মন যে কখনও লিপ্ত হইতে চাহে নাই, বিবাহের কথায় পিতাকে সুস্পষ্ট ভাষায় বাধাদান হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যাহাদের স্বার্থত্যাগে ও স্নেহযত্নে তিনি এতবড় হইতে পারিয়াছেন,

যাহারা তাঁহার চিরবিশ্বস্ত ও একান্ত অনুগত তাহাদের সকলকে কাঁদাইয়া, শোকবিহ্বল করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে তিনি প্রাণে বিষম বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। নিবিড় স্নেহমমতার আবেষ্টনীতে থাকিয়া যাহাদের মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠে নাই, এবং শরচ্চন্দ্রের সুকোমল প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সহিত যাহাদের পরিচয় ঘটে নাই, তাহাদের পক্ষে তাঁহার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। এইরূপ দ্বন্দ্বস্থলে তাঁহার বিচারশীল বুদ্ধি "তাঁহাকে এমন ভাবে নিজজীবন নিয়োজিত করিতে বলিত যদ্দর্শনে তাহারা সকলে নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করিবার উচ্চাদর্শলাভে কৃতার্থ হইতে পারে এবং তাঁহার সহিত তাহাদিগের বর্তমান সম্বন্ধ যাহাতে সুগভীর পারমার্থিক সম্বন্ধে পরিণত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত অবিনশ্বর হইতে পারে।" আর তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় বলিয়া উঠিত, "আপনার জন্য সংসার ত্যাগ করা সে ত স্বার্থপরতা; যাহাতে ইহারা সকলে উপকৃত হয় এমন কিছু কর।" [লী ৪।৮]

বরাহনগর মঠে যোগদান করিবার অল্পকাল পরেই, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, শরচ্চন্দ্র নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ গুরুভ্রাতাদের[২] সঙ্গে আঁটপুর গমন করেন। আঁটপুর গ্রাম হুগলী জেলার অন্তর্গত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ বাবুরামের জন্মভূমি। বাবুরাম ও তাঁহার জননী তাঁহাদিগকে আঁটপুরে যাইয়া কয়েকদিন কাটাইয়া আসিবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বাঁয়া তবলা তানপুরা সঙ্গে লইয়া আনন্দ করিতে করিতে 'বাউলের দল' হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নরেন্দ্রনাথ গাড়ীতে চড়িয়াই গান ধরিলেন, 'শিব শঙ্কর বোম্ বোম্ ভোলা।'

ধ্যান ভজন পাঠ আলোচনার ভিতর দিয়া আঁটপুরে দিনগুলি

---

২ নরেন্দ্র, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, সারদাপ্রসন্ন, গঙ্গাধর।

আনন্দোল্লাসে কাটিয়া যাইতে লাগিল। একরাত্রে ধুনির পার্শ্বে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তুলনা করিয়া ভগবান যীশুখ্রীষ্টের কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। নিষ্কলঙ্কচরিত্র সন্ন্যাসী যীশুর ভগবৎপ্রেম ও মানবের হিতে আত্মবলিদান এবং তদীয় শিষ্যগণের প্রভুকে অনুসরণ ও সর্বপ্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়া প্রভুর বার্তা প্রচার ইত্যাদিবিষয়ক আলোচনা শুনিতে শুনিতে সকলেই অনুপ্রাণিত ও তন্ময় হইয়া পড়িলেন। পরে জানিতে পারা গেল যে ঐ দিবস ২৪শে ডিসেম্বর বা 'খ্রীষ্টাবির্ভাব রাত্রি'। তখন দৈব প্রেরণাতেই ঐরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন এবং খ্রীষ্টশিষ্যগণের ন্যায় নিজেদের জীবন গঠন করিয়া তাঁহারাও ঠাকুরের বার্তা প্রচার করিবেন বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইলেন। অতঃপর তারকেশ্বরে যাইয়া এবং সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য দেবাদি-দেবকে অর্চনা ও বন্দনা করিয়া সকলে বরাহ্নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই সময়ে শরতের মাতাপিতা একদিন বরাহনগর মঠে আসিলেন এবং পিতা গিরীশচন্দ্র পুত্রকে বলিতে লাগিলেন, 'তুমি জ্যেষ্ঠপুত্র, আমাদের আশা ভরসা। তুমি সংসার ত্যাগ করলে আমাদের যে কি সর্বনাশ তা যখন বুঝেও বুঝলে না, আর চাবি দিয়েও যখন তোমাকে আটকাতে পারলুম না, তখন মনে হয়, তোমার এ আচরণ ঈশ্বরের অভিপ্রেত। যখন তাঁরি ইচ্ছা, তখন আর তোমার পথের কণ্টক হব না। আমরা সর্বান্তঃকরণে আজ তোমাকে ছেড়ে দিলুম। আশীর্বাদ করি ভগবানের কৃপায় তোমার পদস্খলন না হয়, আর অচিরে ইষ্ট সাক্ষাৎ করে পরমানন্দের অধিকারী হও।'

কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু শরচ্চন্দ্রকে অভিষিক্ত করিল। মাতাপিতার আশীর্বাদরূপ বর্মে আচ্ছাদিত হইয়া, এবং ঠাকুরের অশেষ কৃপায় ইহা সম্ভব হইয়াছে বুঝিয়া, তিনি অন্তরে স্বস্তি অনুভব করিলেন। একটা স্বচ্ছন্দ আনন্দে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারীর শেষার্ধে একরাত্রে ঠাকুরের পাদুকার সম্মুখে 'বিরজাহোম' করিয়া নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ গুরুভ্রাতৃগণ আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন ও আশ্রমোচিত নাম গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিয়া নরেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃবর্গের প্রকৃতি বিচার করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিলেন।[৩] শরচ্চন্দ্র 'সারদানন্দ' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। সন্ন্যাসীদের নামের পুর্বে সাধারণতঃ 'স্বামী' পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং স্বামী বিবেকানন্দ কালে সংঘভুক্ত ও তদ্‌বহির্ভূত ব্যক্তিগণের দ্বারা সসম্মানে 'স্বামিজী' নামে অভিহিত হইতে থাকেন। পুর্বেই ঠাকুর তাঁহাদের অনেককে গৈরিক বসন দিয়া থাকিলেও তাঁহারা ক্বচিৎ উহা ব্যবহার করিতেন; এখন হইতে সর্বত্যাগের প্রতীক ঐ বস্ত্র সর্বদা ব্যবহার করিতে থাকায় তাঁহাদের তপস্যাপূত দেহে পবিত্রতার দিব্য শ্রী ফুটিয়া উঠিল।

*　　　　*　　　　*

ঠাকুরের সংসারত্যাগী তরুণ শিষ্যেরা একে একে প্রায় সকলেই বরাহনগর মঠে আসিয়া জুটিলেন। চব্বিশঘণ্টা জপ, ধ্যান, ভজন, শাস্ত্রপাঠ ও ঈশ্বরদর্শনের জন্য বহুহৃদয়ের ব্যাকুলতা মিলিয়া এমন এক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল রচনা করিল যে উহার মধ্যে আসিয়া পড়িলে সংসারের সমূহ জ্বালা জুড়াইয়া যাইত এবং বিষয়াভিমুখী চিত্তও তৎকালের জন্য ভগবল্লুব্ধ হইয়া উঠিত। গৃহস্থভক্তেরা তাই জুড়াইবার ও প্রেরণা পাইবার জন্য মঠে আসাযাওয়া করিতে ও ক্বচিৎ দুইএক দিন থাকিয়া যাইতে লাগিলেন।

স্বামিজী এই সময়ে জপের খুব প্রশংসা করিতেন, থাকিয়া থাকিয়া

৩ যথা : রাখাল—ব্রহ্মানন্দ, বাবুরাম—প্রেমানন্দ, নিরঞ্জন—নিরঞ্জনানন্দ, তারক—শিবানন্দ, লাটু—অদ্ভুতানন্দ, শশী—রামকৃষ্ণানন্দ, ইত্যাদি।

'জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি' বলিয়া উঠিতেন। রাত্রের অন্ধকারে গোপনে সারদানন্দকে সঙ্গে লইয়া তিনি কাশীপুর শ্মশানে চলিয়া যাইতেন এবং সমস্ত রাত্রি সেখানে ধ্যানজপে অতিবাহিত করিয়া অন্ধকার থাকিতেই মঠে ফিরিয়া আসিতেন। কিছুদিন এইরূপে গত হইলে, স্বামিজীর অভিপ্রায় বুঝিয়া সারদানন্দ দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া ও ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া পঞ্চবটীমূলে অহোরাত্র জপে নিমগ্ন রহিতেন। কথাপ্রসঙ্গে 'শ্রীম'কে একদিন (৯ই এপ্রিল) স্বামিজী বলিয়াছিলেন, '[ঠাকুর] শরতের ভার আমার উপর দিয়েচেন। ও এখন ব্যাকুল হয়েচে। ওর কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েচে।'

বরাহনগর মঠে থাকিতে সারদানন্দ প্রয়োজনীয় সকল কাজ—বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি অপর কাহাকেও করিতে না দিয়া একাকী নিজেই করিতে চাহিতেন। ঐরূপ করিবার সামর্থ্যও ভগবান তাঁহাকে দিয়াছিলেন—দৈহিক শক্তিতে সঙ্ঘমধ্যে তিনি স্বামিজীর পরবর্তিস্থানীয় ছিলেন।

বহু বহু কাল পরে, জীবনসায়াহ্নে তিনি যখন কলিকাতায় মায়ের বাড়ীতে থাকিতেন তখন একদিন জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী (স্বামী পূর্ণানন্দ) অপর একজনের নামে অভিযোগ করিলেন যে, গালিগালাজ করিয়া সে পাচকঠাকুরকে বিদায় করিয়া দিয়াছে, দৈনিক একটাকা মজুরিতে পাচক আনিয়াও কাজের সুরাহা হইতেছে না; তাহার বদ্‌মেজাজের জন্য লোক আসিয়া টিকিতে পারে না, ইত্যাদি। নিবিষ্টচিত্তে সমস্ত শুনিয়া শান্তকণ্ঠে শরৎ মহারাজ কহিলেন, 'ও ঠাকুর তাড়ায় কেন? ওদের কি কোন ক্ষমতা আছে? আমরা মঠে মাসের পর মাস রান্নাবান্না বাসন মাজার কাজ চালিয়ে দিয়েচি। ওরা কি তা পারে যে যখন তখন ঠাকুর বিদায় করে দেয়?' [প্র]

অহোরাত্র ধ্যানজপাদি মস্তিষ্কচালনার কাজ লইয়া থাকিলে যে

পুষ্টিকর আহার্যের প্রয়োজন হয়, বরাহনগর মঠে তাহা জুটিত না বলিলেই হয়। ডালভাত, শাকভাত বা নুনভাত, যেদিন যেমন জুটিত, ঠাকুরকে ভোগ দিয়া ও সেই প্রসাদান্ন একখানি বড় কলাপাতে, কচুপাতে বা তদভাবে গামছায় ঢালিয়া সকলে সন্তুষ্ট-চিত্তে একত্র আহার করিতেন। উত্তরকালে কোন আশ্রমকর্মীকে শরৎ মহারাজ লিখিয়াছিলেন, "আমাদিগের যখন কিছুই ছিল না তখন আমরা বরাহনগর মঠ কি করিয়া চালাইতাম তাহা তুমি জান না। কোন দিন চাল নাই, ভিক্ষা করিয়া খাইলাম—একসন্ধ্যা নুনভাত খাইয়া কতদিন গিয়াছে—কতদিন নুনও জোটে নাই, তরকারির কথা দূরে থাক। ঐরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প থাকিলে এবং ঈশ্বরলাভ করাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিলে তবে ঐরূপ করিতে পারিবে। নতুবা, এই দুইদিনের নশ্বর জীবনে 'চোর' বদনাম লইয়া যাইতে হইবে—ঈশ্বরলাভ ও শান্তি পাওয়া ত দূরের কথা।"

তীর্থদর্শন, তপস্যার আনুকূল্য বা নির্জনবাসের জন্য সন্ন্যাসীরা সময়ে সময়ে মঠ ছাড়িয়া নিজ নিজ অভিমত স্থানে চলিয়া যাইতেন এবং কিছুকাল সেই সেই স্থানে বাস করিয়া প্রাণের টানে পুনরায় মঠেই ফিরিয়া আসিতেন। অভাবের তাড়নাও যে কখন কখন তাঁহাদিগকে মঠ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে, পূর্বোক্ত আশ্রমকর্মীকে লিখিত আর এক পত্র হইতে তাহা জানা যায়। শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন: "তুমি লিখিয়াছ, 'এখান হইতে যাঁহারা যাইতেছেন তাঁহাদের না ফিরিবার কারণ কেবল অর্থাভাব।' বোধ হয় তোমার ঐকথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। কারণ, অর্থাভাবের জন্য আমরা অনেক সময়ে (বরাহনগর ও আলমবাজারে মঠ থাকিবার কালে) মঠ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছি, কিন্তু আর কখন মঠে ফিরিব না—এরূপ সঙ্কল্প কখনও কাহার মনে আসে নাই। অর্থাভাবে বাধ্য হইয়া লোকে অন্যত্র যাইতে পারে ইহা

মানি, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন শ্লথ না হইলে 'আর ফিরিব না' একথা মনে উদয় হইবে না।"

'পদব্রজে নবদ্বীপ বেড়িয়ে এস না শরৎ!' সকালবেলা স্বামিজীর মুখে একথা শুনিয়াই শরৎ মহারাজ বাহির হইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 'শরৎ আমিও যাব' বলিয়া শিবানন্দ (মহাপুরুষ) যাইবার উদ্যোগ করিলেন। ইতোমধ্যে ত্রিগুণাতীত (সারদাপ্রসন্ন) কিছু না বলিয়াই রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আগে আগে চলিয়া তিনি কোথায় যে অন্তর্হিত হইলেন বুঝিতে পারা গেল না। অনেক পথ চলিয়া, সূর্য যখন মাথার উপরে তখন বিশ্রাম করিবার জন্য দুই গুরু-ভাই একটা বাগানের ছায়ায় বসিলেন, এবং বসিয়াই দেখিতে পাইলেন ত্রিগুণাতীত সেই বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। উভয়ে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই তিনি বলিলেন, 'দুপুর হয়েচে কিনা তাই পিত্তিরক্ষা করে নিলুম। বাগানের পুকুরে স্নান করে ভাবলুম কি করে পিত্তিরক্ষা করি। দেখি যে কচি দূর্বা রয়েচে—তাই খেয়ে জল খেয়েচি!' যথাসময়ে তাঁহারা নবদ্বীপ পৌছিলেন এবং দর্শনাদি করিয়া দিনকয়েক পরে বরাহনগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৺শিবরাত্রির দিন সকালের দিকে শ্রীম মঠে আসিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসীরা সকলেই উপবাস করিয়াছেন ও ভজনানন্দে মগ্ন আছেন। সারদানন্দ তানপুরা লইয়া গান ধরিলেন:

শিব শঙ্কর বম্ বম্ ভোলা,
কৈলাসপতি মহারাজরাজ।
উড়ে শৃঙ্গ কি খেয়াল, গলে ব্যালমাল,
লোচন বিশাল লালে লাল;
ভালে চন্দ্র শোভে—সুন্দর বিরাজে॥

মঠের বেলতলায় পূজার আয়োজন হইয়াছে। পূজা, সমবেত নৃত্যগীত ও সমস্বরে 'শিবগুরু! শিবগুরু!' উচ্চারণের মধ্যে নিশার অবসান সূচিত হইল এবং সকলে ব্রাহ্ম মুহূর্তে গঙ্গাস্নান করিয়া ব্রত সাঙ্গ করিলেন।

স্বামিজীর কাছে সারদানন্দ সঙ্গীত শিক্ষা করেন, একথা আগেই উক্ত হইয়াছে। গানের ভিতর দিয়া স্বামিজীর সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করিয়াছিলেন। নিজমুখে বলিয়াছেন, 'সামনে নরেন গান গাইচে, আমার অনুভব হতে লাগল যে আমিই গাইচি—তাতে ও আমাতে কোন ভেদ নাই। এইকালে 'আমি শরৎ' এইরূপ বোধ (অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি) ছিল না।' সঙ্গীতে তিনি স্বামিজীর অনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, 'দূর হতে বোঝা যেত না শরৎ গাইচে কি স্বামিজী গাইচেন।'

গভীর রাত্রে একদিন যখন শরৎ মহারাজ ভজন গাহিতেছিলেন, পাড়ার যুবকেরা বামাকণ্ঠের অনুরূপ স্বরলহরীতে আকৃষ্ট হয়, এবং পরমহংসদেবের চেলারা রাত্রির সুযোগে অসৎসঙ্গে মাতিয়াছে মনে করিয়া তাঁহাদিগকে লজ্জা দিবার জন্য প্রাচীর টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করে। বলা বাহুল্য, উহারা নিজেরাই যারপরনাই লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়, এবং পরদিন তাহাদের একজন আসিয়া কৃতকর্মের জন্য অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

এই ঘটনায় সাধুরা যে বিশেষ আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন এবং শরৎ মহারাজকে লইয়া রঙ্গরস পরিহাসের ঘটা হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। বাধাবন্ধবিনির্মুক্ত ও বালচরিত্র ঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানেরা অনেকেই কৌতুকপ্রিয় ছিলেন; শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষটিকে উত্যক্ত করিয়া আনন্দ করিবার জন্য তাঁহাদের কৌশলের অন্ত ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁহাদের

সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি অটল ধৈর্যের 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। স্বামিজী তাই বলিতেন, 'শরতের শরীরে মাছের রক্ত, কিছুতেই তাতে না।'

*　　*　　*

শিবরাত্রির পর ঠাকুরের জন্মোৎসব-পর্ব সমাধা করিয়া সারদানন্দ অপর দুই গুরুভ্রাতা প্রেমানন্দ ও অভেদানন্দের সহিত ৺পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।[৪]

পুরী গমনের পথে সারদানন্দ যেসকল অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন, নিম্নোক্ত বর্ণনায় তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। "সে সময়ে [যীশুখ্রীষ্টের সময়ে] নানা দিগ্‌দেশ হইতে জেরুজালেম দর্শনে আগত যাত্রীদিগের অবস্থা অনেকটা রেল হইবার পূর্বে পদব্রজে ৺পুরী প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে অগ্রসর যাত্রীদিগের মতই ছিল। সেই মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-কূপ-তড়াগাদিশোভিত একই প্রকার দীর্ঘ পথ, সেই মধ্যে মধ্যে বিশ্রামস্থান চটি বা সরাই,—ধর্মশালারও অভাব ছিল না শুনা যায়, সেই তীর্থযাত্রীর সহচর পাণ্ডা, সেই চাল ডাল আটা প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যকীয় খাদ্যাদি দ্রব্যপ্রাপ্তিস্থান মুদির দোকান, সেই ধূলা, সেই ধর্মভাববিস্মরণকারী নিদ্রালস্যের বৈরী যাত্রীদিগের পরমবন্ধু মশককুল, সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের যাত্রিবর্গের দস্যুতস্করাদি হইতে পরস্পরের সাহায্যলাভ করিতে পারিবে বলিয়া দলবদ্ধ হইয়া গমন, এবং পরিশেষে সেই যাত্রীদিগের একান্ত ঈশ্বর-নির্ভরতা ও ভগবদ্ভক্তি।" [লী ১।৪]

ক্ষেত্রবিশেষে নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল অবস্থায় তীর্থাদি পর্যটন জীবনে শ্রেয়োলাভের পথ উন্মুক্ত করে। ক্ষুধার তাড়নায়, রোগের যন্ত্রণায় বা

---

৪ কথামৃত প্রথমভাগ পরিশিষ্টে আছেঃ আজ সোমবার ৯ই মে ১৮৮৭।...শরৎ, বাবুরাম ও কালী শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছেন।

অনুরূপ বিপদে এক ভগবান ব্যতীত মুখ চাহিবার অপর কেহ থাকে না বলিয়া প্রকৃত ভক্ত তখন নানাভাবে তাঁহার দয়া উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। বিশেষতঃ ঐরূপ অবস্থায়, সময়ে সময়ে, প্রিয়তম প্রাণাধারের বিরহজনিত কষ্ট দুঃসহ হইয়া উঠে এবং তাঁহার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা ও আকুলতা সমগ্র সত্তাটি তদ্ভাবে ভাবিত করিয়া তুলে।

দিনের পর দিন পুরীর অফুরন্ত পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে প্রভুর বিরহে সারদানন্দ মাঝে মাঝে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেছিলেন। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বুকভরা বেদনা যেন তরল হইয়া আঁখির দ্বারে অশান্ত রোদনে ফাটিয়া পড়িতেছিল। সেই কান্নায় বিচলিত হইয়া, যখন তিনি মহাপ্রভুর ধামের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন তখন, ঠাকুর তাঁহাকে দেখা দিলেন, সান্ত্বনা দিয়া প্রাণমন অননুভূতপুর্ব শান্তি ও উল্লাসে ভরিয়া দিলেন, আর তিনি যে তাঁহাকে ছাড়িয়া নাই ইহাও জানাইয়া দিলেন। শেষবার রেলগাড়ীতে করিয়া পুরী হইতে ফিরিবার পথে সাক্ষীগোপালের নিকটবর্তী স্থানবিশেষ দেখাইয়া শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'এই রকম জায়গায় ঠাকুরের প্রথম দেখা পেয়ে তখন শান্তি পেয়েছিলুম।'[৫]

পুরীতে পৌছিয়া সারদানন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে মন্দিরে গেলেন। ঠাকুর পুর্বেই তাঁহাকে দিব্যভাবে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ভাবানুরঞ্জিত নয়নে শ্রীবিগ্রহের পানে চাহিবামাত্র উঁহার চিদ্‌ঘনরূপ তিনি দেখিতে পাইলেন এবং 'ডুবল নয়ন ফিরে না এল' এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইবারে তিনি প্রায় ছয়মাস এখানে বাস করিয়াছিলেন। এই পুরীবাসের স্মৃতি তাঁহার জীবনকে মধুময় করিয়াছিল এবং পরেও

---

৫ স্বামী ঋতানন্দ হইতে প্রাপ্ত।

বহুবার তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছিল। গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'মহাপ্রভুর মূর্তির প্রতি অনিমেষ চোখে চেয়ে থাকতুম। দেখে যেন আর তৃষ্ণা মেটে না। সমুদ্র দেখলে মন উদাস হয়ে যেত। স্বর্গদ্বারে বসে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতুম। লোকে ভয় দেখাত—বলত, ভয়ঙ্কর জলজন্তু, ভীষণ সাপ সব রাত্রিকালে নির্জন কূলে উঠে খেলা করে। তাদের কথায় একদিনও মন টলে নি, ভয় পাই নি। আনন্দবাজারে ঘুরে ফিরে মাধুকরী করতুম। তেমন অড়র ডাল জীবনে খাইনি—যেন সুধা!'

এই সময়কার ঘটনাবলীর অতি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ এক বর্ণনা স্বামী অভেদানন্দের দিনলিপিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, যেদিন স্বামী সারদানন্দের সহিত আমেরিকায় তাঁহার প্রথম মিলন ঘটে, সেদিন উদ্দীপিত বহু পুরাতন স্মৃতি অভেদানন্দজী এই-ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: "পুরীতে বাবুরামের সহিত ভ্রমণ—রামানুজাচারী বৈষ্ণবদের এমার মঠে বাস—সেখানে দীর্ঘ তপশ্চর্যা—কোণারকে সূর্যমন্দির দর্শন—বালুকাময় সমুদ্রসৈকত দিয়া চিল্কাহ্রদে গমন—খণ্ডগিরি উদয়গিরি দর্শন—...সম্রাট অশোকের ধাউলি পর্বতের অনুশাসন দর্শন—অরণ্যে ব্যাঘ্রদুগ্ধ পান—যোগী সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান-কালে বাচ্চা সহ অবস্থিত ব্যাঘ্রীর কবল হইতে অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা।"[৬]

পুরীতে গমন কিংবা তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে সারদানন্দ রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মহাদেব—এবং পুরীর সান্নিধ্যে সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে তিনি যখন বরাহনগর মঠে ফিরিলেন তখন যেন আর এক মানুষ—শরীর শীর্ণ, কিন্তু মুখমণ্ডল অনুরাগরঞ্জিত ও দৃষ্টি অন্তর্মুখী।

৬ স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা।

মঠে ফিরিবার সম্বৎসর কাল পরে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে পুনরায় তাঁহাকে পুরীধামে যাইতে হইয়াছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, গোলাপ-মা ও যোগীন-মা নামে ঠাকুরের ভক্তমহলে সুপরিচিতা মায়ের দুই সঙ্গিনী-সেবিকা এবং ঠাকুরের ভ্রাতুস্পুত্রী লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি ঐ সঙ্গে পুরী গিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বড় জাহাজে চাঁদবালি পর্যন্ত এবং চাঁদবালি হইতে ক্যানেল ষ্টীমারে কটক পর্যন্ত গিয়া অবশিষ্ট পথ গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। তাড়াতাড়ি পৌঁছিবার জন্য সারদানন্দ স্বয়ং সমস্ত রাত্রি গাড়ী হাঁকাইয়াছিলেন এবং সকালবেলা পুরীতে পৌঁছিয়াই সকলে মিলিয়া মন্দিরে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কারণ, সেই সময় দর্শন না হইলে পরে অকাল পড়িত।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর হইতে দুইমাস পুরীতে বাস ও দর্শনাদি করিয়া তিনি মায়ের সঙ্গে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন, এবং কলিকাতায় তিনচারি সপ্তাহ থাকিয়া ও মায়ের দলভুক্ত হইয়া দ্বিতীয়বার আঁটপুরে যান।

আঁটপুর হইতে দেশে যাইয়া শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে বাস করিতে থাকেন। একদিন পত্রযোগে খবর আসিল যে পাগল হরীশ—ঠাকুরের জনৈক গৃহস্থ ভক্ত—কিছুদিন যাবৎ কামারপুকুরে আছে এবং বিকৃত-বুদ্ধির খেয়ালে নানা অশিষ্ট আচরণ করিয়া মায়ের চিন্তার কারণ হইয়াছে। সংবাদ পাইবামাত্র সারদানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দ কামারপুকুর যাত্রা করিলেন। তাঁহারা আসিতেছেন শুনিয়াই, নিরঞ্জন মহারাজের প্রহারের ভয়ে, হরীশ বৃন্দাবনে পলাইয়া যায়। শরৎ মহারাজ বোধ হয় এই সর্বপ্রথম ঠাকুর ও মায়ের জন্মভূমি সন্দর্শন করেন এবং উভয়ত্র মায়ের স্নেহযত্ন লাভ করিয়া ধন্য হন।

কিছুকাল মঠে বাস করিবার পর, সারদানন্দ উত্তর ভারতে যাইয়া তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়

জানিয়া ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল সহযাত্রী হইতে অভিলাষী হইলেন। সান্যাল মহাশয় তখন ঠাকুরের সংসারত্যাগী সন্তানগণের সঙ্গে মঠেই বাস করিতেন এবং শরৎ মহারাজের উপর গভীর প্রীতি-সম্পন্ন ছিলেন।

সম্ভবতঃ শ্যামাপূজার পরে মঠ হইতে যাত্রা করিয়া, গয়া ও বোধগয়া হইয়া, তাঁহারা ৺কাশীধামে উপনীত হন এবং চৌখাম্বা পল্লীনিবাসী প্রমদাদাস মিত্রের আতিথ্যে তথায় সপ্তাহকাল বাস করেন। মিত্র মহাশয় ভক্তিমান ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ ছিলেন এবং স্থানীয় লোকজনের দ্বারা রাজাবাবু নামে অভিহিত হইতেন। স্বামিজী-প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যেরা অনেকেই ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। মিত্র মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে শরৎ মহারাজ হৃষীকেশ ও আলমোড়া হইতে বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে কয়েকখানি লিপিকা প্রেরণ করেন। হৃষীকেশ হইতে লিখিত পত্রগুলি বেয়ারিং ডাকে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ সকল পত্র হিমালয়স্থ কতিপয় শ্রেষ্ঠ তীর্থের বর্ণনায় সমৃদ্ধ এবং শরৎ মহারাজের তৎকালীন মানসিক অবস্থারও পরিচায়ক। তাঁহাদের গতিবিধি এবং তপস্যার বিবরণও ঐ সকল পত্র হইতে কিয়ৎ-পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর হৃষীকেশ হইতে শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন ঃ

"আপনার নিকট হইতে রওনা হইয়া অযোধ্যাধাম দর্শন করি। পরে যে টাকা সঙ্গে ছিল তাহাতে উভয়ের হরিদ্বার অবধি ট্রেণভাড়া ঠিক কুলায় দেখিয়া এবং হৃষীকেশ দেখিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে হরিদ্বারে আসি। তথায় একদিন মাত্র বিশ্রাম করিয়া, কনখল (যেখানে দক্ষযজ্ঞ হয়) দর্শন করিয়া এখানে আসি। সুবিধা না হওয়াতে এতদিন পত্রাদি লিখি নাই।

"হৃষীকেশ অতি মনোরম স্থান। উত্তর এবং পূবে পাহাড়ে বেষ্টিত। সেই পাহাড়ের ঠিক তলা দিয়াই ভাগীরথী দিবারাত্র হরহর-ধ্বনি করিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। স্থানটি যেন স্বর্গ ও মর্ত্যের সন্ধিস্থলে বর্তমান। পাহাড়ে উঠিলেই যেন এই জগতের সহিত সম্বন্ধ

উঠিয়া যায়। কারণ, সেখানে বিষয়কর্মের হুড়াহুড়ি নাই, চারিদিকে কেবল তীর্থ এবং দেবস্থানসকল বর্তমান। এক সময় বেদব্যাস এখানে ৬০,০০০ শিষ্য লইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই ইহার নাম এখনও তপোবন রহিয়াছে।...চাতুর্মাস্যের সময় এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত দূষিত হয় এবং তপস্যাদির অত্যন্ত প্রতিকূল হয়।

"এখন এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। অনেকগুলি সাধু রহিয়াছেন শুনিলাম। মাঘমাসে আরও অনেকগুলি আসিবেন। তবে তেমন উন্নত অবস্থার লোক একজনও নাই। বলিতে কি, গুরুদেবকে দর্শন করিয়া আমাদের চক্ষু খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে ভাব কোথাও মিলে না এবং মিলিবার আশাও নাই। ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"কলিকাতার এক পত্রে অবগত হইলাম যে আমাদের রাখাল ও সুবোধ কাশীতে আপনার বাগানে রহিয়াছেন, এবং হৃষীকেশ আসিতে বড়ই উৎসুক। তাঁহাকে (রাখাল মহারাজকে) এই পত্র দেখাইবেন এবং কহিবেন যে এখন এই স্থান সম্পূর্ণ অনুকূল। শীত কলিকাতা অপেক্ষা অধিক নহে। ধুনির কাঠ ইত্যাদিও প্রচুর পাওয়া যায়। ভিক্ষারও খুব সুবিধা। থাকিবার ঘরও রহিয়াছে। জল অমৃততুল্য, পান করিলে খুব ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।...এখন আসিলে মাঘ মাসে কল্পবাসও হইবে; কারণ, সপ্ত প্রয়াগের মধ্যে এই স্থান দ্বিতীয় প্রয়াগ। আমাদের সকলের প্রণাম জানিবেন এবং তাঁহাদিগকেও জানাইবেন। গুরুদেবের কৃপায় আমরা সকলে ভাল আছি।"

"আমরা সকলে ভাল আছি" এই কথায় প্রতীত হয় যে ঠাকুরের অনেক ত্যাগী সন্তান এই সময়ে হৃষীকেশে ছিলেন। আঁটপুর হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কালী মহারাজ ও তুলসী মহারাজ (অভেদানন্দ ও নির্মলানন্দ) উত্তর ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে হৃষীকেশে হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও সান্যাল মহাশয় সম্মিলিত হন। তাঁহাদিগকে একত্র স্নান, আহার, ভজন ও ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে দেখিয়া তথাকার অপরাপর সাধুরা পরস্পর বলাবলি করিতেন যে, গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে এইরূপ প্রীতি ও সৌহার্দ তাঁহারা আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই।

হৃষীকেশে তপস্যা শরৎ মহারাজের জীবনে সুমহৎ ফল প্রসব

করিয়াছিল। প্রসন্নোজ্জ্বল মুখে একদিন তিনি সান্যাল মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'প্রভুর কৃপায় আজ হতে আমি মনের সঙ্গে পৃথক হয়েচি ; মনের কার্যকলাপ আর আমাকে ভুলাতে পারবে না, এখন আমি যেন দ্রষ্টা।'

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন ঃ

"আপনার ২১শে পৌষের পত্রে রাখালের বিষয় অবগত হই। বোধ হয় এতদিনে নরেন্দ্রনাথ আপনার নিকট গিয়াছেন। তাঁহাকে আমার শত শত প্রণাম দিবেন এবং আপনিও জানিবেন। এখানে অভেদানন্দের প্রায় ২০ দিন হইল খুব জ্বর হইয়াছিল। এখানে সারিয়া উঠা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া এলাহাবাদে নরেন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখি। এখনও তাহার কোন উত্তর পাই নাই। বোধ হয় তিনি সে পত্র পান নাই। অভেদানন্দ এখন বেশ সারিয়া উঠিয়াছে ; আর কোন ভয় নাই। নরেন্দ্র যদি ওখানে থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে এবিষয় জানাইবেন এবং অভেদ এখন এখান হইতে যাইতে অনিচ্ছুক এবং যাইবার আবশ্যকতাও নাই একথাও অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন।...

"অদ্য আপনাকে লক্ষ্মণ-ঝোলার বিষয় কিছু লিখিব। এ স্থানটি অতি সুন্দর। লক্ষ্মণ-ঝোলার অপর পার হইতেই উত্তরাখণ্ড অর্থাৎ কেদার, বদরী প্রভৃতির পথ আরম্ভ হইয়াছে। কেবল পাহাড়ে পাহাড়। পাহাড়ের নীচেই গঙ্গা প্রবাহিত।...এখানে লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের দুইটি মন্দির আছে। তাঁহারা এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। গঙ্গার ঠিক উপরেই একটি স্থান ধ্রুবকুণ্ড বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে, মহাত্মা ধ্রুব এখানে তপস্যা করেন। তাঁহার ধ্যানস্থ প্রতিমূর্তিরও এখানে পূজা হয়। স্থানটি যেমন সুন্দর তেমনই সুন্দর association (পুণ্যস্মৃতি) বিশিষ্ট। দেখিলে মন বড়ই প্রসন্ন হয়।...আমরা এখানে একদিবস ভিক্ষা করি ও ধুনি জ্বালাইয়া সারারাত্র বসিয়া কাটাই। বড় আনন্দ হইয়াছিল।

"এখানে এক ব্রহ্মচারী সন্ধ্যা না জানাতে আমাদের কহেন। আমরাও তাঁহাকে একখানি সন্ধ্যার পুস্তক দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত আছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া... এই বই দুইখানি পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হইব।...

১। সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি (নাগরী অক্ষরে)।

২। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের 'ভক্তি ও ভক্ত' যাহাতে নারদ-সূত্র ও শাণ্ডিল্য-সূত্র আছে। এখানি আমরা রাখিব জানিবেন।"

৺শিবরাত্রির দিন সারদানন্দ দুইতিন জন গুরুভ্রাতার সঙ্গে ৺নীলকণ্ঠ শিব দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। অনাদিলিঙ্গ নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির হৃষীকেশের পূর্বদিকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে, পার্বত্য নির্ঝরের ধারে এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। স্থানটি মনোরম হইলেও দুর্গম, যেহেতু অনেক চড়াই উৎরাই করিয়া ও অস্পষ্ট রাস্তা ধরিয়া সেখানে যাইতে হয়। তথায় সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া পরম শিবের মহিমা চিন্তা করিতে করিতে শরৎ মহারাজ অপরাহ্ণ সময়ে একাকী ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন; সহসা তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, এবং তিনি পথহারা হইয়াছেন। নিরুদ্বেগচিত্ত যোগী এক প্রস্তরখণ্ডের উপর আসন পরিগ্রহ করিলেন, এবং একখানি মোটা চাদরমাত্র অঙ্গাবরণ থাকায় পার্বত্য শৈত্য হইতে আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত রাত্রি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটাইলেন।

এই ঘটনার একত্রিশ বৎসর পরে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ যখন কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন একদিন শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলিলেন, 'দেখ শরৎ, ইচ্ছা হচ্চে হরি মহারাজকে প্রণাম করি। এমন মহাপুরুষ দুর্লভ। ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়ে তিনি কিরূপ স্বস্থ আছেন!' খানিক পরে শরৎ মহারাজ উঠিলেন ও সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কহিলেন, 'এ সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছা হচ্চে না; হরি মহারাজকে প্রণাম করে আসি।' গরমের দিন বলিয়া হরি মহারাজের ঘরে পর্দা দেওয়া ছিল। তিনি আহার শেষ করিয়া উঠিয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে সন্তর্পণে গৃহপ্রবেশ করিয়া শরৎ মহারাজ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, এবং 'কে প্রণাম কচ্চে?'—হরি মহারাজের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে কহিলেন, 'আমি শরৎ। তুমি

এখানে আছ, মহারাজের ইচ্ছা তোমাকে প্রণাম করেন। আমি তো ভাই সে প্রলোভন ছাড়তে পারলুম না।' অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বেদনার স্বরে হরি মহারাজ বলিলেন, 'শরৎদা, আমি অন্ধকারে দেখতে পাচ্চি না, তাই তুমি আমাকে এভাবে অপ্রস্তুত করলে! আমি কি জানি না, তুমি কে? নীলকণ্ঠ পাহাড়ের ঘটনা কি আমি ভুলে গেছি?' [৭]

২৪শে মার্চ তারিখে সান্যাল মহাশয় প্রমদাদাস মিত্রকে একখানি পত্র লিখেন। উহাতে জানা যায় যে, অভেদানন্দ তখন কাশীধামে চলিয়া গিয়াছেন, এবং স্বামিজী শীঘ্রই একবার হৃষীকেশে আসিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া হৃষীকেশস্থ গুরুভাইদিগকে পত্র দিয়াছেন। প্রমদাদাস বাবুকে লিখিত পত্রের শেষাংশে স্বামিজীকে সম্বোধন করিয়া সান্যাল মহাশয় ব্যক্তিগত কথা কিছু লিখিয়াছিলেন, এবং উহার নীচে নিম্নোক্ত কথাগুলিও লেখা ছিল:

"ভাই নরেন, তুমি আমার ও হরির প্রণাম শতকোটি জানিবে। ইতি—

দাস—শরৎ

অত্র পত্রে আমার কোটি কোটি প্রণাম আপনি জানিবেন ও অভেদানন্দস্বামী, বাবুরামবাবু ও প্রমদাদাসবাবুকে দিবেন। আশীর্বাদ করুন, শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে। ইতি—

দাসানুদাস—তুলসী"

১২ই এপ্রিল চৈত্রসংক্রান্তির দিন সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও সান্যাল মহাশয় হৃষীকেশ ছাড়িয়া যান এবং তিন সপ্তাহের অধিককাল নানা কষ্টকর অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়া ৪ঠা মে বৈশাখী পুর্ণিমার দিন কেদারনাথে উপনীত হন। আলমোড়া হইতে ১২ই আগষ্ট তারিখে প্রমদাদাসবাবুকে শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন:

"অনেক দিন হইল আপনাকে কোন পত্রাদি লিখি নাই বা লিখিবার সুবিধা হয় নাই। হৃষীকেশ পরিত্যাগ করিয়া ডেরাদুন এবং মুসৌরি হইয়া প্রথমে গঙ্গোত্রীর দিকে

---

৭ স্বামী গৌরীশানন্দ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন।

যাত্রা করি। পাহাড়ে স্থানে স্থানে শস্য অল্প হওয়ায় ইং-বাহাদুর এবৎসর ৺কেদার ও ৺বদরীনারায়ণ যাত্রা বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু উক্ত দেবস্থান দর্শনের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হওয়ায় গঙ্গোত্রী হইতে ফিরিয়া ভাটোয়ারি নামক স্থান হইতে পাহাড়ী পথ (পাকদণ্ডী) দিয়া ৺কেদারের দিকে অগ্রসর হই। এসকল পথে যাত্রীরা কখনও আসে না। পাহাড়ীরা একগ্রাম হইতে অন্যগ্রামে যাইবার জন্য এইসকল পথে চলে। এজন্য ইং-বাহাদুর এখানে পাহারা রাখেন নাই। মোট কথায় এইসকল পথ অতি দুর্গম এবং ভিক্ষার বড়ই অসুবিধা। যাহা হউক, আমরা নির্বিঘ্নে ৺কেদারনাথ এবং বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া আপাততঃ নাসাবধি হইল এখানে আসিয়াছি। ১০।১২ দিনের মধ্যে বোধ হয় বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করিব।

"পাহাড়ে যত স্থান দর্শন করিয়াছি তাহার মধ্যে এই তিনটিই অতি রমণীয়। ১ম তুঙ্গনাথ—ইহা একটি লিঙ্গমূর্তি। একটি পাহাড়ের শিখরদেশে স্থাপিত। স্থাপিত কেন, এটি একটি অনাদি লিঙ্গ। চারিদিকে গাছপালার নামমাত্রও নাই, কেবল অত্যুন্নত পর্বতশৃঙ্গসকল তুষারাবৃত হইয়া অনন্তকাল হইতে দণ্ডায়মান। দেখিলেই মন এককালে ভয় ও বিস্ময়ে প্লাবিত হইয়া যায় এবং সেই 'মহতো মহীয়ানে'র অনন্ত শক্তিতে ডুবিয়া যায়। স্থানটিতে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। এখানে একরাত্র মাত্র থাকা হয়। বড় শীত, সারারাত অগ্নি (ধুনি) সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া কাটাইতে হইয়াছিল।

"২য় কেদারনাথ—এটিও একটি অনাদি লিঙ্গ। বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত-শৃঙ্গে স্থাপিত। মন্দিরের দুই পার্শ্বে এবং পশ্চাৎ ভাগে অনন্ত হিমানী। এ বরফ গ্রীষ্ম-কালেও সম্পূর্ণ গলিয়া যায় না।…পশ্চাৎ ভাগের শৃঙ্গটি এতই নিকটে যে বোধ হয় মন্দির হইতে ২০।২৫ হস্ত দূরেই অবস্থিত। দেখিলেই বোধ হয় ইহা দেবাদিদেব মহাযোগীর যোগস্থান। প্রকৃতি যেন কহিয়া দিতেছে যে এখানে একটুমাত্র শব্দ হইলেও শান্তিভঙ্গ হইবে—যেন সকলকেই এখানে আসিতে নিষেধ করিতেছে—যেন কহিতেছে, দর্শন করিয়াই পলাইয়া যাও; এখানে স্থান মনুষ্যের নয়। রাত্রিকালে একবার ঘরের বাহিরে আসি। রাত প্রায় দুই প্রহর কি একটা হইবে। আসিয়াই দেখিলাম,—অপূর্ব দৃশ্য! চন্দ্রের কিরণে চারিদিকের পাহাড় যেন রৌপ্যমণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে। বরফ হইতে কিরণ ছুটিতেছে। পশ্চাতের শৃঙ্গটির ছায়াতে মন্দির আর দেখা যাইতেছে না। বোধ হইল যেন ঐ গগনভেদী শৃঙ্গটিই দেবাদিদেবের মন্দির। স্থানটি একেবারে নিঃশব্দ ও নিঃস্পন্দ; কেবল অদূরে স্বর্গমন্দাকিনীর কলকল-শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বাস্তবিক,

এমন ভয়ানক অথচ সুন্দর স্থান কখনও দেখি নাই। solemnly grand. শীতের কথা আর কি লিখিব। শীতের চোটে নীচে দুই মাইল অবধি গাছপালা কিছুই হয় না। জীবজন্তুর ত কথাই নাই। তবুও এ বৎসর মোটে বরফ পড়ে নাই। মন্দিরে আসিবার সময় আধ মাইল দুর হইতে বোধ হইল যে হাত পা একেবারে জমিয়া যাইল। শীতের প্রভাবে বাক্যরোধ হইয়া যাইতে লাগিল। দৌড়িয়া মন্দিরে গিয়া অগ্নির উত্তাপে হাত পা সেঁকিয়া তবে প্রকৃতিস্থ হই। মন্দিরে পৌছিয়াছি মাত্র আর আকাশ হইতে পেঁজা তুলার মত বরফ প্রায় অর্ধঘণ্টা অবধি পতিত হইতে লাগিল। জল এক ফোঁটাও পড়িল না। পরে জল পড়িতে লাগিল। অনন্ত ভগবানের অনন্ত লীলা।...

"৩য় বদরীনারায়ণ—কেদার অপেক্ষা অনেক নিম্নে অবস্থিত। শীতও অনেক কম। লোকের বসবাসও আছে। তবে ছয়মাস কাল কেহ থাকিতে পারে না। মন্দিরের নিম্নেই অলকানন্দা ভীমরোলে প্রবাহিত। এখানে ভগবান নারায়ণের ধ্যানমূর্তি অবস্থিত। ভগবান বুদ্ধদেবের ধ্যানমূর্তি যদি কখনও দেখিয়া থাকেন, ভাবিয়া লউন। কারণ মূর্তিটি অবিকল তদ্রূপ। দেখিলে অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরের চারিদিকেই (কেদারের ন্যায় অত নিকটে নয়) perpetual snow-range (চিরস্থায়ী তুষারমালা)। কেদার যেমন মনুষ্যের থাকিবার স্থান নয় বলিরা বোধ হয়, এস্থান তেমন নয়। তবে তপস্যার উপযুক্ত স্থান বটে। প্রথম প্রথম আমার তত ভাল লাগে নাই, কিন্তু ২।৩ দিন পরে নারায়ণের কৃপায় এমন ভাল লাগিল যে আর ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছা করে না। সঙ্গীরা চলিয়া আসাতে অনিচ্ছায় চলিয়া আসিলাম। এস্থান হইতে তিব্বত ৭ দিবসের পথ মাত্র। এ স্থানটি বৌদ্ধদিগেরও একটি তীর্থভূমি। এখানে স্নানের বড়ই সুবিধা, একটি গরম কুণ্ড (বড় চৌবাচ্ছা) আছে। একটি নল দিয়া তাহাতে অনবরত গরম জল পড়িতেছে। যে প্রকার ইচ্ছা গরম জলে স্নান কর। নলের নিকটে যাও—খুব গরম, এমন কি অসহনীয়; নল হইতে যত দুরে যাইবে কুণ্ডের জল ততই ক্রমশঃ ঠাণ্ডা। আর একটি অদ্ভুত দেখিলাম, এখানেও ৺জগন্নাথদেবের প্রসাদের মত প্রসাদের মাহাত্ম্য। সকলেই ভাতপ্রসাদ খায়, কিনিয়াও লইয়া যায়। একমাইল দুরে গণেশ-গুফা ও ব্যাস-গুফা নামক দুইটি স্থান আছে। এখানেই ভগবান ব্যাসদেব বেদবিভাগ ইত্যাদি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"...ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গায়ত্রী ও সন্ধ্যা কি ব্রাহ্মণদিগের হইতে ভিন্ন? যদি হয় তাহা হইলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গায়ত্রী দুইটি লিখিয়া পাঠাইবেন। আপনি স্বয়ং যদি না জানেন তো কোন পণ্ডিতের নিকট হইতে জানিয়া লিখিবেন।"

শ্রীসারদানন্দ-প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত ধর্মভাব জাগ্রত করিতে যে কিরূপ আগ্রহশীল ছিলেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গায়ত্রী শিক্ষা করা এবং সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি আনয়ন করিয়া জনৈক ব্রহ্মচারীকে প্রদান করার মধ্যে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

ভাটোয়ারি হইতে কেদারনাথ গমনের পথে শরৎ মহারাজ ও তাঁহার অপর দুই গুরুভ্রাতাকে যে কিরূপ কষ্টকর অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল, প্রমদাদাসবাবুকে লিখিত পত্রে সেকথা তিনি অনেকটা চাপিয়া গিয়াছেন। বহু বৎসর পরে, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে নবীন সন্ন্যাসিগণের মাধুকরী-প্রসঙ্গে তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন: "আমরা এক সময়ে—আমি, হরি মহারাজ আর (সান্যাল মহাশয়কে দেখাইয়া) ইনি—এই তিনজন মিলে উত্তরাখণ্ডে যাচ্চি। একদিন পাহাড়ের একটু নীচে একটা গ্রাম দেখতে পেয়ে, ক্ষিদেও পেয়েচে, গেলুম মাধুকরী করতে। গিয়ে অনেক ঘুরলুম, কিন্তু একটা লোকও দেখতে না পেয়ে অগত্যা ফিরে এলুম। সেদিন উপোস করে রইলুম। পরদিনও ঐ রকম। তৃতীয়দিন অন্য একটা গ্রামে, চারদিক ঘুরে, একটা লোক দেখতে পেলুম। সে বল্লে, 'তোমরা হয় খুব ভোরে, আর না হয় সন্ধ্যার পর আসবে, তা হলে পাবে। গ্রামের লোক সব ভোরে অন্যত্র কাজে চলে যায়, একটি লোকও থাকে না, ছেলেপিলে নিয়ে যায়।' কাজেই সেদিনও ঐ রকম উপোস চল্ল। সেদিন হরি মহারাজ, একরকম ঘাস পাহাড়ে পাওয়া যায় সেই ঘাস দেখে বল্লেন, 'আমি এই ঘাস খাব।' খিদেও বেশ পেয়েচে। শুধু তাঁর নয়—দুইতিন দিন খাওয়া হয় নি, আমাদেরও পেয়েচে। তিনি তো খাচ্চেনই! আমি বল্লুম, 'না না, ও ঘাস খেয়ে কাজ নেই। ও ঘাস খেয়ে যদি বমিটমি হয়—কি, কি হবে কে জানে!' তিনি

বল্লেন, 'না, কি আর হবে।' বলেই খেলেন, আর খানিক পরেই বমি। বমি করে খুব দুর্বল হয়ে পড়লেন, চলতে পারেন না। কি করা যায়, এখানে জনমানব নাই, মহামুস্কিল! যা হোক, দৈবক্রমে একটা পাণ্ডা লোক দেখতে পেয়ে আমরা তার সঙ্গ নিলুম। হরি মহারাজকে ধরে ধরে অতি কষ্টে উত্তরাখণ্ডে [বুড়ো কেদারে] পৌঁছি। ঐদিন কাঁচা ভিক্ষা করে এনে শেষে খাওয়া হয়েছিল।... এই আমাদের মাধুকরীর একটা গল্প।" [প্র]

পরিব্রাজক অবস্থায় কখনও ঠাকুরের দয়ার নিদর্শন পাইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসিত হইয়া শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "যখন পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্চি তখন একদিন অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হয়ে গরম লুচি ও হালুয়া খাবার ইচ্ছা হল। ভাবলুম, যদি এখানে লুচি ও হালুয়া খেতে পাই তবে বুঝব ঠাকুর সত্যিই আছেন। স্থানটি জনমানবশূন্য, তা ছাড়া ও দেশে বাঙ্গলার মত লুচির চলও নেই। অল্পক্ষণ পরেই দেখি একটি লোক পেছন থেকে ডাকচে—তার একহাতে একটি পাত্রে কিছু ঢাকা রয়েচে, অন্য হাতে একলোটা জল। গরম লুচি ও হালুয়া অপ্রত্যাশিত-ভাবে জুটল। সঙ্গীরা দুইজন কিছু আগে যাচ্ছিলেন, ঐ খাবার তিন জনে ভাগ করে খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলুম, কিন্তু লোকটি সেখানে বসে একাই সব খেতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। শেষে বল্লে, 'তুমি খাও, ওদের জন্যে পরে ব্যবস্থা হবে।' কি আর করি, সেখানে বসেই সেই গরম লুচি ও হালুয়া খেলুম। খাওয়া হলে সে বল্লে, 'এখন যাও।' তারপর নিজেও আর একদিকে চলে গেল।" [প্র]

এই সময়কার আরও দুইটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তর কাশী হইতে গঙ্গোত্তরী গমনের পথে নগ্নপদে চলিয়া শরৎ মহারাজের সুকোমল পদতল এরূপ বিক্ষত হয় যে, অগ্রগমন অসম্ভব হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় সান্ত্বনয়ে বলিতে থাকেন, 'একটিকে ছেড়ে গেলে যদি

প্রভুর আর দুটি সন্তান নিরাপদ হয়, আর তিনজনের স্থানে যদি একজন অনাহারে থাকে, তাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। আমি কতটা নির্ভরশীল, বোধ হয় তাই দেখতে প্রভুর এই বিধান। তোমরা বয়োজ্যেষ্ঠ, আশীর্বাদ কর যেন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি।' ব্যথিতহৃদয়ে বিদায় লইয়া সঙ্গিদ্বয় দৃষ্টিপথের বাহির হইবামাত্র তিনি শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথ জনশূন্য। কালীকমলী-বাবার লোকজন জিনিষপত্র লইয়া গঙ্গোত্তরীর অভিমুখে যাইতেছিল। তাহারা তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া একটি ভারবাহী ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া লইল ও পুরোবর্তী গ্রামে নামাইয়া দিয়া গন্তব্যস্থল অভিমুখে চলিয়া গেল। হরি মহারাজ ও সান্যাল মহাশয় তখন সেই গ্রামেই ছিলেন ও বিপন্ন ভ্রাতাকে লইয়া আসিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

হিমালয়ের এক ভীষণ খাড়াই অবতরণ করিবার সময় শরৎ মহারাজ দেখিতে পান যে, যষ্টির অভাবে এক বৃদ্ধা বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছে। নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া হৃদয়বান সন্ন্যাসী স্বীয় যষ্টিখানি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধাকে প্রদান করিলেন। যষ্টি ঐসকল স্থলে অপরিহার্য; কারণ উহার অভাবে পদস্খলন ঘটিয়া প্রতি মুহূর্তে জীবন বিপন্ন হইতে পারে। আর প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইয়াছিল। যষ্টিহীন অবস্থায় কোনরূপে অবতরণ করিতে সক্ষম হইলেও সানুদেশে পার্বত্য নদী অতিক্রম করিবার কালে তিনি জলে পড়িয়া গিয়াছিলেন। খরস্রোতে তাঁহাকে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া সঙ্গী দুই গুরুভ্রাতা বহু আয়াসে পরপারে লইয়া যান।

* * *

৺কেদার-বদরী দর্শনান্তে সারদানন্দ ও সান্যাল মহাশয় আলমোড়ায় নামিয়া আসিয়া লালা বদ্রি শার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুরীয়ানন্দ আলমোড়ায় না আসিয়া নন্দপ্রয়াগ হইতে ভিন্নপথে ডেরাদুন অভিমুখে চলিয়া যান এবং ডেরাদুনের একক্রোশ উত্তরে রাজপুরে থাকিয়া তপস্যায় মগ্ন হন। পূর্বোদ্ধৃত যে পত্রখানি আলমোড়া হইতে শরৎ মহারাজ প্রমদাদাসবাবুকে লিখিয়াছিলেন শীঘ্রই তাহার উত্তর আসিল এবং তাহাতে তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, স্বামিজী ও অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর মহারাজ) কাশীতে আসিয়া প্রমদাদাসবাবুর আতিথ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া ও আলমোড়ায় আসিতে অনুরোধ জানাইয়া শরৎমহারাজ ও সান্যাল মহাশয় ২৩শে আগষ্ট এক পত্র লিখিলেন এবং সেই পত্রে ইহাও জানাইয়া দিলেন যে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে আলমোড়া যাইবার যাবতীয় ব্যবস্থা বদ্রি শা করিয়া দিবেন।[৮]

---

৮ পত্রখানি এইরূপ :

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

Almora
23rd Aug., 90

My dear Naren & Ganges,

Very glad to learn from Pramada Babu's letter today that you have come to Benares and are about to start for Almora. We are very anxious to see you both and for this reason loitering here so long. If we fail to see you this time, we do not know when it will be good opportunity to meet with each other. Pray be good enough to come up here as early as you can, at least grant this favour to our request. We must wait here till your reply, or as later as 2nd proximo. On your intimation Badri Sha is willing to make arrangements for your travel from Ry. Stn. up to here. We are all right ; be God blessed that you are in good heath,

Affectly yours,
Sarat & Sanyal,

স্বামিজীর নিকট লিখিত পত্রের সঙ্গে প্রমদাদাসবাবুকেও তাঁহারা পত্র দিয়াছিলেন। অতঃপর ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে শরৎ মহারাজ পুনরায় লিখিলেন: "নরেন্দ্র ও গঙ্গাধর ৫।৭ দিন হইল এখানে আসিয়াছে। অদ্য পুনরায় গাড়োয়ালের দিকে রওনা হইবে। নরেন্দ্র বারবার নিষেধ করাতে আপনাকে এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই। তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। আমরাও নরেন্দ্রের সঙ্গে চলিতেছি। পত্রাদি কিছুকাল আর লিখিতে পারিব না। কারণ, তাহা হইলে আমাদিগকে সঙ্গে রাখিবে না। ভগবানের ইচ্ছা হয় তো আবার সাক্ষাৎকার হইবে।...এ পত্রের উত্তর দিবেন না।"

আলমোড়া ছাড়িয়া স্বামিজী ও তাঁহার অপর তিন গুরুভ্রাতা হিমালয়স্থ গাড়োয়াল রাজ্য পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। কর্ণপ্রয়াগ হইতে শ্রীনগরে যাওয়ার পথে স্বামিজী ও অখণ্ডানন্দ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন ও ডাণ্ডী করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীনগরে লইয়া যাইতে হয়। সেখানে তাঁহারা মাসাধিককাল বাস করেন। তারপর টিহরিতে আসিয়া ডাক্তারের পরীক্ষায় অখণ্ডানন্দের ব্রঙ্কাইটিস হইয়াছে ও তাঁহার সমতলভূমিতে যাওয়া আবশ্যক জানিয়া সকলে মিলিয়া ডেরাদূনে নামিয়া আসেন। ডেরাদূনের পথে রাজপুরে তুরীয়ানন্দ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। অখণ্ডানন্দকে ডেরাদূনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাখিয়া স্বামিজী, সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও সান্যাল মহাশয় হৃষীকেশে যাইয়া তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অখণ্ডানন্দের এলাহাবাদ যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তথায় না গিয়া তিনি মীরাটে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাটীতে চলিয়া যান।

উগ্র তপস্যায় কিছুদিন এখানে কাটাইয়া স্বামিজী প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া পরবর্তী কালে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'স্বামিজীর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল;

নাড়ী পাওয়া যায় না। আমরা মনে করলুম এইবার শেষ। যা হোক, জ্ঞান ফিরে এল। পরে আমাদের বলেছিলেন, নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। তখন বুঝেছিলেন, কাজ করতে হবে—মৃত্যুর পুর্বে ভিন্ন আর নির্বিকল্প সমাধি হবে না। এখন থেকে কি কাজ করতে হবে আর কিভাবে তা করতে হবে এইসব চিন্তা আসতে লাগল।' [প্র]

গুরুভাইদের সেবাযত্নে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া স্বামিজী তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হরিদ্বারসমীপে কনখলে চলিয়া আসেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই সময়ে কনখলে তপস্যানিরত ছিলেন। তিনি অখণ্ডানন্দকে দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় সকলে মিলিয়া মীরাটে যান ও চারিপাঁচ মাস তথায় একত্র অবস্থান করেন। শেঠজীর উদ্যানবাটী দ্বিতীয় বরাহনগর মঠে পরিণত হইল এবং জপ ধ্যান ভজন শাস্ত্রচর্চা ও সমাগত লোকজনকে উপদেশ দানের ভিতর দিয়া মার্চ মাস পর্যন্ত পরমানন্দে কাটিয়া গেল।

স্বামিজী অতঃপর মীরাট হইতে দিল্লীতে প্রস্থান করিলে গুরুভাইরা সেখানেও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ বলিয়াছেন : দিল্লীতে সচ্চিদানন্দ-স্বামীর নাম শুনে দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি স্বামিজী নাম ভাঁড়িয়ে সেখানে রয়েচেন। আমাদের দেখে বল্লেন, 'শালারা আমার খোঁজে খোঁজে এসেচ?' আমরা বল্লুম, 'না হে না, আমরা সচ্চিদানন্দ-স্বামীর দর্শনে এসেচি!' [প্র]

দিল্লী হইতে স্বামিজী একাকী রাজপুতানা অঞ্চলে চলিয়া গেলেন। এই বিচ্ছেদের দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে লণ্ডনে তাঁহার সহিত সারদানন্দের পুনর্মিলন ঘটে।

অতঃপর এটাওয়া, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সারদানন্দ ও সান্ন্যাল মহাশয় কাশীতে পুনরাগমন করিলেন এবং ভেলুপুরায় বাবু সীতারামের

বাগানবাড়ীতে থাকিয়া তপস্যায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। দীনু বা দীননাথ নামে মুমুক্ষু এক ব্যক্তি সদ্‌গুরুর অন্বেষণে কাশীতে আসিয়া সোনারপুরা বংশীদত্তের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি একদিন শরৎ মহারাজের সঙ্গে পরিচয় করিতে আসিলেন।

ইতঃপূর্বে দীনু এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য শিবানন্দ ও যোগানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, সারদানন্দের দেখা পান সকলের শেষে। ভূপতি নামে ঠাকুরের আর এক শিষ্য—যিনি 'ভাই-ভূপতি' বলিয়া কথিত হন—ঐ সময়ে সীতারামের বাগানবাড়ীতে ছিলেন ও বোধ হয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে ভিক্ষালব্ধ ছাতু খাওয়াইতে খাওয়াইতে শরৎ মহারাজ দীনুর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন।

এইরূপে পরিচয়ারম্ভ হইয়া ক্রমে পরে নিত্যসঙ্গ হইতে লাগিল। শরৎ মহারাজ ভেলুপুরা হইতে ৺দুর্গাবাড়ীর সন্নিকটে অন্নদা দত্তের বাগানবাড়ীতে স্থানান্তরিত হইলে দীনু সেখানেও যাওয়াআসা করিতে লাগিলেন। মহারাজ ভিক্ষা করিয়া খাইতেন ও অধিকাংশ সময়ই ধ্যানজপে মগ্ন থাকিতেন। দীনুও ভিক্ষা করিয়া খান, কিন্তু যেদিন স্বহস্তে পাক করেন সেদিন মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। শেষে অন্নদা দত্তের বাগানবাড়ীতে উঠিয়া গিয়া তিনি শরৎ মহারাজের সঙ্গে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। সান্যাল মহাশয় ও ভাই ভূপতি তখন কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। এইভাবে দুই মাস কাটিয়া গেল।

জুনের মধ্যভাগে—আষাঢ়ের প্রথমে প্রয়াগ হইতে আসিয়া স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হন। রথযাত্রার দিন তিনজন একসঙ্গে পঞ্চক্রোশী কাশী পরিক্রমা করিতে বহির্গত হইয়া তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে পরিক্রমা সম্পূর্ণ করেন। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে পথ চলিতে সকলেরই বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল; ফলে বংশীদত্তের বাটীতে আসিয়া একে একে তিনজনই শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। শিবক্ষেত্র কাশীতে

বিল্বপত্রের মত স্থলভ বস্তু আর কিছুই নাই ; ঔষধের অভাবে বিল্বপত্রের রস পান করিতে করিতে ক্রমে তাঁহারা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। চৌখাম্বার প্রমদাদাসবাবু এই সময়ে নিত্য একবার আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া যাইতেন।

অতঃপর এক শুভদিনে সন্ন্যাস দিয়া স্বামী সারদানন্দ তাঁহার প্রিয় সহচর দীনুকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘভুক্ত করিয়া লইলেন। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার নাম হইল স্বামী সচ্চিদানন্দ।[৯]

বয়সে দীনু মহারাজ তাঁহার আচার্যদেব হইতে অনেক বড় ছিলেন। সংঘমধ্যস্থ অপর কেহই, এক স্বামী অদ্বৈতানন্দ ব্যতীত, তদপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন না। দীর্ঘজীবী ও সমুন্নতবপু দীনু মহারাজকে পরবর্তী কালে সকলেই সসম্ভ্রমে 'বুড়োবাবা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।[১০]

---

৯ এই সন্ন্যাসদান ব্যাপারে শরৎ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে তৎকালে প্রচলিত সংক্ষিপ্ত বিধি অনুসরণ করিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট দিন রাত্রে ক্ষেমেশ্বর ঘাটে উপনীত হইয়া তিনি এক মন্দিরে উপবিষ্ট হন এবং দীনু মহারাজকে দিগম্বর হইয়া গঙ্গাস্নান করিতে আদেশ করেন। মন্দিরে ঠাকুরের ফটো স্থাপন করিয়া তিনি আলতা দিয়া বিল্বপত্রে প্রৈষ মন্ত্র (ঐহিক-পারত্রিক-ভোগ-ত্যাগসূচক মন্ত্রবিশেষ) লিখিয়া রাখেন, এবং দীনু মহারাজ স্নান করিয়া আসিলে সেই বিল্বপত্র ঠাকুরের পাদপদ্মে দিয়া প্রণামান্তে বস্ত্র পরিধান করিতে বলেন।

১০ বুড়োবাবার প্রসঙ্গে লেখকের বিগত জীবনের বহু স্মৃতি উদ্দীপিত হওয়ায়, খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও দুইএকটি কথা বলিতে প্রলুব্ধ হইতেছি। পাঠকেরা তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কাশীধামে যাইয়া প্রথমতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে থাকিবার সুযোগ প্রাপ্ত হই। অদ্বৈতাশ্রমের পশ্চিমের দরজা দিয়া সেবাশ্রমে প্রবেশ করিতেই বুড়োবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। অশীতিপর বৃদ্ধ বুড়োবাবা গ্রীষ্মের অপরাহ্নে বেলতলায় খাটিয়ার উপর বসিয়াছিলেন এবং আমি না জানিয়া তাঁহাকেই হরি মহারাজ মনে করিয়াছিলাম। এমন

বুড়োবাবাকে সন্ন্যাস দানের কিছুকাল পরেই শরৎ মহারাজ রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হন। বুড়োবাবা তখন সাধ্যানুযায়ী তাঁহার সেবাযত্ন করিতে লাগিলেন। রাত্রে মহিষদুগ্ধের দধি পাতিয়া রাখিতেন এবং সেই দধি সহযোগে চিড়ার মণ্ড পরদিন তাঁহাকে খাইতে দিতেন। এইরূপে পীড়ার কিছু উপশম হইলে বুড়োবাবা তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কলিকাতায় যাইবার কালে মহারাজ তাঁহার নিজস্ব ঠাকুরের ফটোখানি বুড়োবাবাকে দিয়া যান, বুড়োবাবা উহা রাখিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

* * *

শরচ্চন্দ্রের সংসারত্যাগের পরেই তাঁহার পিতা গিরীশচন্দ্রের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী বিমুখ হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইদানীং দুইএক

স্নিগ্ধমধুরভাবে নবাগতকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, আজ ৩৩ বছর পরেও তাহা ভুলিয়া যাইতে পারি নাই এবং বরাবর তাঁহার সেই ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। বোধ হয় সকলকেই তিনি এইরূপ ভালবাসিতেন। ১৯২৩খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের জন্মতিথির দিন পূজনীয় শরৎ মহারাজ অনেককে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য দিবেন শুনিয়াছিলাম। তৎপূর্বদিন প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখি বুড়োবাবা সম্মুখে—নিত্যকার অভ্যাস মত ব্রাহ্মমুহূর্তে জপধ্যান সারিয়া লাঠি ভর দিয়া পায়চারি করিতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেই হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইল, 'বুড়োবাবা, আমি ব্রহ্মচর্য নেব।' অমনি আমার মাথায় হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন, 'আশীর্বাদ করি, বাবা, তোমার ঈশ্বরলাভ হোক।' তখন তিনি একটা ভাবে ছিলেন বোধ হইয়াছিল। সেবাশ্রমের কাজ অনেকটা সারিয়া বেলা নয়টায় অদ্বৈতাশ্রমে যাইয়া শুনিলাম বুড়োবাবা শরৎ মহারাজকে বলিয়া আমার ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা আগেই করিয়া রাখিয়াছেন। অশেষদোষভাজন হওয়া সত্ত্বেও শরৎ মহারাজের কিঞ্চিৎ অনুকম্পা ঐকালে যে অনুভব করিয়াছিলাম, বুড়োবাবাই অনেকটা তাহার কারণ বলিয়া আজও মনে হয়। আমাকে তিনি কাশী ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিতেন ; তথাপি বাহিরে যাইয়া অনেকদিন যাবৎ ভুলিয়া থাকিলেও তিনি ভুলিতেন না। পিতামহের বয়সী এই সন্ন্যাসীর অনাসক্ত বাৎসল্যের মূল্য তখন বুঝি নাই, কিন্তু আজ বেশ বুঝিতে পারি সংসারে উহা কত দুর্লভ বস্তু।

বৎসর কালের মধ্যে তাঁহার অবস্থা বিশেষ খারাপ হইয়া পড়ে—অনাত্মীয়া হইয়াও তাঁহার পরমাত্মীয়া 'পিসীমা' দেহত্যাগ করেন। তাঁহার প্রিয় বসতবাটীখানি পৌরপ্রতিষ্ঠান ক্রয় করিয়া লয় এবং এইসকল ও অন্যান্য কারণে তাঁহার দেহমন পীড়িত ও অবসন্ন হয়। পশ্চিমাঞ্চলে থাকিতেই এইসব সংবাদ শরৎ মহারাজ পাইয়াছিলেন, কিন্তু এইজন্য তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। ঘটনাচক্রে যখন তাঁহাকে বরাহনগর মঠে চলিয়া আসিতে হইল, তিনি অগ্রেই যাইয়া মাতাপিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার ব্যবহারে মাতাপিতা ও ভাইভগিনীরা তাঁহাদের আগেকার শরচ্চন্দ্রকেই নিকটতরভাবে ফিরিয়া পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; কিন্তু যে অনাসক্তি ও ঈশ্বরপ্রীতি—যে 'মায়া'র পরিবর্তে 'দয়া'—এখন তাঁহার প্রতিকার্যের সার্থক প্রেরণা, স্নেহদৌর্বল্যবশতঃ তাঁহারা তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, এই সময় হইতে দেখা যাইত, সাংসারিক কোন আপদ বিপদের সংবাদ পাইলেই তিনি মাতাপিতার পাশে যাইয়া দাঁড়াইতেন এবং উহার প্রতিকারের জন্য যথাশক্তি চেষ্টাও করিতেন। একবার এক মুমূর্ষু অনুজের শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া মাসাবধিকাল তিনি তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

কাশী হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শরৎ মহারাজ বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন। এখানে নিয়মিতভাবে ঔষধপথ্য ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হইলে তিনি মাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিবার জন্য জয়রামবাটী যাইতে অভিলাষী হন। মায়ের বাড়ীতে ৺জগদ্ধাত্রী-পূজা হইবে—প্রতিবৎসরই মা জগদ্ধাত্রীপূজা করিতেন—সেইজন্য বহু জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া, এবং যোগীন-মা, গোলাপ-মা, সান্যাল মহাশয়, হরমোহন মিত্র ও ব্রহ্মচারী কালীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া, বর্ধমানের পথে

জয়রামবাটী গমন করিলেন। পরমানন্দে তথায় কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইল এবং পুজাও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু উহার পরে সকলেই ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। এই অবস্থায় অধিক দিন সেখানে থাকিয়া মায়ের পরিশ্রম ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করা সমীচীন নহে মনে করিয়া জ্বর ছাড়িবার পরে সকলেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। দারুণ ম্যালেরিয়া বিষ শরীরে ধারণ করিয়া শরৎ মহারাজ প্রায় দুই বৎসরকাল কষ্ট পাইয়াছিলেন।

পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল প্রমদাদাসবাবুকে লিখিত এক পত্রে তাঁহার তৎকালীন শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অনেকটা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"৫।৭ দিন হইতে আপনাকে একখানি চিঠি লিখিব লিখিব মনে করিতেছিলাম, কিন্তু অবসর হয় নাই। এমন সময় আজ প্রাতে সারদাপ্রসন্ন (ত্রিগুণাতীতানন্দ) আসিয়া আপনার কথা কহিলেন। আপনি আমার চিঠি না পাওয়াতে দুঃখিত হইয়াছেন শুনিয়া বড়ই কষ্ট পাইলাম। কারণ অকারণে আপনার মত একজন পরম ভক্তের মনে কষ্ট দিয়াছি। অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনি যে মনে করিয়াছেন, যে ৺কাশীধামে যখন ছিলাম তখন আপনার কোন কথায় বিরক্ত হইয়া আমি পত্রাদি এপর্যন্ত লিখি নাই তাহা বিষম ভ্রম। আমার স্বভাবই এইরূপ হইয়া গিয়াছে, পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছাই করে না। যদি বা জোরজার করিয়া বসি তো কি লিখিব কিছুই ভাবিয়া পাই না। তারপর কাশী হইতে রক্ত আমাশয় হইয়া এখানে চলিয়া আসা অবধি শরীর বড়ই অপটু হইয়াছে। একটা না একটা অসুখ লাগিয়াই আছে। রক্ত আমাশয় সারিয়া গিয়াছে, কিন্তু ৪।৫ মাস যাবৎ ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছি। এখনও tonic (বলকারক ঔষধ) খাইতেছি।...আপনার উপর ভক্তি ও ভালবাসা পূর্বের ন্যায়ই আছে, কিছুমাত্র কমে নাই, বরং আপনার যেরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস তাহার একবিন্দু আমি পাইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করি। আশীর্বাদ করিবেন যেন ভগবচ্চরণে দৃঢ়া ভক্তি হয়। আর কাশীরাজ শ্রীশ্রীবিশ্বনাথজী ও অন্নপূর্ণা মাতাকে আমার কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ জানাইবেন।"

পূর্বোক্ত পত্রখানির উত্তর পাইবার পরে, ২৬শে অক্টোবর তারিখে তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"আপনার পত্র বহুদিবস পাইয়াছি। কিন্তু শরীরের অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে এ পর্যন্ত উত্তর দিতে পারি নাই।...পুরাতন পত্রখানি পাইয়া যে আমার হৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন ইহাতে বড়ই আনন্দ হইল।...আমার শরীর সেই অবধি বড় ভাল নয়। এখন পর্যন্ত সেই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছি। আজও অকটু জ্বর আসিয়াছে।"

অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া শরৎ মহারাজের দেহের অবস্থা এখন এমনই হইয়াছে যে একখানা চিঠি লিখিতেও কষ্ট হয়; কিন্তু তাঁহার মন তাই বলিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই। তিনি ধ্যানধারণা স্বাধ্যায় লইয়া আছেন এবং সমাগত লোকজনকে গ্রহণ করিয়া যে যেমন তাহার সঙ্গে সেই ভাবের আলোচনা করিতেছেন। 'ব্যাধি ও তপস্যা একই জিনিষ' —শ্রীশ্রীমা বলিতেন। নীরবে শান্তমনে ব্যাধিজনিত কষ্ট সহ্য করিয়া সারদানন্দ সেই মহাতপস্যা করিয়া যাইতেছেন।

যে আধার যত বড় তাহার ধারণক্ষমতাও তত বেশী। অল্পেতে তাহা পুর্ণ হয় না। আর পুর্ণ হয় না বলিয়াই পরিতৃপ্তিও আসে না। এইকালে শরৎ মহারাজের কথাবার্তায় তাঁহার নিজের সম্বন্ধে একটা আক্ষেপ ও দৈন্যের ভাব ফুটিয়া উঠিত; বলিতেন, 'তত্ত্ব উপলব্ধি হল না, জীবন বিফলে গেল। কি আর করব, সব তাঁরি ইচ্ছা!' কখনো বা বলিতেন, 'সাধনভজন কিছুই তো হল না, তাই মনে করচি, দীন-দুঃখী আতুরের সেবা করে এ জীবন বিসর্জন দেব।' প্রমদাদাসবাবুকে লিখিত পত্রেও যেন ঐরূপ ভাবের একটা চাপা সুর ধ্বনিত হইয়াছে। পুর্ণ তত্ত্বোপলব্ধির পথে মানসিক এইরূপ অবস্থা বোধ হয় সাধকমাত্রেরই সময়ে সময়ে আসিয়া থাকে। তাঁহার গুরুভ্রাতা ও বন্ধুরা কিন্তু এই সময়টাতেই তাঁহাকে দেবভাবে সর্বদা পরিপুর্ণ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন, এবং প্রাণে প্রাণে তাঁহার ভালবাসার আকর্ষণ অনুভব করিয়া, তাঁহার নিকটে থাকিতে ও তাঁহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করিতেন।

এখানে লক্ষ্য করিবার মত একটি বিষয় এই যে, আবাল্য শরৎ

মহারাজ দীনদুঃখী আতুরের সেবা করিয়াছেন, তত্ত্বোপলব্ধি না হইলে উহাদের সেবা করিয়াই দেহ বিসর্জন করিতে চাহিতেছেন—প্রায়োপবেশন বা অন্য কিছু করিয়া নহে, আবার তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরেও উহাদের সেবা লইয়াই থাকিবেন। সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় তাঁহার জীবনবীণা একই সুরে বাজিতেছে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের জন্মমহোৎসব হইয়া যাওয়ার পর ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শরৎ মহারাজ প্রমদাদাসবাবুকে লিখিয়াছেন,—'আপনার মণিঅর্ডার পাইয়াছি। মহোৎসব পরশ্ব হইয়া গিয়াছে। ৫।৭ হাজার লোকসমাগম হয়। সকলের মুখেই উৎসাহ, ভক্তি ও আনন্দের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল। আমাদের নমস্কার ও ভালবাসা জানিবেন। এখানকার সব মঙ্গল।' তারপর অন্যান্য সকলের খবর দিয়া নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঐ পত্রেই লিখিয়াছেন, 'মধ্যে শরীর বড় খারাপ হইয়াছিল, এখন কতকটা ভাল।'

পত্রখানিতে বেলুড় পোষ্টাপিসের ছাপ থাকায় এবং বরাহনগর মঠের বা অপর কোন ঠিকানা লেখা না থাকায় সহজেই প্রতীত হয় যে, উহা লিখিবার সময় শরৎ মহারাজ বেলুড়ে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে অবস্থান করিতেছিলেন। মায়ের খবর তখন বাহিরের লোকজনকে দেওয়া হইত না।

এই বৎসরেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য, শ্রীশ্রীমাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ বলরাম বসুর সহধর্মিণী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত কৈলোয়ারে যান ও দুইমাস তথায় বাস করেন। মায়ের দলভুক্ত হইয়া, স্বামী যোগানন্দ, ত্রিগুণাতীত, গোলাপ-মা, বাবুরাম মহারাজের মা প্রভৃতি সহ শরৎ মহারাজও কৈলোয়ারে গিয়াছিলেন।

পূর্ব স্বাস্থ্য শরৎ মহারাজ ফিরিয়া পাইলেন এবং একাকী দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতে থাকিয়া কঠোর তপস্যায় আবার ব্যাপৃত হইলেন। সেই তপস্যাকালীন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে সিধা নিয়ে আসতুম। একটি মাটির মালসায় তাই ফুটিয়ে দিনান্তে একবারমাত্র খেতুম আর দিনরাত ধ্যানজপ করতুম। রান্না হয়ে গেলে সেই মালসাতেই ঠাকুরকে অন্ন নিবেদন করে তাতেই প্রসাদ পেতুম। পাত্রটিকে ধুয়ে গাছে টাঙ্গিয়ে রাখতুম, পরদিন আবার তাতেই রান্না করতুম। এভাবে দীর্ঘকাল ঐ একই পাত্রে চালিয়েছিলুম।'

অতঃপর তিনি পুনরায় দেশভ্রমণে বাহির হইলেন এবং রাজপুতানা, গুজরাট, কাথিয়াবাড় প্রদেশে দীর্ঘকাল থাকিয়া—জয়পুর, পুষ্কর, আবু, দ্বারকা, প্রভাস, জুনাগড়, নাথদ্বারা, চিতোরগড় প্রভৃতি স্থানসমূহ দর্শন করিয়া আলমবাজার মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মঠে ফিরিবার পরে তাঁহাকে দুইটি কঠিন সেবাকার্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই। খালি পায়ে প্রভাস, দ্বারকা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্বামী অভেদানন্দের বাম পায়ে ক্ষত হয় ও তাহাতে পোকা (গিনিকীট) পড়িয়া জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। শরৎ মহারাজ নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া প্রত্যহ একটি একটি করিয়া পোকা বাহির করিতেন ও ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া শুষ্কবস্ত্রে বাঁধিয়া দিতেন। ক্রমাগত তিনমাস এইরূপে অশেষ ধৈর্য ও মমতার সহিত শুশ্রূষা করার ফলে অভেদানন্দজী নিরাময় হন। শরৎ মহারাজের দেহান্তে, 'ভাই শরৎ, তুমি আমার প্রাণদাতা, তোমার ঋণ আমি কখনো পরিশোধ করতে পারব না'—ইত্যাকার আবেগপূর্ণ ভাষায়, অভেদানন্দজী সেকথা কলিকাতার জনসভায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণের গৃহশিক্ষক ফকির (যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য)

যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। তিনি যখন দ্রুত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া শরৎ মহারাজ দিনরাত অবিশ্রান্ত-ভাবে তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছিলেন।

দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রবৃহৎ ঘটনায় মানুষের চরিত্রের বিশেষত্ব ধরা পড়ে। আলমবাজার মঠে একদিন শরৎ মহারাজ দেখিতে পান যে, ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া কেহ তথায় কর্দমাক্ত পায়ের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে কাজটি পাচক ব্রাহ্মণের বলিয়া তিনি জানিতে পারিলেন এবং অত্যন্ত তীব্রস্বরে তাহাকে আহ্বান করিলেন। মনে হইল এখনই একটা বিসদৃশ ব্যাপার ঘটিবে। ডাকে সাড়া দিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে উপরে আসিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি আমায় ডাকচেন?' জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ নিমেষে আত্মসম্বরণ করিয়া ফেলিয়াছেন : শান্তকণ্ঠে কহিলেন, 'না, কিছু নয়, তুমি যেতে পার।'

৮

সাগরপারে বার্তাবহরূপে

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় স্বামিজী হিন্দুধর্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন, ইহা আজ সর্বজনবিদিত কথা। দুই বৎসরকাল আমেরিকার নানাস্থানে বেদান্ত প্রচার করিয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি লণ্ডনে আসেন এবং তাঁহার মুখে ধর্মব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সেখানেও বহুলোক উন্মুখ হইয়া আছে দেখিতে পান। দুই স্থানের প্রচারকার্য একজনের দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া তিনি একজন উপযুক্ত সহকর্মীর কথা চিন্তা করিতে থাকেন। নির্বাচন শেষ পর্যন্ত স্বামী সারদানন্দের উপর নিপতিত হয়; এবং অবিলম্বে লণ্ডন যাত্রা করিবার অনুরোধজ্ঞাপক পত্র লিখিয়া স্বামিজী পাথেয় বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থও পাঠাইয়া দেন। ধীরস্থির সারদানন্দ সকল দিক বিবেচনা করিয়া নিজেকে ঐ কার্যের যোগ্য মনে করিতে পারিলেন না এবং পত্রের উত্তরে স্বামিজীকে সবিনয়ে সেই কথাই জানাইয়া দিলেন। উত্তর পাইয়া স্বামিজী ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না।

ডিসেম্বর মাসে তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তথা হইতে প্রিয় গুরুভ্রাতাকে অভিমান ও শ্লেষপুর্ণ একখানি পত্র লিখিলেন। নিউইয়র্কে ইতোমধ্যে 'বেদান্ত সমিতি' নামে প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, এবং তথাকার কার্যপরিচালনার ভার যোগ্যতম কোন গুরু-ভ্রাতার উপর অর্পণ করিবেন এই আশ্বাস সমিতির সভ্যগণকে দিয়া স্বামিজী লণ্ডনে ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সারদানন্দ আর যাইতে পারিব না বলিতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীসারদামাতার অনুমতি

গ্রহণ করিবার জন্য তিনি জয়রামবাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, 'কোন ভয় নাই বাবা, তুমি যাবে। ঠাকুর তোমাদের সর্বদা রক্ষা কচ্চেন।'

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, মার্চ মাসের এক শুভদিনে আলমবাজার মঠ হইতে যাত্রা করিয়া শরৎ মহারাজ ১লা এপ্রিল লণ্ডনে উপনীত হন এবং তথায় স্বামিজী কর্তৃক নির্দিষ্ট ঠিকানায়—মিঃ ষ্টার্ডির আবাসে থাকিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।

ইংলণ্ড গমনের পথে, ভূমধ্যসাগরে প্রবল ঝড় তুফানের মুখে পড়িয়া জাহাজ ডুবুডুবু হইয়াছিল। জীবনরক্ষার জন্য আরোহিগণ যখন অধীর-ভাবে ছুটাছুটি ও করুণ ক্রন্দন করিতেছিল, সারদানন্দ তখন অবিচলিত-ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার মন ছিল, তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতে গেলে, 'ঠিক নিক্তির কাঁটার মতন।' রোম নগরীতে আসিয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেণ্ট পিটার গির্জা দেখিতে দেখিতে তাঁহার ভাবান্তর ঘটে এবং পিটারের প্রতিমূর্তির সম্মুখে কিছুক্ষণের জন্য তিনি বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন। প্রথমোক্ত ঘটনা তাঁহার আত্মসমাহিত মনের পরিচয় দেয়, যে মন জীবনের সঙ্কটমুহূর্তে আত্মোপলব্ধির দ্বারে আসিয়া উপনীত হয়, এবং দ্বিতীয়টি তাঁহার জন্মান্তরীণ স্বরূপ-পরিজ্ঞানের সূচক। কলিকাতায় কিছুদিন যাবৎ প্রায় প্রত্যহ তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া ও আচরণ লক্ষ্য করিয়া প্রসিদ্ধ নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বলিয়া ফেলেন, 'মহারাজ, সেণ্ট পিটারের সঙ্গে আপনার বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।' সেই কথায় ঈষৎ হাসিয়া পিটারের মূর্তির সম্মুখে বাহ্য-সংজ্ঞালোপের ঘটনাটি তিনি নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

অনতিকাল পরে স্বামিজী লণ্ডনে আসিয়া পৌছিলেন, এবং প্রথম মিলনে দুই গুরুভ্রাতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া রহিলেন। মিলনের প্রথম আবেগ শমিত হইলে স্বামিজী অপরাপর

গুরুভ্রাতাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার, তজ্জন্য তদ্দেশবাসিগণের অপরিসীম আগ্রহ, কিভাবে তথায় কার্য পরিচালনা করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হইল। তারপর ষ্টার্ডি-ভবনে শরৎ মহারাজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি নিজে মিস্ মুলারের আবাসে স্থানান্তরিত হইলেন। মে মাসের সূচনা হইতেই নিয়মিতরূপে ক্লাশ খুলিয়া স্বামিজী জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। বক্তৃতা করিবার সময় তিনি শরৎ মহারাজকে কাছে রাখিতেন এবং কিভাবে বক্তৃতা করিতে হইবে তাহাও শিখাইতেন, কিন্তু গীতাদি শাস্ত্রের ক্লাশ ব্যতীত লণ্ডনে তাঁহাকে দিয়া কোনও বক্তৃতা করাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

উত্তরকালে পূর্বকথা-প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন: ইংলণ্ডে পৌছুবার কিছু পরেই স্বামিজী আমাকে এক Vegetarian Society-তে (নিরামিষভোজীদের সমিতিতে) বক্তৃতা দিতে বলে। আমি বল্লুম, 'পারব না।' 'দিতেই হবে' বলে কোথায় বেরিয়ে গেল। এদিকে আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করচি যেন বক্তৃতা দিতে না হয়। ভাগ্যের বিষয়, সেই সমিতি থেকে সংবাদ এল, 'অনিবার্য কারণবশতঃ নির্দিষ্ট দিনে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা যাবে না।' বাঁচলুম! স্বামিজী ফিরে এসে বল্লে, 'কিরে, গিয়েছিলি?' আমি বল্লুম, 'আমি তো যাবই না বলেছিলুম, তুমি জোর করলে কি হয়? এই দেখ ঠাকুরই আমার সহায়।'

গুরুভ্রাতাকে কেবলমাত্র বক্তৃতা করিতে শিক্ষা দিয়াই স্বামিজী কর্তব্যের ইতি করেন নাই, তাঁহাকে পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতেও যত্নপর হইয়াছিলেন। লণ্ডনে একদিন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাটীতে ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারা উভয়ে গমন করেন। সকলের সঙ্গে খাইতে বসিয়া সারদানন্দ সব খাদ্যগুলিই একে একে খাইয়া গেলেন, কিন্তু সকলের শেষে পরিবেষিত

পনীর নামক বস্তুটি মুখে করিবামাত্র তাঁহার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল ও পেটের নাড়ীভুঁড়ী যেন উলটপালট খাইতে লাগিল। সভ্যতার খাতিরে অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে সামলাইয়া নিলেন। স্বামিজী সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিলেন, মুখবিকৃতি দেখিয়া শঙ্কিতও হইয়াছিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাকে সামলাইয়া লইতে দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। স্বামিজীর উপদেশে ও অভ্যাসের গুণে শেষকালে পনীর তিনি কেবল খাইতেই যে পারিতেন তাহা নহে, রুচিপূর্বক গ্রহণ করিতেন।

লণ্ডনে স্বামিজীর প্রচারকার্যের সূচনা ও সাফল্য সম্বন্ধে ছোট অথচ সুন্দর একটি বিবরণ লিখিয়া সারদানন্দ ভারতে প্রেরণ করেন। মাদ্রাজ হইতে তৎকালে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় ৬ই জুন তারিখে উহা প্রকাশিত হয়।

আমন্ত্রিত হইয়া স্বামিজী অক্সফোর্ডে গিয়া আচার্য ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে ২৮শে মে তারিখে সাক্ষাৎ করেন। 'প্রকৃত মহাত্মা' নাম দিয়া আচার্য ইতঃপুর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; প্রয়োজনীয় উপাদান পাইলে তিনি তাঁহার একখানি জীবনী লিখিতে প্রস্তুত আছেন বলিলেন, এবং স্বামিজীও ঐ উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতে সানন্দে সম্মত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই আচার্যপ্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। শরৎ মহারাজ বলিয়াছেন: "ঠাকুরের সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার যা প্রকাশ করেচেন তা আমি লিখে দিয়েছিলুম। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল ঠাকুরকে জনসমাজে প্রচার করেন। স্বামিজী নিজে না লিখে আমাকে লিখতে বল্লেন। আমি আপত্তি করলে বলেছিলেন, 'আমি লিখলে বুড়োর মাথায় আমার ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।' আমি যা জানি সব লিখে দিলুম। ভেবেছিলুম স্বামিজী কাটছাঁট করে দেবেন, কিন্তু

তিনি দুইএকটি কথার বদল করে, আর দুইএক জায়গায় ভাষার অত্যুক্তি তুলে দিয়ে গোটা লেখাটাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার স্মরণ হয়, ম্যাক্সমুলারও কিছুমাত্র পরিবর্তন না করেই তা ছেপেছিলেন। ম্যাক্সমুলার বড়ই ভয়ে ভয়ে ঠাকুরের সম্বন্ধে লিখেছিলেন।" [প্র]

জুন মাসের শেষভাগে স্বীয় প্রিয়শিষ্য সাঙ্কেতিক লেখক মিঃ গুডউইনকে সঙ্গে দিয়া স্বামিজী শরৎ মহারাজকে আমেরিকায় প্রেরণ করিলেন। নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি পরমাদরে ও সসম্মানে স্বামী সারদানন্দকে আচার্যপদে বরণ করিয়া লইল।

শরৎ মহারাজ বলিয়াছেনঃ আমেরিকা যাবার আগে আমি বলেছিলুম, 'বক্তৃতা কিছুতেই দিতে পারব না।' স্বামিজী বল্লে, 'আরে, বক্তৃতা তো আমিই দিয়ে এসেচি, তুই আর সেখানে কি বলবি? একটু গীতা, বেদান্ত পড়াবি, দুইএকটা প্রশ্নের জবাব দিবি—এই আর কি।' আমি ভাবলুম, এ পর্যন্ত চলতে পারে। ওমা, আমেরিকায় যে রাত্রে পৌঁছুলুম সেই রাত্রেই দেখি আমার বাসায় এক meeting (সভা) হচ্চে। খেয়েদেয়ে সেখানে যেতেই সভাপতি বল্লেন, 'স্বামী সারদানন্দকে আমরা প্রতি মুহূর্তেই এখানে পাব আশা করছিলুম। তিনি এসে পৌঁছেচেন। অমুক দিন তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন।' আমি তো অবাক। সভাপতিকে বুঝিয়ে বলায় বল্লেন, 'আমি সব ঠিক করে দেব।' ভাবলুম বোধ হয় বক্তৃতা দিতে হবেনা। তবুও কি হয় মনে করে, আর স্বামিজীর নামে কলঙ্ক না পড়ে এ অবশ্যই দেখতে হবে ভেবে, points (মূলকথাগুলি) ঠিক করে নিলুম। কিন্তু তা হলে কি হয়, platform fright (বক্তৃতাকালীন ভয়ের ভাব) তো আর যায় না। সভাপতি প্রথমেই আমার পরিচয় দিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আমি ভাবলুম বেঁচে গেছি। ওমা, তারপরেই তিনি বলচেন, 'স্বামিজী অনেক লোকের সামনে বড় হলে কোনদিন বক্তৃতা

১৮৯৬-৯৭]

করেন নি, তোমরা সকলে একটু নিকটে সরে এস। দূরে থাকলে ওর voice (গলা) পৌঁছুতে না পারে।' যা হোক, দাঁড়িয়ে আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার বক্তৃতা করলুম। দূরে দেখি গুডউইন হাসচে। মনে হল বক্তৃতা ভাল হচ্চে না, তাই ও হাসচে। এতে আরো ঘাবড়ে গেলুম। আমি ভাষার দিকে লক্ষ্য না করে যাতে ভাবগুলি লোকে বুঝতে পারে তারই চেষ্টা করলুম। হয়তো সকল কথা ঠিকমত প্রকাশ করতে পারি নি মনে করে, প্রশ্ন করতে বলায়, দুইঘণ্টা ধরে সকলে abstruse metaphysics (জটিল দার্শনিক তত্ত্ব) থেকে আরম্ভ করে, 'তোমরা কেন কুমীরের পেটে ছেলে দাও?'—ইত্যাকার সব প্রশ্ন করতে লাগল। উত্তর শুনে সকলেই খুসী। গুডউইন কেন হাসছিল জিজ্ঞাসা করায় বল্লে, 'বক্তৃতা খুব ভাল হচ্ছিল, এজন্যে হাসছিলুম।' [প্র]

পুর্ণ দেড়বৎসর কাল আমেরিকায় থাকিয়া স্বামী সারদানন্দ ঐ দেশের নানাস্থানে বৈদান্তিক ধর্মের সার্বজনীন উদার মতবাদসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। সেই প্রচারবিবরণীর সামান্যই সংরক্ষিত হইয়াছে।[১]

ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট অধিকার, বাণীদোষবর্জিত উচ্চারণ, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, সর্বোপরি উপলব্ধিজনিত জ্ঞান সহায়ে বক্তব্য বিষয় শ্রোতাদের

---

১ আমেরিকায় প্রদত্ত স্বামী সারদানন্দের একটিমাত্র ভাষণ সংক্ষিপ্তাকারে পাওয়া গিয়াছিল। উহা 'The Vedanta: Its Theory and Practice' নামে পুস্তিকাকারে ১৯২০ অব্দে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। পরে উহাই 'Vedanta and the West' পত্রিকায় (১৯৫২—জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী সংখ্যা) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

নিউইয়র্ক ব্যতীত যেসকল স্থানে তিনি বক্তৃতা দিয়া বেড়াইয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নোক্ত স্থানগুলির নাম জানা গিয়াছে: গ্রীনএকার, ব্রুকলিন, বষ্টন, কেম্ব্রিজ মাস, মণ্টক্লেয়ার। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে স্বামিজীর শিষ্যা মিস্ এলেন ওয়ালডো (সিষ্টার হরিদাসী) নিউইয়র্কে বেদান্ত সমিতির কার্য পরিচালনা করিতেন এবং পরে স্বামী অভেদানন্দ আসিয়া সেই কার্যভার গ্রহণ করেন।

হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবার ক্ষমতা—এইসকল গুণে অল্পদিনেই তিনি জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা কিরূপ হৃদয়গ্রাহী হইত সেই সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মণ্টক্লেয়ারের শ্রোতৃবর্গ বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন তাঁহারই ধারা অবলম্বন করিয়া অতঃপর স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করেন। ঐ স্থানেই মনঃসংযোগ বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অভেদানন্দজী মন্তব্য করিয়াছেন : 'স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতার বিষয়ের উপর অদ্ভুত দখল ছিল এবং তাঁহার বলিবার ভঙ্গীও অতি চমৎকার।'

আমেরিকায় শরৎ মহারাজের প্রচারকার্য কেমন হইতেছে এই বিষয়ে স্বামী যোগানন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন, 'শরৎ যা করে, মূল ধরে করে। শরতের কাজ গভীর।[২]

বিদুষী মহিলা মিসেস্ ওলি বুল, যাঁহার আতিথ্যে স্বামী সারদানন্দ আমেরিকায় অনেকদিন বাস করিয়াছেন, বলিতেন, 'স্বামিজীর প্রভা মার্তণ্ড-সম, কিন্তু সারদানন্দ চন্দ্রমা-সম স্নিগ্ধ।'

* * *

আমেরিকায় স্বামী সারদানন্দ একদা মিস্ ম্যাকলাউড়ের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। মিস্ ম্যাকলাউড স্বামিজীর ভক্ত ও বন্ধু। প্রতি প্রভাতে অতিথির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তিনি প্রশ্ন করিতেন, 'সুনিদ্রা হয়েচে তো?' বন্ধুমহলে তাঁহার আদরের ডাক-নাম ছিল 'টান্টিন'। একদিন বক্তৃতাকালে সারদানন্দ লক্ষ্য করিলেন যে, শ্রোতাদের মধ্যে বসিয়া টান্টিন অকাতরে ঘুমাইতেছে। দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হইয়া যাওয়ার পর যখন অনেকেই বক্তার সমীপবর্তী হইয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও করমর্দন করিতে লাগিল তখন নিদ্রাভঙ্গে টান্টিনও আসিয়া উপস্থিত। সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় গম্ভীরভাবে

২ শ্রীকুমুদবন্ধু সেন বলরাম-ভবনে স্বামিজীকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়াছিলেন।

শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'সুনিদ্রা হয়েচে তো?' একথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল।

মণ্টক্লেয়ারে এক ভক্তিমতী মহিলা (মিসেস্ হুইলার) বাস করিতেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, এক প্রেমকরুণ মূর্তি স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। সেই অবধি অসুখ বিসুখ হইলেই তিনি দেখিতে পাইতেন, শিয়রে থাকিয়া ঐ মূর্তি পিতার মত পরম স্নেহে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি কোনও হিন্দু মহাপুরুষ হইবেন বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল। তাঁহার আরও মনে হইয়াছিল যে, এই দর্শনের নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, এবং একদিন না একদিন স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষকে তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবেন। সেই অবধি কোন হিন্দু নিউইয়র্কে আসিয়াছেন শুনিলেই তিনি তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন; কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের সন্ধান না পাইয়া দিনদিন তাঁহার নৈরাশ্য বাড়িতে থাকে।

স্বামী সারদানন্দ নিউইয়র্কে আসিলে মহিলাটি তাঁহাকে দেখিতে যান ও তাঁহার পবিত্র স্বভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। স্বীয় বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিবার মানসে আমন্ত্রণ করিয়া তিনি তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া আসেন। একদিন তথায় সমুৎসুক জনমণ্ডলীকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতে বলিতে সারদানন্দ পরমহংসদেবের ফটো প্রদর্শন করিলেন। চিত্রে সেই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি দেখিয়া মহিলাটি চকিত হইয়া উঠিলেন। সেইদিন হইতে তিনি ঠাকুরের একজন বিশিষ্ট ভক্ত এবং তাঁহার শিষ্যসন্তানগণের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

নিউইয়র্কবাসিনী এক মহিলা স্বামী সারদানন্দের নিকট আসিয়া বলেন যে, অস্বাভাবিক ঘটনায় কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। রাত্রিকালে তাঁহার শয়নকক্ষের আসবাবপত্র ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়; একএক রাত্রে বদ্ধ জানলাগুলি সহসা খুলিয়া যায়;

সময় সময় মনে হয় কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে ; একদিন গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন, মনে হইল কেহ তাঁহাকে মেজে হইতে কয়েক ইঞ্চি উর্ধ্বে শূন্যে তুলিয়া ধরিল ; অথচ কখনও কোন মূর্তি বা আকৃতি তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। মহিলার বিবৃতি শুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তার পর শরৎ মহারাজ কহিলেন যে ঐসকল ঘটনা তাঁহার মানসিক বিকারের পরিণতি মাত্র ; মনকে দৃঢ়ভাবে ভাবান্তরিত করিতে পারিলে তিনি আর উৎপীড়িত হইবেন না। মহারাজের উপদেশানুসারে মহিলাটি নিজেকে দৃঢ়ভাবে সংযত করিলে উপদ্রবগুলিও তিরোহিত হইয়া গেল।

* * *

প্রায় চারি বৎসরকাল আমেরিকা ও য়ুরোপে ধর্মপ্রচার করিয়া, পাশ্চাত্য শিষ্যশিষ্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া, স্বামিজী সগৌরবে দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারীর শেষাংশে কলিকাতায় পৌছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আগ্রহে, ঐ বৎসর ১লা মে তারিখে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। মিশনের উদ্দেশ্য—ঠাকুরের সমন্বয়ভাবমূলক ধর্মের প্রচার, জনহিতকর কর্মের অনুষ্ঠান, আর্তের সেবা। মিশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী ধর্মপ্রচারকরূপে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে মাদ্রাজে ও স্বামী শিবানন্দকে সিলোনে প্রেরণ করিলেন। মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুর জেলায় তখন দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি দেখা দিয়াছে ; রিলিফ কার্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, স্বামী ত্রিগুণাতীত দিনাজপুরে প্রেরিত হইলেন।

মিশনের যাবতীয় কার্যকে রূপদান করিতে হইলে কর্মী সন্ন্যাসিসঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে, সন্ন্যাসিসঙ্ঘ গড়িতে হইলে মঠ করা আবশ্যক। মঠ করিবার জন্য গঙ্গার পশ্চিমতীরে বেলুড় গ্রামে জমি নির্বাচিত

হইল। জন্মভূমিতে করণীয় কার্যসমূহ দ্রুত সম্পূর্ণ করিবার জন্য স্বামিজী যেন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভারতীয় কার্যাবলীর কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া সুপরিচালনার জন্য তিনি এখন স্বামী সারদানন্দের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করিলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট আমেরিকায় মিসেস্ বুলকে স্বামিজী লিখিয়াছেন: 'যদি সারদানন্দ আসিতে চায় তো চলিয়া আসুক। আমার স্বাস্থ্য এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সুতরাং সে আসিলে সমুদয় কাজ গুছাইতে বিশেষ সাহায্য হইবে সন্দেহ নাই।'

সারদানন্দ তখন আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত। আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিক চরিত্রবলে তিনি লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিয়াছেন, স্নিগ্ধ স্বভাবের গুণে অনেকের ভালবাসাও প্রাপ্ত হইয়াছেন।[৩] এইরূপ অবস্থায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য স্বামিজীর ইচ্ছা-লিপি পাইয়াও তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলেন না; যন্ত্রবৎ আদেশ পালন করিয়া কার্য করিতেই তিনি বিদেশে গিয়াছিলেন, পুনরায় যন্ত্রবৎ আদেশ পালন করিয়া কার্য করিবার জন্য স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্ক বন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী আমেরিকা ত্যাগ করিয়া য়ুরোপের পথে ৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কতিপয় গুরুভ্রাতা ও ভক্তকে সঙ্গে লইয়া স্বামিজী হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।[৪]

---

৩ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর কাশ্মীর হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামিজী লিখিয়াছেন: 'মিসেস্ বুল [বেলুড় মঠ নির্মাণে] বেশী টাকা দিয়েছেন। শরতের উপর তাঁর একান্ত বিশ্বাস। শরতের পরামর্শ নিয়ে সকল মঠের কাজ করো।'

৪ শ্রীকুমুদবন্ধু সেন হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ভক্তগণের অন্যতম।

স্বামী সারদানন্দ সময় সময় সংক্ষিপ্ত দিনলিপি রাখিতেন। উহা হইতে জানা যায়ঃ আট রাত্রি টিউটনিক জাহাজে কাটাইয়া ২০শে জানুয়ারী তিনি লিভারপুলে অবতরণ করেন এবং সেইদিনই লণ্ডনে যাইয়া মিসেস্ ষ্টার্ডি ও গল্স্ওয়ার্দি পরিবারের সঙ্গে মিলিত হন। পর দিন সন্ধ্যায় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীতে পৌছেন। নগরীর দৃশ্য তাঁহার কাছে এক বিশাল স্বপ্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়—যেন একটি গহন অরণ্য, যেখানে মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হইতে পারে। (A wilderness, where men are very apt to lose their head. Seems all like a big dream.) প্যারীর রঙ্গমঞ্চে তিনি অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন, ফরাসী জীবনে চারুকলার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং ফরাসীদের উত্তেজনাময় প্রকৃতিও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ২৩শে জানুয়ারী রাত্রে প্যারী ছাড়িয়া ২৫শে প্রত্যুষে ইটালীর রাজধানী রোমে উপনীত হন। এখানে প্রথমেই সেণ্ট পিটার গির্জা দেখিতে যান এবং জানিকিউলাম পর্বত হইতে দৃশ্য দেখেন। রোমের রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শিনোরা এলিনোরা ডুসির অভিনয় দেখিয়াছিলেন এবং বিখ্যাত চিত্রকর মাইকেল এঞ্জেলোর শ্রেষ্ঠ চিত্রসমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ২৬শে সকালে তিনি ভ্যাটিকান গ্রন্থাগার ও ভ্যাটিকানস্থ ভাস্কর-নির্মিত মূর্তিসমূহের গ্যালারী দেখিতে যান এবং গ্যালারী পরিদর্শন কালে শেষবারের মত সেণ্ট পিটারের প্রতিমূর্তি দেখিয়া লন। (St. Peter for the last time—ছোট এই কথাটুকু পড়িতেই মনে হয়, যেন সেণ্ট পিটারের মূর্তি দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার আশা মিটিতেছিল না!) ২৭শে রোম ছাড়িয়া ঐদিন সন্ধ্যায় নেপল্সে পৌছেন এবং পরদিন তথা হইতে যাইয়া ভিসুভিয়াস্ আগ্নেয়-গিরি দেখিয়া আসেন। ২৯শে সকালে নেপল্স্ ছাড়িয়া, ইতালীর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে, সন্ধ্যায় ব্রিন্দিসি বন্দরে

উপনীত হন এবং ৩০শে জানুয়ারী রাত্রে পেনিনসুলার জাহাজে ব্রিন্দিসি পরিত্যাগ করেন। জাহাজে থাকিতে তিনি এস্ (সান্যাল ?) এর জন্য প্রার্থনাসমূহ নকল করিয়াছিলেন এবং আয়োনিয়ান দ্বীপপুঞ্জের চিত্তহারী দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।[৫]

---

৫ 'স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা' গ্রন্থে আছে যে, ভারতে আসিবার জন্য মিসেস্ ওলি বুল ও মিস্ ম্যাকলাউড আমেরিকা হইতে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সারদানন্দ-দিনলিপিতে সেকথা উল্লিখিত নাই কেন, বুঝিতে পারা গেল না। তবে এই দুই ভদ্রমহিলা যে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, সিষ্টার নিবেদিতার লেখা হইতে ইহা অনুমিত হয়।

৯

ভারতে সংগঠনের কাজে

আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই স্বামী সারদানন্দ মঠ ও মিশনের কাজে কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী স্বামিজী মঠ হইতে মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিয়াছেন: 'শরৎ আসিয়াছে এবং তাহার অভ্যাস মত কঠোর পরিশ্রম করিতেছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ইহার পূর্বেই (৩রা ফেব্রুয়ারী) আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানবাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই বৎসর ২২শে ফেব্রুয়ারী ঠাকুরের জন্মতিথিপুজা মঠে, এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ মহোৎসব দাঁ-দের ঠাকুরবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। তিথিপুজার দিন গুরুভ্রাতারা মহাদেবের বেশভূষায় স্বামিজীকে সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং স্বামিজীও তাঁহাদের অঙ্গে ভস্ম মাখাইয়া দিয়াছিলেন। বিভূতিভূষিতাঙ্গ সারদানন্দ তানপুরা-হস্তে গাহিতেছেন ও স্বামিজী পাখোয়াজ ধরিয়াছেন, এ দৃশ্য সেদিন অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন'—এই সুপ্রসিদ্ধ গানটি ভোগারতির সময়ে সেইদিন্‌ই প্রথম গীত হয় এবং স্বামিজী ও অন্যান্য সকলে গানের তালে তালে নৃত্য করেন।

মহোৎসবের হাটবাজারের ভার বুড়োবাবার উপর ন্যস্ত ছিল। প্রায় তিনবৎসর পূর্বে পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া তিনি মঠে যোগদান করিয়াছিলেন।

মহোৎসবের পরে স্বামিজীর উপস্থিতিতে, স্বামী সারদানন্দ একদিন কলিকাতার জনসভায় বক্তৃতা করেন। শশী মহারাজকে স্বামিজী

লিখিয়াছেন: 'কলিকাতায় জনসাধারণের জন্য আমাদের দুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল—একটি মিস্ নোবলের, অপরটি আমাদের শরতের। তাঁহারা দুইজনেই খুব চমৎকার বলিয়াছিল। শ্রোতাদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা গিয়াছিল।'

মিসেস্ বুল ও মিস্ ম্যাকলাউডকে সঙ্গে লইয়া শরৎ মহারাজ একদিন স্বীয় গর্ভধারিণীকে দর্শন করিতে যান। তাঁহার রন্ধননিপুণ সহোদরাগণ বিদেশী অতিথিদ্বয়ের জন্য উত্তম উত্তম দেশীয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরমতৃপ্তির সহিত ঐসকল বস্তু তাঁহারা উপভোগ করেন এবং সরলস্বভাব শরচ্চন্দ্র-জননীর মধুর ব্যবহারে সমধিক আপ্যায়িত হন।

স্থপতিবিদ্যাকুশল স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে নূতন মঠবাড়ীর নির্মাণকার্য আরম্ভ করিয়া দিয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য স্বামিজী ৩০শে মার্চ দার্জিলিং শৈলে চলিয়া গেলেন। ইহার অনতিকাল পরেই কলিকাতায় মহামারীরূপে প্লেগ দেখা দিল, এবং বিশাল নগরী দেখিতে দেখিতে জনশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। তারে সেই সংবাদ পাইবামাত্র স্বামিজী ত্বরা মে নামিয়া আসিলেন এবং স্বামী সারদানন্দকে রিলিফ কার্যের যাবতীয় বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। প্লেগরোগে সতর্কতা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জনসাধারণকে উপদেশ দিয়া বাঙ্গলা ও হিন্দী ভাষায় প্রচারপত্র মুদ্রিত ও বিতরিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লেগ হাসপাতাল খুলিবার ব্যবস্থাও হইয়া গেল। সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য শরৎ মহারাজ তাঁহার সহোদরগণকেও আহ্বান করিলেন এবং সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহারাও স্থানত্যাগের পূর্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। সেই মহাসঙ্কটের দিনে অভয় ও সেবা লইয়া স্বামী সদানন্দ-প্রমুখ মঠের সাধুরা ও নবাগতা বিদেশিনী মহিলা 'নিবেদিতা' যেভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাতে

নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মের সঞ্জীবনী শক্তি সহজেই লোকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল এবং পারিয়াছিল বলিয়াই প্রয়োজনীয় ও প্রচুর অর্থসাহায্য করিতে ইতস্ততঃ করে নাই।

প্লেগের প্রকোপ কিছুটা কমিয়াছে এবং সেবাকার্যও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলিতেছে ও চলিবে বুঝিতে পারিয়া স্বামিজী আলমোড়ায় চলিয়া যান ও তথা হইতে পরে কাশ্মীরে গমন করেন। ইতোমধ্যে শরৎ মহারাজের পিতার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে; বুড়োবাবার তত্ত্বাবধানে মাতাপিতাকে তিনি ৺কাশীধামে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার জননী যাত্রার পুর্বে বাগবাজারে আসিয়া মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া গেলেন।

আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে এলবার্ট হলে রামকৃষ্ণ মিশন সভায় স্বামী সারদানন্দ ধারাবাহিকভাবে ছয়টি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় উহাদের সারাংশ সংরক্ষিত হইয়া পরে প্রবন্ধাকারে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্লেগ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে এবং মঠ ও মিশনের গঠন ও প্রচারমূলক কার্য নিয়মিতভাবে চলিয়াছে, এমন অবস্থায় শরৎ মহারাজ হঠাৎ এক জরুরী তার পাইয়া জানিতে পারিলেন যে, স্বামিজী কাশ্মীরে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তখন অক্টোবর মাস, মাত্র কিয়দ্দিন পুর্বে স্বামিজী ৺অমরনাথ ও ৺ক্ষীরভবানী দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। সংবাদ পাইবামাত্র সমুদয় হাতের কাজ ফেলিয়া তিনি কাশ্মীর যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে শ্রীনগরে পৌছিয়া স্বামিজীর শুশ্রূষায় নিরত হইলেন। স্বামিজীর শরীর কথঞ্চিৎ সুস্থ ও পথক্লেশসহনক্ষম হইয়াছে বুঝিয়া তিনি সদলে তাঁহাকে লইয়া জলপথে বারমুলায় আসিলেন। বারমুলা হইতে স্বামিজীর শিষ্য সদানন্দকে তার করা হইল, তিনি যেন অবিলম্বে লাহোরে আসিয়া তাঁহার সেবাভার গ্রহণ করেন। তাহাই

হইল। সদানন্দের তত্ত্বাবধানে স্বামিজীকে মঠে রওনা করিয়া দিয়া, শরৎ মহারাজ পাশ্চাত্য মহিলাভক্তদের লইয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দেখাইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

কলিকাতা হইতে শ্রীনগর যাইবার পথে দুই স্থানের দুইটি ঘটনায় শরৎ মহারাজকে অল্পাধিক অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। কলিকাতায় প্লেগের সূত্রপাত হইতেই রেল কোম্পানি বক্সারের নিকট চৌসা ষ্টেশনে সেগ্রিগেশন ক্যাম্প বসাইয়াছিলেন; প্লেগাক্রান্ত বলিয়া সন্দেহ হইলেই যাত্রী আটক করিয়া শিবিরে পাঠাইয়া দিতেন। শরৎ মহারাজকেও ঐরূপে শিবিরে পাঠাইবার প্রস্তাব করা হইলে তিনি বলিলেন, 'বেশ, আপত্তি নাই। কিন্তু দীর্ঘ প্রবাসের পর আমি আমেরিকা থেকে সম্প্রতি ভারতে এসেচি; ওদেশের লোকের মত আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।' সমস্যায় পড়িয়া পরীক্ষক ডাক্তার পরের গাড়ীতেই তাঁহাকে রওনা করিয়া দিলেন।

অপর ঘটনাটির স্থান কাশ্মীর; রাওলপিণ্ডি হইতে টঙ্গাগাড়ী করিয়া শ্রীনগর যাইবার কালে উহা সংঘটিত হয়। কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন: "কখন কখন ভগবচ্চিন্তা মনে না এসেও নিশ্চিত মৃত্যুর পূর্বে মানুষ খুব নিশ্চিন্ত থাকে এমনও দেখা যায়। আমার জীবনে এরূপ ঘটনা কয়েকটি আছে।

"স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে শ্রীনগর যাচ্চি। গাড়ী খুব জোরে ছুটেচে—গাড়োয়ান উন্মত্ত। সে আপনা আপনি বলচে, 'আজ যদি আল্লা বাঁচায় তবে দেখব।' এখন, গাড়ী মোড় ঘুরবার সময় অন্য গাড়ী এসে পড়ায় এ গাড়ীর চাকা রাস্তা থেকে নীচে পড়ে গেল। একটা বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে গাড়ী নীচে নাবতে আরম্ভ করল। বহুনীচে নাবতে হবে—ধ্রুব মৃত্যু। এমন সময় দেখচি, অনেকটা দূরে একটি গাছ। মনে করলুম, গাড়ী যখন গাছের নিকট দিয়ে যাবে তখন ঐ

গাছ ধরে লাফ দেব। মনে কিছুমাত্র উদ্বেগ নাই। অল্পসময়ের মধ্যেই গাড়ী আড়াআড়িভাবে গাছে লেগে থেমে গেল। আমি পুর্ব সিদ্ধান্ত মত লাফিয়ে পড়লুম। কাঁটাগাছের সামান্য আঘাত পায়ে লেগেছিল। ঘোড়াটা পড়ে শীঘ্রই মারা গেল। জিনিষপত্রগুলি কোনটি আধমাইল, কোনটি একমাইল দুরে ছড়িয়ে পড়ল। আমি লাফ না দিলেই ভাল হত। নিজের বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে পায়ে কিছু আঘাত পেলুম মাত্র।" [প্র]

'কয়েকটি ঘটনা'র অপর দুইটিও এখানে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। শরৎ মহারাজ বলিয়া যাইতেছেনঃ "আমেরিকায় বাইসিকেলে ঢালুপথে নাবতে হচ্চে—তখনও ভাল অভ্যাস হয় নি। সমতলভূমির উপরেই চলছিলুম, হঠাৎ অসাবধান হয়ে ঢালুতে এসে পড়েচি। গাড়ী খুব বেগে নীচে নাবচে; সদর রাস্তায় পৌছামাত্র গাড়ী উল্টে যাবে, কিম্বা চলন্ত গাড়ীঘোড়ার তলায় পড়ে নিষ্পিষ্ট হতে হবে। কিন্তু আমার কিছুমাত্র ভয় বা উদ্বেগ হল না। হ্যাণ্ডেল খুব সহজে ধরে রেখেচি, মোটেই চাপ দিই নি। এরূপ শিক্ষা পেয়েছিলুম মনে তখন তখন উঠল। তারপর পা বিস্তার করে চাকার উপরকার রডের উপর উঠিয়ে দিলুম। তারপর সমতল জায়গায় পৌছুনো গেল —কোন বিপদ হয় নি।

"কাঞ্জিলালের[১] সঙ্গে নৌকায় মঠে যাচ্চি—মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) একটা ফোড়া অস্ত্র করতে হবে। আমি তামাক খাচ্চি এমন সময় মহাঝড় উঠল। নৌকা ডুবুডুবু। আমার কোনই উদ্বেগ হচ্চে না, বেশ নিশ্চিন্তমনে তামাক খাচ্চিলুম। কাঞ্জিলাল আমার এরকম নিরুদ্বেগ ভাব দেখে মহাক্রোধে ছিলিমটা গঙ্গার জলে ফেলে দিলে। যা হোক তখন পালটা নামিয়ে দিতে বল্লুম। পাল নামাতেই

১ ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল—মাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য।

অনেকটা নিরাপদ বোধ হল, ঝড়ও ক্রমশঃ থেমে গেল।” [প্র] নিজের কথা বলিবার সময় শরৎ মহারাজ কতকটা রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতেন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল ছিলিমটা ফেলিয়া দিতেই হুঁকো দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, ‘এটাও ফেলে দেবে নাকি?’

পাশ্চাত্য মহিলাদিগকে লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সারদানন্দ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথা হইতে ২৩শে অক্টোবর প্রমদাদাসবাবুকে একখানি পত্র লেখেন। পত্রের কিয়দংশ এইরূপ: “স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা একজন ব্রহ্মচারিণী সম্প্রতি ৺কাশীধাম দর্শনে যাইতেছেন। ইনি ইংলণ্ড হইতে কয়েকমাস হইল আসিয়াছেন। বিবেকানন্দজী ইঁহাকে শ্রীমতী নিবেদিতা নাম প্রদান করিয়াছেন। ...ইনি ৺বিশ্বনাথের আরাত্রিক দেখিবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আমাকে কাশীধামস্থ কোন বন্ধুকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে লিখিতে অনুরোধ করিতেছেন।...তজ্জন্য আপনাকে লিখিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি আপনি শ্রীমতী নিবেদিতাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।...ইনি সম্প্রতি দুর্গমতীর্থ ৺অমরনাথ (কাশ্মীর) দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

“আমিও ২০।২৫ দিনের মধ্যেই ৺কাশীধামে দিন কয়েকের জন্য যাইব। তখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। শ্রীমান বিবেকানন্দ এখন কলিকাতায় আছেন। শরীর মধ্যে বড় খারাপ হইয়াছিল, সম্প্রতি অনেক ভাল আছেন।”

কাশী হইয়া ৺শ্যামাপুজার পুর্বেই সারদানন্দ মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঐ পুজার দিনে (১৩ই নভেম্বর) শ্রীশ্রীমা বেলুড়ে নবনির্মিত মঠে প্রথম পদার্পণ করেন এবং তথায় সহস্তে পুজার স্থান পরিষ্কার করিয়া স্বয়ং ঠাকুরের পুজাকার্য সম্পন্ন করেন। সিষ্টার নিবেদিতা ঐদিন অপরাহ্ণে মাতাঠাকুরাণী, স্বামিজী, রাজা মহারাজ ও শরৎ

মহারাজকে সঙ্গে লইয়া বাগবাজারে চলিয়া আসেনএবং তাঁহাদের উপস্থিতিতে বোসপাড়া লেনে 'নিবেদিতা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯ই ডিসেম্বর নবনির্মিত মঠে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বামিজী গুরুভ্রাতৃগণ সহ গৃহপ্রবেশ করিলেন। গৃহপ্রবেশের পরেও পরবর্তী মাসের অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের পয়লা তারিখ পর্যন্ত সাধুদের অনেকেই বাগানবাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

নূতন বৎসরের সূচনাতেই একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করা হয়, এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের সম্পাদনায় 'উদ্বোধন' নামে নবযুগের ভাবধারার বাহক একটি পাক্ষিক পত্র ১৪ই জানুয়ারী (১লা মাঘ) হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে।[২]

গৃহপ্রবেশের কার্য সমাধা করিয়াই, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায়, স্বামিজী দেওঘরে গিয়াছিলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে ধর্মপ্রচার ও অর্থসংগ্রহের জন্য গুজরাট অঞ্চলে পাঠাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। স্বামিজীর প্রতি একান্তভাবে অনুরক্ত এই দুই গুরুভ্রাতা তাঁহার আদেশ কখনো অমান্য করিতেন না; তাঁহারা প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

অতঃপর স্বামী সারদানন্দের দিনলিপির সাহায্যে আমরা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া যাইব। সর্বত্র অনুসরণের প্রয়োজন হইবে না।

৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া তিনি ও হরি মহারাজ পাঞ্জাব মেলে যাত্রা করেন, এবং পরদিন সন্ধ্যায় কানপুরে উপনীত হন। এখানে নিম্নশ্রেণীর এক পান্থশালায় রাত্রিটা কষ্টে কাটাইতে হইল। ৯ই সরাই হইতে নৃত্যগোপালবাবুর ভবনে চলিয়া আসেন ও সমস্তদিন কানপুরে থাকিয়া সহর দেখিয়া বেড়ান। কুপার এলেন ট্যানারী হইতে শরৎ মহারাজ নিজের ও হরি মহারাজের জন্য

২ পাক্ষিক উদ্বোধন দশমবর্ষে মাসিকে রূপান্তরিত হয়।

ছয়টাকা মূল্যে দুইজোড়া চটিজুতা ক্রয় করিয়াছিলেন। কানপুর হইতে আগ্রা, ও আগ্রা হইতে দ্বিতীয়শ্রেণীর টিকেটে জয়পুর। আগ্রায় বজ্রঝঞ্ঝার মুখে পড়িতে হইয়াছিল।

১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে দিবসদ্বয় জয়পুরে থাকিয়া তাঁহারা ৺গোবিন্দজীউ, ৺গোপীনাথজীউ ও গলতাতীর্থ দর্শন করেন এবং রাজা মানসিংহ কর্তৃক বঙ্গদেশ হইতে আনীত প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী দেবীকে দর্শন করিতে আমেরে' যান। খেতড়ির মহারাজা এই সময় জয়পুরে অবস্থান করিতেছিলেন ; এক সন্ধ্যা তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইলেন এবং আমেদাবাদ পর্যন্ত দুইখানি দ্বিতীয়শ্রেণীর টিকেট কিনিয়া দিলেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী আবু রোড়ে ক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাসে বিশ্রাম করিয়া পরদিন সকালে তাঁহারা আমেদাবাদ উপনীত হন। তথাকার এক টিকেট কালেক্টর হরি মহারাজকে নিমন্ত্রণ করে। ঐদিন অপরাহ্ণ চারিটায় লিমড়িতে পৌঁছিয়া রাজার দেওয়ান ও প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত লিমড়িতেই রাজ-অতিথিরূপে রহিলেন। ১৬ই সমস্তদিন ধরিয়া শরৎ মহারাজ 'দি প্রবলেম য়ুনিভার্সাল' বা বিশ্বজনীন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা সংশোধন করেন। ২০শে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। রাজা চৌকষ লোক ; তিনি সরল ও সহৃদয় ব্যবহার করিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে পরিচয়পত্র দিতে সম্মত হইলেন। দেওয়ানের প্রস্তাবক্রমে জনসভার আয়োজন হইয়াছিল, রাজাও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু লোক বেশী হয় নাই। ২৬শে তারিখে লাইব্রেরীয়ান ত্রুলীরাও আসিয়া বলিলেন যে বিকালে চারিটার সময় সভা বসিবে। সেই সভায় স্বামী সারদানন্দ এই প্রথম্ হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। অনেকদিন এখানে থাকিলেও রাজা বা জনসাধারণের অভিমত বুঝিতে

না পারিয়া তিনি একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। ১লা মার্চ দেওয়ান আসিয়া জানাইলেন যে, স্বামিজীর অভিপ্রেত কার্যে রাজা হাজার টাকা দান করিবেন।

৫ই মার্চ জুনাগড়ে আসিয়াই তিনি দেওয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন ; এবং দেওয়ান পরদিন তাঁহাকে বিভিন্ন স্থানে পরিচয়পত্র ও দুইশত টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এইরূপে ঐ অঞ্চলের ছোটবড় কতিপয় রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া যখন তিনি মোর্ভি রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় নিবেদিতার লিখিত পত্রে জানিতে পারেন যে তাঁহাদের প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী যোগানন্দ ২৮শে মার্চ দেহরক্ষা করিয়াছেন। ঐদিন (৬ই এপ্রিল) রাত্রেই তাঁহাকে মোর্ভির টাউন হলে হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইল। ১৪ই এপ্রিল ভবনগর রাজ্যের উচ্চ বিদ্যালয়ে 'বেদের সারতত্ত্ব' সম্বন্ধে তিনি একটি রক্তৃতা দেন ও সেই বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়।[৩] মঠে ফিরিয়া যাইবার জন্য ১৭ই এপ্রিল স্বামিজীর তার পাইয়া পরদিনই প্রত্যাবর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ৩রা মে সকালে কলিকাতায় পৌঁছিয়া মাতাঠাকুরাণীর চরণ বন্দনা করিলেন। বিকালবেলা মঠে যাইয়া দেখিলেন, আমেরিকা যাত্রা করিবার জন্য স্বামিজী উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন।

আড়াইমাস কালব্যাপী পরিভ্রমণে স্বামী তুরীয়ানন্দ কোথাও কোন বক্তৃতা দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

---

৩ এই বক্তৃতা সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় ভবনগরনিবাসী জনৈক ব্যক্তির নিম্নোক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয় : "The Swami Saradananda's lecture on 'The Essence of Vedas' made a deep impression upon all the people of Bhavnagar, Kathiawar....His noble figure, his majestic voice, the fire and grandeur of his eloquence gave him a power to inculcate into the minds of his audience the Vedanta doctrine far better than any other teacher of Vedantism I have Known."

২০শে জুন মাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া স্বামিজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও সিষ্টার নিবেদিতা বিলাত যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে শরৎ মহারাজের দ্বিতীয়ানুজ সতীশচন্দ্র ডাক্তারী শিক্ষার জন্য বষ্টন গমন করেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মাদ্রাজ গমনের পর হইতে ঠাকুরসেবার দায়িত্ব প্রধানতঃ স্বামী প্রেমানন্দের উপর ন্যস্ত ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ মঠে থাকিলে সাধুব্রহ্মচারীদের শাস্ত্রাধ্যাপনার কার্য করিতেন। স্বামী সারদানন্দ প্রধানতঃ মিশনের প্রচারমূলক ও জনহিতকর কার্যসমূহ পরিচালনা করিতেন, এবং সমবেতভাবে ঠাকুরের সকল ত্যাগী পার্ষদগণই নবাগত ব্রহ্মচারীদের জীবনগঠনের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন ও নিজেদের দৃষ্টান্তে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেন। গভীর আধ্যাত্মিকতার বিগ্রহরূপে স্বামী ব্রহ্মানন্দ[৪] ত্যাগী বা গৃহস্থ সকলেরই প্রেরণার উৎসস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেন। স্বভাবতঃ বালকভাবাপন্ন হইলেও বেলুড় মঠের প্রাথমিক নির্মাণকার্যে তাঁহার অবদান কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে।

দ্বিতীয়বার বিদেশ গমনের প্রাক্কালে স্বামিজী শরৎ মহারাজকে মঠের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া যান। মিশনের যাবতীয় কার্যাবলী ব্যতীত নবাগত সাধুব্রহ্মচারীদের চরিত্রগঠনের ও ভবিষ্য প্রচারকরূপে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপরেই আসিয়া পড়ে। স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগ হইলে শ্রীশ্রীমাকে দেখা-শোনা করিবার সৌভাগ্য উত্তরাধিকারসূত্রে তিনিই লাভ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে স্বামী ত্রিগুণাতীত, কৃষ্ণলাল মহারাজ ও বুড়োবাবা মধ্যে মাত্র চারিপাঁচ মাসকাল এই দেখাশোনার

---

৪ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামিজী 'রাজা' বলিতেন। তিনি রাজা মহারাজ বা শুধু 'মহারাজ' নামেও অভিহিত হইতেন।

কাজটি করিয়াছিলেন। বুড়োবাবা ও কৃষ্ণলাল মহারাজ পূর্ব হইতেই যোগীন মহারাজের সহকারীরূপে ফাইফরমাস খাটিতেন।

মাতাঠাকুরাণীর কনিষ্ঠভ্রাতা অভয়চরণ (মতান্তরে অভয়াপ্রসাদ) কলিকাতায় থাকিয়া ডাক্তারী পড়িতেছিলেন ; কলেরায় আক্রান্ত হইয়া ২রা আগষ্ট তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বামী সারদানন্দ ও প্রকাশানন্দ অভয়ের আপ্রাণ সেবা করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার অব্যবহিত পরেই শ্রীশ্রীমা দেশে চলিয়া যান।

শরৎ মহারাজ এখন শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগে কৃতসংকল্প হইলেন এবং মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহাদের সাধনভজন ও পড়াশোনা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। স্থির হইল, রাত্রি ১১টা হইতে সকাল ৭টা পর্যন্ত ঠাকুরঘরে অখণ্ডিত ধ্যানজপ চালাইতে হইবে। ঐ কাজে পর্যায়ক্রমে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিবেন, তন্মধ্যে তিনিও একজন। গভীর নিশীথে যখন সহজেই লোকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে সেই সময়টা তিনি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন। কাহাকেও বা ব্যবস্থা দিলেন, ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তরুতলে স্বপাক রন্ধন করিবে ও ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইবে। তাঁহার ব্যবস্থামত কার্য চলিতেছে কিনা, কে কতক্ষণ ধ্যানজপ ও পড়াশোনা করে মাঝে মাঝে তাহার সংবাদ লইতেও ভুলিতেন না। একএক দিন উদয়াস্ত জপ বা সপ্তসতী যাগ ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া অপরকেও তদ্বিষয়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। কখনো বা রাত্রে ধুনি জ্বালাইয়া সকলকে লইয়া ধ্যানধারণা করিতে বসিতেন।

মঠে নিয়মিত শাস্ত্রব্যাখ্যা ব্যতীত, বলরাম-ভবনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে তিনি শাস্ত্রপাঠ করিতেন ও ভজন গাহিতেন ; এবং মিশনের বিভিন্ন কাজের আলোচনা করিয়া সেই সব কাজের জন্য অর্থাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেন। কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে—সভাসমিতিতে

বা ভক্তপরিবারে—সপ্তাহে চারিপাঁচ দিনই বক্তৃতা বা ধর্মোপদেশ দান করিতে হইত। মঠ ও মিশন সংক্রান্ত চিঠিপত্রাদি লেখা, আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখা, উদ্বোধন ও ব্রহ্মবাদিনের জন্য বাঙ্গলায় ও ইংরাজীতে প্রবন্ধ রচনা তাঁহার নিয়মিত কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অথচ এত করিয়াও যেন তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না; অন্তর্নিহিত শক্তির সহজ প্রেরণায় একটির পর অন্য একটি কাজ করিয়া যাইতেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানার অন্তর্গত কিষণগড়ে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সংবাদপত্রে অনাহারে মৃত্যুর করুণ কাহিনী পাঠ করিয়া স্বামী সারদানন্দ বিচলিত হইয়া পড়েন এবং রিলিফ কার্যের জন্য অবিলম্বে মঠ হইতে স্বামী নির্মলানন্দ, নিত্যানন্দ, কল্যাণানন্দ ও ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্রনাথকে কিষণগড়ে প্রেরণ করেন। এই কার্যে প্রয়োজনীয় অর্থ তিনি প্রথমতঃ ধার করিয়াছিলেন এবং পরে আবেদন জানাইয়া সহৃদয় দেশবাসীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া নিয়াছিলেন।

তাঁহার শিক্ষাদানকার্য অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ ও সুরুচির পরিচায়ক ছিল। স্বামী প্রকাশানন্দ (সুশীল মহারাজ—শরৎ মহারাজ সস্নেহে 'সুশীনি মহারাজ' বলিতেন) তখন মঠের ভাণ্ডারী, তিনি চোখে কম দেখিতেন। একদিন জিনিষপত্র বাহির করিয়া দেওয়ার পর ভাঁড়ার ঘর পরিষ্কৃত হইলে শরৎ মহারাজ দেখিতে আসিলেন। কয়েক ফোঁটা ঘি টিনের নীচে মেজেতে পড়িয়াছিল, সুশীল মহারাজ দেখিতে পান নাই। শরৎ মহারাজ উহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'সুশীনি মহারাজ, এটা কি?' সুশীল মহারাজ মাথা এপাশ ওপাশ করিয়া, একবার এ চক্ষু আবার অন্যচক্ষু দিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে এটা ঘি।' 'কি করে পড়েচে?' 'আমার হাত থেকে তো পড়ে নি। (খানিক ভাবিয়া) এই লোহার পলাটা দিয়ে capillary attraction (কৈশিক আকর্ষণ) হয়েচে মহারাজ।' '(মৃদু হাসিয়া) Capillary attraction (কৈশিক

আকর্ষণ) কি লোহার পলা দিয়ে হয় সুশীনি মহারাজ?' 'আজ্ঞে না না, পলতে দিয়ে নেকড়া দিয়ে হয়, তা হলে আমারই দোষ।' শরৎ মহারাজ আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পৌরপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তখন মোকদ্দমা চলিতেছিল, পায়খানা পরিষ্কার করিতে মেথর আসে না। ইহার ফলে মহা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। দুপুরবেলা আহারের পর সকলে বিশ্রাম করিতে গেলে দুইজন সাধু (স্বামী বোধানন্দ তন্মধ্যে একজন) মেথরের কর্তব্য সমাধা করিয়া সকলের অস্বস্তির কারণ দূরীভূত করেন। গোপনেই তাঁহারা কাজটি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মঠের পাচক দেখিতে পাইয়া বাবুরাম মহারাজকে বলিয়া দেয়। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, 'যা যা, গঙ্গায় যা। তোরা আর কখনো ঠাকুরের কাজ করিস নি—নোংরা!' 'কি হয়েচে?'—শরৎ মহারাজ উপর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন। 'দেখ না, সব পাইখানা সাফ করে এসেচে'—বাবুরাম মহারাজ উত্তর দিলেন। চা-পানের সময় নীচে আসিয়া শরৎ মহারাজ কহিলেন, 'আজ রাত্রে লুচি আর হালুয়া কোরো সকলের জন্যে, আমি খরচ দেব।' খাওয়ার সময় বলিলেন, 'এদের honourএ (সম্মানে) আজ এই feast (ভোজ) হল।' [প্র]

কলিকাতায় নিজের বক্তৃতাদানের কথায় একদিন শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "একবার গীতা-ক্লাশে বক্তৃতা করতে গিয়েচি—বৃদ্ধ নরেন সেন সভাপতি। বিদেশীর নিকট ধর্মশিক্ষা করতে আমরা দ্বিধা বোধ করি না, একথা ক্ষোভ করে বলেছিলুম। আমাদের সর্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হতে হয়েচে, এতটুকু জিনিষও নিজেদের নাই; এক ধর্ম মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাও যদি বিদেশীর নিকট থেকে নিতে হয় তা হলে কি পরিতাপের বিষয়। এই কথায় নরেন সেন বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেক্রেটারী অমৃতলাল সরকার খুব খুসী হয়েছিলেন। স্বামিজী

বলতেন, ধর্মবিষয়ে ওরা আমাদের চেলা—ওরাই আমাদের পা-পূজা করবে।" [প্র]

*   *   *

আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী সারদানন্দ প্রচারকার্যব্যপদেশে ঢাকা গমন করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি প্রায় নিত্য দেওভোগ গ্রামে যাইয়া ঠাকুরের ভক্তশ্রেষ্ঠ অহিংসা ও দীনতার প্রতিমূর্তি দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়কে দর্শন করিয়া আসিতেন। নাগ মহাশয় তখন অন্তিম শয্যায় শয়ান থাকিয়া মহাসমাধির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। একদিন শরৎ মহারাজের মুখে 'শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দমগনা', 'মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে' ও 'গয়া-গঙ্গা-প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়'—এই তিনটি সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া নাগ মহাশয় সমাধিমগ্ন হন।

ঢাকা হইতে ৪ঠা জানুয়ারী তিনি বরিশালে যান এবং তথায় আট দিন অবস্থান করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের হৃদয়ে প্রকৃত ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতে তৎপর হন। স্বরেন সেন, ব্রজেন নন্দী, যোগেন্দ্র প্রভৃতি স্বামিজীর কতিপয় বালকভক্ত উদ্যোগী হইয়া তাঁহাকে বরিশালে লইয়া গিয়াছিলেন; সরল প্রাণের আন্তরিক আহ্বান তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

অশ্বিনীকুমার দত্ত তখন বরিশালে; স্বামী সারদানন্দের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র তিনি নিজে আসিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং সেখানেই থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। বালক ভক্তেরা ইহাতে বিমর্ষ হইয়া পড়িল। একান্তে মহারাজের সেবা ও সঙ্গলাভ করিবার জন্য পূর্বাহ্ণে অশ্বিনীবাবুকে না জানাইয়া নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যানুযায়ী সকল ব্যবস্থা তাহারা করিয়াছে; এখন সে আশা বুঝি নির্মূল হয়! অধৈর্য হইয়া স্বরেন্দ্রকুমার মহারাজের হস্তধারণ করিয়া 'চলুন চলুন' বলিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। 'কে হে ছোকরা

তুমি?' বলিয়া অশ্বিনীকুমারও তাঁহার অপর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, 'জানিস, এই চেয়ারে বসে স্বামী ত্রিগুণাতীত তিনমাস কাটিয়ে গেচেন, নিত্যানন্দ-স্বামীও কয়মাস এই ঘরে থেকে গেচেন। ইনি আমার কে হন জানিস? আমার ভাই হন; আমার বাড়ীতে থাকবেন না তো কোথায় থাকবেন? এখানেই থাকতে হবে।' এই টানাটানির মাঝে পড়িয়া মহারাজ তো একেবারে অবাক। একদিকে বালক, অপর দিকে দেশবরেণ্য নেতা—সে এক দেখিবার বস্তু। যাহা হউক, টানাটানির মাঝখানে অশ্বিনীকুমার হাসিয়া ফেলিলেন ও মহারাজের হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, 'ভক্তের টান জবর টান। সেই টানে ভগবান বাঁধা। শরৎ মহারাজ তোদের ওখানেই থাকবেন। তুই ছাত্র, তোর কাছে পরাজিত হওয়া—এ তো আমার গৌরব।' অধিকাংশ সময় অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতেই অবস্থান করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়া বালকেরা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল। তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য মহারাজকেও প্রতিদিন অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে যাইতে হইত। তাঁহার বাড়ীর সন্নিকটেই এক নবনির্মিত গৃহে মহারাজের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের নামে হিন্দু জনসাধারণ, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজ তখন বিশেষ গৌরববোধ করিত ও তাঁহার বক্তৃতাবলী পাঠ করিয়া অনুপ্রাণিত হইত। তাঁহারই সহকর্মী গুরুভ্রাতা আমেরিকা-ফেরত সারদানন্দ বরিশালে আসিয়াছেন শুনিবামাত্র দলে দলে লোক তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার উপদেশবাক্য শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিল। বিশ্রামাদির সময় বাদে, সকালবেলা আটটা নয়টা হইতে রাত্রি দশটা এগারটা পর্যন্ত অশ্বিনীকুমারের গৃহে শত শত উৎসুক নরনারীর সহিত মহারাজ ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ক বিবিধ আলোচনা করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে শিক্ষিত লোকেরা ধর্মজীবন বলিতে

তখন নৈতিক জীবনমাত্র বুঝিত, মহারাজের কথায় তাহাদের সেই ধারণা পালটাইয়া গেল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে নৈতিক জীবনের অনেক ঊর্ধ্বে ধর্মজীবন, এবং নীতিমান ব্যক্তি ধার্মিক নাও হইতে পারেন। ছাত্রসমাজকে উপদেশ দিবার কালে তিনি তাহাদিগকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে বলিতেন এবং আধুনিক বিজ্ঞান পড়িতেও উৎসাহিত করিতেন। দিনের পর দিন শক্তিমান সন্ন্যাসীর মুখ হইতে স্বতঃ উৎসারিত জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী শুনিতে শুনিতে শ্রোতারা নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও দেবত্ব সম্বন্ধে যেন সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে সহরময় একটা নূতন ভাবের উদ্দীপনা দেখা দিল।

স্বামী সারদানন্দ ৬ই জানুয়ারী হইতে পরপর তিনদিন ব্রজমোহন কলেজ হলে বক্তৃতা করেন। তিনদিনের বক্ততায় বিষয় ছিল, যথাক্রমে —Catholicity and Hinduism (সর্বজনীন ভাব ও হিন্দুধর্ম), শক্তি ও সংযম, ভক্তি ও জ্ঞান। ঐ তিনদিনই হলে আর তিলধারণের স্থান ছিল না; বারান্দা, প্রাঙ্গণ ও রাস্তার উপর লোকের ভীড় জমিয়াছিল। স্থানাভাবে অনেক মহিলা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। প্রথম দিনে ইংরাজী বক্তৃতার মর্ম অশ্বিনীবাবু বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ৯ই এবং ১০ই তারিখেও সভার আয়োজন হইয়াছিল; ঐ দুই সভায় বক্তৃতার পরিবর্তে মহারাজ সদালাপ ও প্রশ্নোত্তর করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করেন।

সভার প্রারম্ভে বক্তার পরিচয় দান প্রসঙ্গে অশ্বিনীকুমার বলিয়াছিলেন: "স্বামী সারদানন্দজী ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন চিহ্নিত সন্ন্যাসী শিষ্য। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা। পরমহংসদেবের কৃপায় বিশ্ব আলোড়নকারী একজন বিবেকানন্দই যে সৃষ্ট হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার কৃপায় ইঁহারা প্রত্যেকেই এক

এক জন বিবেকানন্দ। একএক জন যেন একএকটি আগ্নেয়গিরি। ইহাদের সত্তাটাই যেন জ্বলিতেছে। যাহারা ইহাদের কাছে আসিয়া পড়িবে তাঁহারাই জীবনে একটা উত্তাপ অনুভব করিবে। ইহাদের প্রভাবে বাঘে ও গরুতে একঘাটে জল খায়। আমি আলমোড়ায় দেখিয়াছি, ভারতবাসীর সহিত ইংরেজ বিবেকানন্দের পদসেবা করিতেছে, জুতা খুলিতেছে। ইহারা ঠাকুরের বিশেষ কার্যের জন্য দেহধারণ করিয়াছেন। যদি স্বামী বিবেকানন্দকে আপনারা দেখিতেন তবেই বুঝিতে পারিতেন স্বামী সারদানন্দ তাঁহারই প্রতিচ্ছবি। ইহারা আজন্ম সন্ন্যাসী, ঠাকুরের উপদেশবর্ণিত হোমাপাখী। ইনি বিবেকানন্দের মত অল্পবয়সেই ইংলণ্ড আমেরিকা গমন করিয়া তপঃশক্তি ও পাণ্ডিত্যপ্রভাবে তত্রত্য বুধমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। আজ আপনারা ইহার বক্তৃতা শুনিয়া ধন্য হউন।"

বক্তৃতা ও আলোচনাদির শেষে বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে যাইয়া বরিশাল বারের প্রসিদ্ধ উকিল, ভক্ত ও পণ্ডিত লোক বলিয়া খ্যাত বাবু গোরাচাঁদ দাস বলিয়াছিলেনঃ "এরূপ পাণ্ডিত্য, এরূপ সহজ জ্ঞান, এরূপ তত্ত্ব-উপলব্ধি ও সরল প্রকাশভঙ্গী আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। স্বামিজীর প্রাণপ্রদ ধর্মালোচনা আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় অনেক আজগুবী ধারণা ও কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিল—বরিশালে এক নবযুগের সূচনা হইল।"

শেষের দিন ঠাকুরের ভক্ত ছেলেরা সভাসমিতি বন্ধ করিয়া দিলেন। রাতদিন বিপুল জনসমাগম হেতু এই কয়দিনই তাঁহারা একান্তে মহারাজের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, আজ প্রাণের ক্ষুধা মিটাইয়া লইবেন। তাঁহারা কহিলেন, 'একমাত্র অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে কথাবার্তায় ছাড়া, সভাসমিতিতে বা আলোচনায় ঠাকুরের বিষয় উল্লেখমাত্র করলেন না। আজ কিছু ঠাকুরের কথা বলুন, আমরা

শুনি।' মহারাজ প্রসন্নমুখে কহিলেন, 'আমিত্বের আ থাকা পর্যন্ত ঠাকুরকে বুঝতে চেষ্টা করা বৃথা। যতই বয়স বাড়চে ততই দেখচি ঠাকুরকে কিছুই বুঝতে পারি নি। ঠাকুরকে কিছু বুঝেচেন স্বামিজী আর নাগ মহাশয়। আমরা সেবকমাত্র। তাঁর আদেশ শুধু পালন করতে চেষ্টা করচি। তিনি কৃপা করে যেদিন বোঝাবেন সেদিন মাত্র বুঝব। ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলতে বড় ভয় হয়। স্বামিজীই বলেন— অগোচরে পাছে বাড়াতে গিয়ে ঠাকুরকে খাটো করে ফেলি! স্বামিজীরই এই ভাব, অন্য পরে কা কথা। ঠাকুরের খুব ধ্যানচিন্তা কোরো। তিনি তোমাদের বুঝিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট প্রকাশ হবেন—এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিশ্বাস কর।' —বলিতে বলিতে সহসা মহারাজের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল—দেহ নিস্পন্দ, চক্ষু ঈষৎ নিমীলিত। দুইএক বিন্দু অশ্রু চোখের কোণে দেখা দিয়া গড়াইয়া পড়িল। একটা দিব্য আভায় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এইভাবে মিনিটের পর মিনিট চলিয়া যাইতে লাগিল। গৃহখানি নিস্তব্ধ। অবশেষে সুরেন্দ্রকুমারের বড় ভয় হইল। তিনি মহারাজের নাকের কাছে হাত রাখিয়া দেখিলেন, শ্বাস নাই। নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন, নাড়ীও নাই। এইরূপ অবস্থায় কি করিতে হয় ইঁহারা জানিতেন না, কাজেই শঙ্কিতমনে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর একটু বাহ্য জ্ঞানের আভাস পাওয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ পরে অর্ধস্ফুটস্বরে 'রামকৃষ্ণ' 'রামকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন।

কর্মবহুল স্বামী সারদানন্দের জীবনে সমাধির এইরূপ বাহ্যপ্রকাশ সচরাচর নয়নগোচর হইত না। বেলুড় মঠে একবার ৺কালীপুজার সময় জপ করিতে বসিয়া তিনি এরূপ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন যে, পুজা সাঙ্গ হইলেও তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই।

সুরেন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার জীবনে কি কোন বিশেষ বাসনা আছে?' মহারাজ কহিলেন, 'কৈ, একমাত্র ঠাকুরের আদেশ পালন ছাড়া আর তো কিছু খুঁজে পাই না।'

ভক্তগণকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর বলতেন, সকাল সন্ধ্যায় নিত্য বসবি, ওতে তাড়াতাড়ি হয়।' বরিশালে এত কর্মকোলাহলের মধ্যেও তাঁহার সকালসন্ধ্যায় বসার নিয়মটি অব্যাহত ছিল। একএক দিন সন্ধ্যায় একলা গানও গাহিতেন।

অশ্বিনীবাবুর মুখে কালীবাড়ীর উন্নত সাধক সনা (সনাতন) ঠাকুরের কথা মহারাজ শুনিয়াছিলেন। তাই একদিন ভক্ত ছেলেদের সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। সনা ঠাকুর ঐসময়ে কদাচিৎ মন্দিরের বাহিরে আসিতেন; কিন্তু শরৎ মহারাজ মন্দিরের সমীপবর্তী হইবামাত্র ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। জগন্মাতাকে প্রণামান্তর উপবেশন করিয়া মহারাজ তাঁহার সঙ্গে মধুরালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সনা পরমহংস-দেবের সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য বালকের ন্যায় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে অল্পকথায় ঠাকুরের জীবনী বিবৃত করিলেন।

বরিশালে বহু নরনারী মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু এখানে তিনি কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। বলিয়াছিলেন, 'আনুষ্ঠানিক দীক্ষার একটা সংক্রামক ভাব আছে; একজন দীক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করলে, বহুর মধ্যে তা সংক্রমিত হয়। কিছুদিন পরে সে ভাবটি আর থাকে না। ব্যক্তিত্বের মোহে হঠাৎ কিছু করা উচিত নয়।'

কতিপয় আগ্রহশীল যুবকের নিকট রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী বুঝাইয়া দিয়া ১২ই জানুয়ারী তিনি কলিকাতা যাত্রা করেন।

বহুসংখ্যক ছাত্র ও গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য ষ্টীমার ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

* * *

অমৃতানন্দ (মিঃ জন্‌সন্) নামে জনৈক আমেরিকান ভক্তকে স্বামিজী মঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ তাহাকে ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত করেন।

কোনও ঘটনায় শরৎ মহারাজের মনে তন্ত্রোক্ত কোন কোন সাধন-রহস্য জানিবার ঔৎসুক্য জন্মে। তাঁহার পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্র যাবতীয় তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সিদ্ধ কৌল বলিয়াও প্রথিত ছিলেন; তিনি কহিলেন যে যথাবিধি অভিষিক্ত না হইলে তন্ত্রের সাধনরহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ করা অবিহিত। শরৎ মহারাজ তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কথা শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করিলেন, এবং মাতাঠাকুরাণীর অনুমতি লাভ করিয়া ২০শে নভেম্বর মঙ্গলবার রাত্রে কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে পুর্ণাভিষিক্ত হইলেন।

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য পরিভ্রমণ শেষ করিয়া স্বামিজী ৯ই ডিসেম্বর রাত্রে আহারের সময় অতর্কিতভাবে বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। শরৎ মহারাজ তখন কলিকাতায়। মঠ ও মিশনের যাবতীয় কার্য যন্ত্রচালিতবৎ সুচারুরূপে নির্বাহিত হইতেছে দেখিয়া স্বামিজী অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং পরদিন শরৎ মহারাজের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার অধ্যবসায় ও কর্মশক্তির অজস্র প্রশংসা করিলেন। তাঁহার মুখে প্রিয়শিষ্য মিঃ সেভিয়ারের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বামিজী অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং মিসেস্ সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিবার জন্য অনতিবিলম্বে মায়াবতী যাত্রা করেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী মায়াবতী হইতে মঠে প্রত্যাগত হইয়া স্বামিজী শুনিলেন যে, যকৃৎবিকৃতির ফলে শরৎ মহারাজ অত্যন্ত

কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, আর ঐ ব্যাধি ক্রমে সাংঘাতিক যকৃৎ-স্ফোটকে পরিণত হইতে পারে বলিয়া চিকিৎসকেরা আশঙ্কা করিতেছেন। নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া স্বামিজী পরিচর্যার ব্যবস্থা করিলেন, এবং রুদ্রাভিষেক করাইয়া সেই স্নানজল শরৎ মহারাজকে পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। দিন কয়েকের মধ্যেই ব্যাধি একেবারে সারিয়া গেল।

গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে একাদশ জনকে বেলুড় মঠ ঠাকুরবাটীর ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়া স্বামিজী দলিল সম্পাদন করেন। ঐ দলিল রেজিষ্টারী হওয়ার চারিদিন পরে, ১০ই ফেব্রুয়ারী স্বামিজীর উপস্থিতিতে ট্রাষ্টীগণের প্রথম সভা আহূত হয়। ঐ সভায় অধিক-সংখ্যকের ভোটে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠের সভাপতি এবং সর্বসম্মতিক্রমে স্বামী সারদানন্দ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভাপতির পদের জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের এবং স্বামী সারদানন্দের নামও প্রস্তাবিত হইয়াছিল, সভার কার্যবিবরণী হইতে জানা যায়। নিজের গুণে সারদানন্দ আজীবন ঐ সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৫]

বৎসরের প্রথম দিকে, সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারী মাসে, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ সুরবালা, খুল্লতাত নীলমাধব ও জয়রামবাটী গ্রামের ভক্তিমতী মহিলা ভানুপিসীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসেন এবং প্রায় সম্বৎসরকাল বোসপাড়া লেনের ১৬নং বাড়ীতে বাস করেন। তাঁহাকে

---

৫ ট্রাষ্ট ডীড্ করিবার পূর্বে স্বামিজী মঠ ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তি 'মহারাজে'র নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ সেই ব্যবস্থায় সম্মত হন নাই। তাহারও পূর্বে, মারী হইতে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর তিনি মহারাজকে লিখিয়াছিলেন: 'পত্রপাঠ উকিলের পরামর্শ নিয়ে এই মর্মে উইল রেজেষ্ট্রী করে এস যে, in case (যদি) আমি তুমি মরে যাই ত হরি এবং শরৎ আমাদের মঠের যা কিছু আছে সব পাবে।'

দেখাশোনা করিবার ও মিশন সংক্রান্ত কাজের জন্য শরৎ মহারাজকে এই সময় প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতে হইত।

এই বৎসর স্বামিজী মঠে ৺দুর্গাপূজা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন এবং নীলাম্বরের উদ্যানবাটী ভাড়া করিয়া পূজার সময় স্ত্রীভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীমাকে তথায় আনিয়া রাখেন। যজমানরূপে মায়ের নামে পূজার সঙ্কল্প হইয়াছিল এবং স্বামিজী তাঁহার হাত দিয়া পূজার তন্ত্রধারক শশী মহারাজের পিতা ঈশ্বরচন্দ্রকে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়াইয়াছিলেন। অতঃপর ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে স্বামিজী মঠে এবার প্রতিমায় ৺লক্ষ্মীপূজাও করাইলেন। কালীপূজা প্রত্যেক বৎসরই ঘটে পটে করা হইত, এইবারে সর্বপ্রথম প্রতিমায় করা হইল।

ঠাকুরের অভীষ্ট কার্য সম্পূর্ণ করিয়া স্বধামে প্রয়াণ করিবার জন্য স্বামিজী যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোন কাজে ত্রুটি দেখিতে পাইলে বা বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিলে তিনি অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেন। ক্রমাগত রোগে ভুগিয়া ইদানীং তাঁহার মেজাজও কিছুটা রুক্ষ হইয়াছিল, তাই অনেকেই অনেক সময় তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস পাইতেন না।

ঠাকুর তাঁহার প্রিয় সন্তানদের বলিয়া রাখিয়াছিলেন, স্বামিজীর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ না করিয়া, তাঁহাকে ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় হইতে না দিয়া যেন তাঁহার মনকে তাঁহারা বহির্মুখী রাখিবার চেষ্টা করেন। এই কাজে রাজা মহারাজ ছিলেন অদ্বিতীয়; গল্পগুজব করিয়া ছেলে ভুলানোর মত স্বামিজীকে তিনি ভুলাইয়া রাখিতে পারিতেন। আবার কোন কারণে চটিয়া গিয়া স্বামিজী যখন গালিগালাজ করিতে থাকিতেন, কোমলপ্রকৃতি মহারাজ তখন তাঁহার নিকট যাইতে চাহিতেন না, শরৎ মহারাজকে আসিয়া তাল সামলাইতে হইত। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি সারদানন্দ কোনদিন একঘণ্টা ধরিয়াও স্বামিজীর

কঠোর ভাষা সহ্য করিয়াছেন, এবং স্বামিজীর রাগ পড়িয়া আসিয়াছে বুঝিবামাত্র শান্তভাবে তাঁহার সাক্ষাতেই চা-পানে মনোনিবেশ করিয়াছেন, বা তামাক সাজিয়া আনিতে কাহাকেও আদেশ দিয়াছেন। আর এত বকুনি কোনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারিল না দেখিয়া পরিশেষে স্বামিজী 'ওর শরীরে ব্যাঙের রক্ত' বলিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিয়াছেন।[৬]

কোন কাজে রাজা মহারাজ ও শরৎ মহারাজকে স্বামিজী কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কাজ সিদ্ধ হয় নাই। শরৎ মহারাজ ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা জানাইতেই, স্বামিজী চটিয়া গিয়া ও অনেক গালিগালাজ করিয়া শেষকালে কহিলেন, 'রেখে দে তোদের ঐ একছটাক বুদ্ধি; সুদে আসলে বাড়ুক, পরে কাজে লাগবে।' আবার অন্য এক ব্যাপারে শরৎ মহারাজের পরামর্শ চাহিয়া স্বামিজী যখন বলিলেন, 'কি বল শরৎ?' নির্বিকারচিত্তে শরৎ মহারাজ উত্তর দিলেন, 'তুমিই তো ভাই বলেচ, একছটাক বুদ্ধি:' স্বামিজী হাসিয়া উঠিলেন।

আমেরিকা হইতে একখানি পত্র আসিয়াছে; পড়িয়াই স্বামিজী তাতিয়া উঠিলেন ও শরৎ মহারাজকে ডাকিতে কহিলেন। শরৎ মহারাজই ইদানীং তাঁহার চিঠিপত্রের জবাব লিখিয়া দিতেন, কিন্তু সেদিন তিনি মঠে ছিলেন না। স্বামিজী তখন 'রাজা'কে ডাকিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু রাজাও সেদিন মঠে অনুপস্থিত। পরদিন সকালে মঠে আসিয়া শরৎ মহারাজ স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবামাত্র তিনি গম্ভীর হইয়া কহিলেন, 'শরৎ, এমন করে তোমাদের তুজনের এক সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া কি উচিত?' শরৎ মহারাজ ধীরভাবে উত্তর

---

৬ মাছের রক্ত, ব্যাঙের রক্ত, বেলে মাছের রক্ত—এইরূপ ত্রিবিধ উক্তি পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে স্বামিজী বিভিন্ন উক্তি করিয়া থাকিবেন।

দিলেন, 'আমি তো ভাই তোমাকে বলে গিয়েছিলুম। কেন, কি হয়েচে?' শরৎ মহারাজের হাতে আমেরিকার পত্রখানি দিয়া স্বামিজী বলিলেন, 'এই দেখ, এই চিঠি পড়ে অবধি আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে। এখনি এর একটা উত্তর লিখে দাও।' শরৎ মহারাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখিয়া শুনাইতেই স্বামিজী কহিলেন, 'ঠিক হয়েচে; এরূপ অবস্থায় আমি কখনো এমন করে লিখতে পারতুম না।'

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে স্বামিজী বোধগয়ায় যান ও তথায় কয়েকদিন মাত্র থাকিয়া কাশী গমন করেন। কিন্তু কাশীতে তাঁহার স্বাস্থ্য আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল ও ঠাকুরের জন্মোৎসবের পুর্বেই তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। স্বামিজীর কাশীতে অবস্থানকালে তাঁহার শিষ্য কতিপয় যুবক 'কাশী দরিদ্রদুঃখ-প্রতিকার সমিতি' প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষভাবে তাঁহার আশীর্বাদভাজন হইয়াছিলেন।

জাপানে এই সময়ে নিখিল এশিয়া ধর্মমহাসভা করিবার একটা চেষ্টা হইয়াছিল। তজ্জন্য স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানাইতে রেভারেণ্ড ওডা ও অধ্যাপক ওকাকুরা জাপান হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। স্বামিজী সে আহ্বানে উৎসাহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধির জন্য তাঁহার যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। ১৪ই জুন তারিখে মিস্ ম্যাকলাউডকে স্বামিজী লিখিয়াছেন: 'আমায় যদি জাপানে যেতে হয় তা হলে কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে এবারে সারদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

অতঃপর স্বয়ং দিন নিরূপণ করিয়া স্বামিজী মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন, এবং পুর্বাহ্ণে কাহাকেও কিছুমাত্র বুঝিতে না দিয়া ৪ঠা জুলাই শুক্রবার রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিট সময়ে মহাসমাধিমগ্ন হইলেন। মাদ্রাজপ্রবাসী তাঁহার একান্ত অনুগত গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণানন্দ হঠাৎ শুনিতে

পাইলেন, স্বামিজী বলিতেছেন, 'শশী, শশী, শরীরটাকে থুক্ করে (অর্থাৎ থুথুর মত) ফেলে দিয়ে এসেচি !'

মঠভূমিতে পাদচারণ করিতে করিতে বেলতলার নিকট দাঁড়াইয়া স্বামিজী একদিন বলিয়াছিলেন, 'ঐ দেখ্ শরৎ, সামনেই ঠাকুরের চিতাস্মৃতি—কাশীপুর শ্মশান। আমার মনে হয় সমস্ত মঠভূমির মধ্যে এই স্থানটিই সর্বোৎকৃষ্ট।' সেই কথা শরৎ মহারাজের হঠাৎ মনে পড়িল। স্বামিজী কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানটিই তাঁহার দেহসংকারের জন্য মনোনীত করিয়া তিনি পৌরপ্রতিষ্ঠানের কর্তার নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন এবং দুইতিন বার পত্রবিনিময়ের পর তাঁহার অনুমতি আদায় করিতেও সক্ষম হইলেন।

স্বামিজীর আকস্মিক তনুত্যাগে গুরুভ্রাতারা শোকে মুহ্যমান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিরোভাবের কুড়িদিন পরে, ২৪শে জুলাই শরৎ মহারাজ স্বামিজীর মহাসমাধির ও সেইদিনে তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ সহ আমেরিকায় পত্র লিখিতে সমর্থ হন।

স্বামিজীর ভাবে দেশবাসী, বিশেষতঃ যুবকসমাজ এখন উদ্বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতায় ও শহরতলীতে নানাস্থানে সভাসমিতির আয়োজন ও প্রতিষ্ঠাকার্য চলিতে লাগিল এবং ঐসকল সভাসমিতির প্রায় সকলগুলিতেই নেতৃত্ব করিবার জন্য স্বামী সারদানন্দ আহূত হইতে লাগিলেন। ফলে তাঁহার কর্মব্যস্ততা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

২৩শে আগষ্ট তাঁহারই উদ্যোগে এলবার্ট হলে প্রথম স্মৃতিসভা হইয়া 'কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় স্থিরীকৃত হয় যে অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত ও অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ মিত্র যথাক্রমে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক হইবেন, এবং স্বামী

সারদানন্দ আচার্যরূপে প্রত্যেক শনিবার উপস্থিত থাকিয়া 'স্বামিজীর ভাবধারা ও উহাদিগকে কার্যে পরিণত করিবার উপায়' সম্বন্ধে ভাষণ দিবেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর শরৎ মহারাজের পিতা গিরীশচন্দ্র সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া অর্ধঘণ্টার মধ্যে কাশীপ্রাপ্ত হন। তারে সেই সংবাদ পাইবামাত্র অনুজ সতীশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি কাশী যাত্রা করিলেন এবং অবিলম্বে শোকার্তা জননীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। পিতার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ নিজের জন্য তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন—সোনার তারে গাঁথা ক্ষুদ্রাকার রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা এবং নিত্যপূজাপদ্ধতি ও প্রাণতোষণীতন্ত্র নামক গ্রন্থ দুইখানি।

পরবর্তী ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে বিবেকানন্দ সমিতি কর্তৃক আহূত সভায় তিনি ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে পাঁচটি ধারারাহিক বক্তৃতা করেন। ঐ সকল বক্তৃতার সারাংশ উদ্বোধনে মুদ্রিত হইয়া পরে 'গীতাতত্ত্ব' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।[৭]

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে বাগবাজার বোসপাড়া-নিবাসী ছাত্রবৃন্দ 'বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতি' নামে নূতন এক সমিতি গঠন করিয়া স্বামী সারদানন্দকে উহার সভাপতিপদে বরণ করে।

২০শে জানুয়ারী মঙ্গলবার বেলুড় মঠে সমারোহের সহিত স্বামিজীর প্রথম জন্মমহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে সারদানন্দ-রচিত নিম্নোক্ত সঙ্গীত গীত হইয়াছিল :

---

৭ গীতাতত্ত্ব ১৯২৮ অব্দে, পূজনীয় শরৎ মহারাজের দেহরক্ষার পরে, প্রকাশিত হয়। উহাতে উপর্যুক্ত বক্তৃতাগুলি ব্যতীত, ১৮৯৮ অব্দে এলবার্ট হলে প্রদত্ত ছয়টি বক্তৃতা, বালি হরিসভা ও কোন্নগর হরিসভায় প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতা এবং অপর দুইটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে।

স্তিমিতচিতসিন্ধু ভেদি উঠিল কি জ্যোতি ঘন,
কোটিসূর্য গলাইয়ে ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন।
(মায়া-) খণ্ডিত অখণ্ড বারি বুঝে লীলা কেবা হেন ॥
উজ্জ্বল বালকবেশে অখণ্ডঘর প্রবেশে,
প্রেমঘন বাহুপাশে কাহারে করে ধারণ।
উঠ বীর আঁখি মেলি, ছাড় ধ্যান চল চলি,
ধরণী ডুবিল বুঝি অবিদ্যা কামকাঞ্চন ॥
সুধীর ধীর পরশে যোগী চায় সহরষে,
কণ্টকিত তনুমন, নীরবে ভাসে বয়ান।
তারা জ্বলি ছায়াপথে স্পর্শে ধরা আচম্বিতে,
পুণ্যভূমে উদে আজি পুনঃ নরনারায়ণ ॥

স্বামিজীর জন্মপূর্বকালীন প্রপঞ্চাতীত লোকের ঘটনা, যাহা যোগ-দৃষ্টিতে দেখিয়া ঠাকুর এক সময়ে ভক্তদের কাছে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তদবলম্বনে গানখানি রচিত। এইদিন বিশেষভাবে দরিদ্রনারায়ণ-সেবার আয়োজন করা হইয়াছিল, এবং নারায়ণের ভুক্তাবশেষ-প্রসাদকণিকা ভক্তিভরে মুখে দিয়া স্বামী সারদানন্দ মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়াছিলেন।

এই জানুয়ারী মাসেই কাশী দরিদ্রদুঃখ-প্রতিকার সমিতি 'রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব সার্ভিস' বা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম নাম পরিগ্রহ করে। পূর্বে ইহা রামাপুরায় ভাড়াটে বাড়ীতে অবস্থিত ছিল, পরে তথা হইতে লাক্‌সা পল্লীতে খাজাঞ্চীর বাগানে উঠিয়া আসে। স্বামিজীর আদেশে স্বামী শিবানন্দ খাজাঞ্চীর বাগানের পূর্বার্ধে ভাড়াটে বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বাগানখানি ক্রয় করিয়া লওয়ায় অদ্বৈতাশ্রম সেবাশ্রমের নিকট বহুটাকার ঋণে আবদ্ধ হয়। ঐ টাকা ঠাকুরের একান্ত ভক্ত নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত একযোগে সংগ্রহ করিয়া দিয়া স্বামী সারদানন্দ অদ্বৈতাশ্রমকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় তখন আদর্শ ছাত্রাবাসের একান্ত অভাব। কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির সভ্যেরা সেই অভাব দূরীকরণে সচেষ্ট হন এবং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে বৃহৎ এক অট্টালিকা ভাড়া লইয়া ১৮ই জুন তারিখে 'বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির' নামে একটি ছাত্রাবাস খুলিয়া দেন। ছাত্রাবাসটি রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে স্থির হওয়ায় স্বামী সারদানন্দ বুড়োবাবাকে উহার অবৈতনিক অধ্যক্ষ ও নৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে প্রতিষ্ঠানটি এক বৎসরের অধিক স্থায়ী হইতে পারে নাই।

ছাত্রগণের জীবনগঠনে শরৎ মহারাজ এই সময়ে কঠোর পরিশ্রম করিতেন। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯০৩) তারিখে প্রকাশিত উদ্বোধনে আছে: "স্বামী সারদানন্দ এক্ষণে কলিকাতায় প্রতি সপ্তাহে তিনদিন ছাত্রগণের নিকট ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি, অধিবেশনস্থান মেট্রোপলিটান মেন বিদ্যালয়, সময় শনিবার অপরাহ্ণ ৫টা। বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতি, অধিবেশন-স্থল ৫০নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা। পূর্বে উদ্বোধনে যে বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির নামক ছাত্রাবাসের বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহার ২৭ জন ছাত্রের আবেদনে ঐ মন্দিরের ছাত্রগণের সুবিধার জন্য প্রতি রবিবার চারি ঘটিকার সময় স্বামী সারদানন্দ তাঁহাদিগকে গীতা পড়াইতেছেন।"

বক্তৃতা বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা রামকৃষ্ণ মিশন নানাভাবে ধর্মপ্রচার করিলেও কলিকাতার পুরমহিলারা তদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতেন না। এই অভাব দূরীকরণে যত্নবান হইয়া স্বামী সারদানন্দ ২৬শে অক্টোবর ১৭নং বোসপাড়া লেনে (নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বাড়ীতে) ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। ঐ সভায় ৫০।৬০ জন অন্তঃপুরচারিণী মহিলা উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর ২রা নভেম্বর সোমবার হইতে ঐ

বাড়ীতেই 'পুরস্ত্রী শিক্ষালয়' খোলা হইল এবং স্থির হইল যে, সোম ও শুক্রবার, সপ্তাহে এই তুইদিন মাত্র পুরস্ত্রী-শিক্ষার কাজ চলিবে। এই শিক্ষালয়ে সিষ্টার খ্রীশ্চিন সেলাই ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী লাবণ্যপ্রভা বসু লেখাপড়া শিখাইতেন এবং যোগীন-মা প্রমুখ ঠাকুরের স্ত্রীভক্তেরা ধর্মশিক্ষা দিতেন।[৮]

---

৮ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর প্রথম স্থাপিত হইলেও, নিবেদিতা বিদ্যালয় সাত মাস পরেই অর্থাভাবে একরূপ বন্ধ হইয়া যায় এবং অর্থসংগ্রহের জন্য সিষ্টার নিবেদিতা আমেরিকা গমন করেন। ১৯০২ অব্দের প্রারম্ভে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সরস্বতীপূজার দিন পঞ্চাশটি ছোট বালিকা লইয়া বিদ্যালয় পুনরায় খুলিয়া দেন। এই সময়ে স্বামিজীর জার্মাণ-শিষ্যা খ্রীশ্চিন (Miss Christiana Grunstidhel) আসিয়া বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। ছাত্রীসংখ্যা দিন দিন কমিতেছে দেখিয়া বিধবা ও বিবাহিত মেয়েদেরও গ্রহণ করা চলিতে থাকে এবং স্বামী সারদানন্দের চেষ্টায় উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সধবারা প্রধানতঃ সেলাই শিক্ষা করিতেন এবং বিধবারা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট মেয়েদিগকে পড়াইয়া অধ্যাপনার যোগ্যতা অর্জন করিতেন।

ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিন বৎসর পাশ্চাত্যে কাটাইয়া নিবেদিতা ১৯১১ অব্দে ভারতে আসেন; ঐ বৎসর ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিং শৈলে তাঁহার জীবনান্ত ঘটে। ১৯১৪ অব্দের এপ্রিল মাসে সিষ্টার খ্রীশ্চিন আমেরিকায় যান, এবং উহার দশ বৎসর পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেও মাস তুই পরেই বিদ্যালয়ের সংশ্রব ত্যাগ করেন। ১৯১৪ অব্দ হইতে বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব সিষ্টার সুধীরার উপর আসিয়া পড়ে। সুধীরা বসু সম্ভবতঃ ১৯০৯ অব্দে বিদ্যালয়ের কাজে প্রথম যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় মাতৃমন্দির নামে ছাত্রীনিবাস গড়িয়া উঠে এবং ঐ ছাত্রীনিবাস পরে ১৯২০ অব্দে শ্রীশ্রীসারদামন্দির নাম ধারণ করে।

বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাস পৃথক পৃথক ভাড়াটে বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। ১৯১৭ অব্দে জমি ক্রীত হইয়া তদুপরি নিজস্ব বাড়ী নির্মিত হয় এবং ১৯২২ অব্দে বিদ্যালয় ও উহার পরের বৎসর সারদামন্দির ঐ নিজস্ব বাড়ীতে চলিয়া আসে। কারুশিল্পে সমৃদ্ধ বৃহৎ এই ভবনটি ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের অশেষ পরিশ্রমের ফল।

প্রথমদিকে বিদ্যালয়ের কোন সুনির্দিষ্ট নাম ছিল বলিয়া মনে হয় না। উহার

শ্রীশ্রীমাকে আনিয়া রাখিবার জন্য স্বামী সারদানন্দ ডিসেম্বর মাসে বাগবাজার ষ্ট্রীটের ২-১ নম্বর বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখেন এবং ইহার প্রায় একমাস পরে, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতায় আসিয়া মাতাঠাকুরাণী এই বাড়ীতে প্রায় দেড়বৎসর বাস করেন। শরৎ মহারাজ স্বামী বিরজানন্দ, ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ ও যোগীন-মার সঙ্গে জয়রামবাটীতে যাইয়া বর্ধমানের পথে মাকে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন; এবং ভানুপিসী, নীলমাধব প্রভৃতি অনেকে তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ বাগবাজার ষ্ট্রীটের এই বাড়ীতে থাকিয়া স্বয়ং সেবাকার্য পরিচালনা করিতেন। এই সময় হইতে মিসেস্ বুল মার সেবার জন্য প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করিতে থাকেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি নামক প্রতিষ্ঠানের কতিপয় সভ্যের উদ্যোগে 'রামকৃষ্ণ সমিতি অনাথ-ভাণ্ডার' নামে একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য অনাথ হিন্দু বালকদিগের গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং নিরুপায় হিন্দু বিধবা ও বৃদ্ধবৃদ্ধাকে অর্থসাহায্য দেওয়া। স্বামী সারদানন্দ এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি ছিলেন এবং সতত উহার কল্যাণচেষ্টায় নিয়োজিত থাকিতেন।

প্রস্পেক্টাস্-পুস্তিকায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পুরস্ত্রী-শিক্ষালয় নাম মুদ্রিত ছিল। ১৯১৪ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মীরা দেবী আসিয়া বিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং নিজের খাতা-পত্রে 'নিবেদিতা বিদ্যালয়' লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই একান্ত আগ্রহে শেষোক্ত নামটি থাকিয়া যায়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ ও দিব্যসঙ্গে প্রেরণা লাভ করিতেন এবং পূজনীয় শরৎ মহারাজের পরামর্শ ও সাহায্য লইয়া সকল কাজে অগ্রসর হইতেন। মহারাজ ১৯১৮ অব্দে বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন করিয়া দেন। নানা অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়া ১৯৩৩ অব্দে উহা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

পরিচালকবর্গের মধ্যে ঘোর মতদ্বৈধের ফলে একদা উহার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইলে তিনি স্বয়ং ভাণ্ডারভবনে আসিয়া উপস্থিত হন এবং স্বীয় ব্যক্তিত্ববলে ও মাত্র দুইএকটি মিষ্টকথায় সকল মনোমালিন্য বিদূরিত করেন। অনন্তর যখন দেখা গেল, পরিচালকগণের দ্বারাই সুচারুরূপে কার্য নির্বাহ হইতেছে তখন তিনি কহিলেন, 'আমার আর বারবার এখানে আসার প্রয়োজন নাই। তবে তোমরা যদি কোন বিষয়ে সঙ্কল্প স্থির করতে না পার তখন আমার কাছে এলেই আমি সাহায্য করতে চেষ্টা করব। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে ভাণ্ডারের খবর দিয়ো।'

উৎসাহের আধিক্যে পরিচালকেরা এক সময়ে বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ, ভাণ্ডারের ছেলেদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেন তারা মানুষ হয়ে মঠ মিশনের কাজে লাগতে পারে।' শরৎ মহারাজ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'সে বড় শক্ত কথা। যদি এদের লেখাপড়া আর কোনরকম অর্থকরী বিদ্যা শেখাতে পার, যাতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও সদ্ভাবে জীবন কাটাতে পারে, তা হলেই যথেষ্ট।' এই অনাথভাণ্ডার এখন নিজস্ব ভবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের জন্মোৎসবের পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ সান্নিপাতিক জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। এই সময় মঠের পোস্তা-নির্মাণ চলিতেছিল, মহারাজ সেই নির্মাণকার্য পরিদর্শন করিতেন। মঠের তহবিলও তাঁহারই জিম্মায় থাকিত। তাঁহার অসুস্থতায় সকল দিকে অব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া শরৎ মহারাজ তিন বৎসরের জন্য মঠের যাবতীয় কার্য পর্যবেক্ষণের ও টাকাকড়ির সম্পূর্ণ দায়িত্ব বুড়োবাবার উপর ন্যস্ত করেন।

অসুখের সূত্রপাতেই চিকিৎসা ও পথ্যের সুবন্দোবস্তের জন্য মহারাজকে বলরাম-ভবনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে জ্বরের

বিরাম হইল ও তিনি অন্নপথ্য গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু জ্বরের পুনরাক্রমণ-ভয়ে স্নান করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এদিকে পেটের চামড়ার ভাঁজে ঘামে পচিয়া ঘা ও দুর্গন্ধ হইয়াছে। শরৎ মহারাজ তখন দুই বালতি জল লইয়া আসিয়া হাতে ধরিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া বসাইলেন, এবং 'তুমি বুঝচ না শরৎ, স্নান করলেই আবার জ্বর হবে'—ইত্যাকার কথায় কান না দিয়া সাবানজলে সন্তর্পণে চামড়ার ভাঁজ পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইলেন। এইভাবে একদিন অন্তর স্নান চলিতে লাগিল, এবং মহারাজও স্নানে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন ; কিন্তু গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যাওয়ার কথায় ভয় পাইয়া বলিলেন, 'তুমি বুঝচ না শরৎ, গাড়ীতে উঠতে গেলেই হার্ট ফেল করবে।' 'বেশ তো, উঠেই দেখ না কেমন হার্ট ফেল করে'—এই বলিয়া শরৎ মহারাজ হাতে ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইলেন। গাড়ীতে বসিয়াও মহারাজের সেই আতঙ্ক প্রকাশ—'গাড়ী চলতে আরম্ভ করলেই হার্ট ফেল করবে!' এইরূপ ব্যাপার নিত্যই উপস্থিত হইত। মহারাজ রাজী হইবেন না, শরৎ মহারাজও ছাড়িবেন না। শেষ পর্যন্ত মহারাজ পদব্রজে অনায়াসে গঙ্গার ধারে যাইয়া ও খানিকক্ষণ বেড়াইয়া আনন্দিতমনে ফিরিয়া আসিতেন।

বালক যেমন সহজেই ভয় পায়, আবার মুরুব্বি কেহ হাতে ধরিলেই ভয়ভাবনারহিত হয়, মহারাজের ভাবও ছিল অনেকটা সেই রকম। এই বালকসুলভ ভাব মহারাজকে এত সুন্দর মানাইত যে, উহাকে স্নায়ুদৌর্বল্য বলিবার উপায় ছিল না।

স্বামী সারদানন্দ কেবল সেবাপরায়ণই ছিলেন না, সেবাকুশলও ছিলেন। উপর্যুক্ত ঘটনাটি তাঁহার সেবাকুশলতার সুন্দর উদাহরণ।

বেলুড় মঠের এক ভৃত্যের সর্বাঙ্গে ব্যথা ও জ্বর হয় ; সে যন্ত্রণায় ছটফট এবং মৃদু আর্তনাদও করিতেছিল। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার

সেবাগ্রহণে কুণ্ঠিত হইবে বুঝিয়া শরৎ মহারাজ রাত্রির অন্ধকারে তাহার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রায় দুইঘণ্টা যাবৎ সর্বাঙ্গ টিপিয়া দিয়া তাহার যন্ত্রণার উপশম করিলেন। পরে অনুসন্ধানে শরৎ মহারাজই ঐভাবে তাহার সেবা করিয়াছিলেন জানিতে পারিয়া লোকটি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

এইরূপ আরও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রুগ্ন-শয্যায় শরৎ মহারাজের উপস্থিতিই যেন একটা আশার বাণী বহন করিয়া আনিত। অন্য লোকের তো কথাই নাই, গুরুভ্রাতারাও ঐরূপ অবস্থায় তাঁহাকে নিকটে পাইতে ইচ্ছা করিতেন। আর এই স্বভাবসিদ্ধ সেবানিষ্ঠাই দেশের যাবতীয় দুঃস্থ নরনারীর দুঃখবিমোচনে প্রযুক্ত হইয়া বিরাটভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

* * *

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরের প্রারম্ভে স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকা যাত্রা করেন। উদ্বোধন পত্রিকার আর্থিক অবস্থা তাহার পূর্বেই শোচনীয় হইয়াছে এবং উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে। বাকি কয়েক মাসের পত্রিকা পাইতে গ্রাহকগণের অসুবিধা যাহাতে না হয় কর্তব্যনিষ্ঠ ত্রিগুণাতীত তজ্জন্য ঐ সংখ্যাগুলি অগ্রিম ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন। উদ্বোধন তখন ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেনে অবস্থিত গিরীন্দ্রমোহন বসাকের নিজবাটীস্থ সারদা প্রেস হইতে প্রকাশিত হইত। গিরীন্দ্রবাবুই ইদানীং উদ্বোধনের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি ও অপরাপর হিতৈষীরা প্রস্তাব করিলেন যে, বন্ধ না করিয়া দিয়া আরও কিছুদিন উদ্বোধনের ভাগ্য পরীক্ষা করা উচিত। কিন্তু পরিচালক ও অর্থ দুয়েরই তখন অভাব। অর্থাভাব দূরীকরণের জন্য সাহায্য-তহবিল খুলিয়া এবং গিরীন্দ্রবাবুকে প্রকাশক মনোনীত করিয়া, স্বামী সারদানন্দ লিখিলেন: "হে পাঠক! উদ্বোধন ৫ম বর্ষে

উপনীত হইল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্ত্ব বা ব্রহ্মশক্তি, বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়-নিহিত রজঃ বা ক্ষাত্রশক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরম কল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিয়াছে। সেইজন্য আপাততঃ শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবয়স্ক হইলেও অমিত-বলশালী এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর। আশ্চর্য নহে—সর্ষপতুল্য বীজেই বিশাল বৃক্ষ, নগণ্য অসহায় মনুষ্যশরীরেই জড়শক্তিনিয়ামিকা চৈতন্যময়ী অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি এবং আকাশাপেক্ষাও তরল ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্বসংসার নিহিত রহিয়াছে। নববর্ষে নবোদ্যমে পুরাতন শক্তি আবার জাগরিতা।”

শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই সময়ে 'ভারতে শক্তিপূজা' নামক মৌলিকচিন্তাপূর্ণ অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেন। পঞ্চমবর্ষের উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতে শক্তিপূজা'। তাঁহার সুদক্ষ সম্পাদনায় উদ্বোধন শীঘ্রই জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন হেতু স্বামিজীর গ্রন্থাবলীর প্রতি দেশবাসীরা আকৃষ্ট হওয়ায় উহার তহবিলেও কিছু অর্থ সঞ্চিত হইল।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে গিরীন্দ্রবাবুর মৃত্যু হইলে উদ্বোধন কার্যালয় তাঁহার বাটী হইতে ৩০ নং বোসপাড়া লেনে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু কয়েক মাস পরেই এখান হইতেও স্থানান্তরিত হওয়ার নোটিশ পাওয়া গেল। পরিচালকেরা তখন উদ্বোধন কার্যালয় নিজস্ব গৃহে স্থাপন করার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে আবার মাতা-ঠাকুরাণীর কলিকাতা-বাসের উপযোগী নিজস্ব বাটীর আশু প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছিল। ঠাকুরের তিরোভাবের পর বহু বৎসর গত হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীমাকেও ইতোমধ্যে বহুবার কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে হইয়াছে, কিন্তু ভাড়াটে বাড়ীতে কিংবা গৃহস্থভক্ত-বাড়ীতে

ব্যতীত নিজস্ব ভবনে তাঁহাকে আনিয়া রাখা সন্ন্যাসী সেবকের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ভাড়াটে বাড়ীতে রাখা বহুব্যয়সাধ্য, অথচ গঙ্গার নিকটবর্তী স্থানে ইচ্ছানুরূপ বাড়ীও সকল সময়ে পাওয়া যাইত না। নানা কারণে গৃহস্থবাড়ীতে মাকে অধিক দিন রাখাও সম্ভবপর ছিল না।

খড়-ব্যবসায়ী কেদারচন্দ্র দাস ঠাকুরবাটী নির্মাণের জন্য ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই বাগবাজার গোপাল নিয়োগী লেনে তিন কাঠা চারি ছটাক জমি বেলুড় মঠকে দান করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ তদুপরি এক পাকা বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন: নীচের তলায় উদ্বোধন-সংক্রান্ত কাজ চলিবে, দ্বিতলে ঠাকুরের নিত্য পূজার ব্যবস্থা থাকিবে এবং মাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় আসিলে স্বজন সহ স্বচ্ছন্দমনে বাস করিতে পারিবেন।

উদ্বোধনের তহবিলে যে অর্থ (২৭০০৲) সঞ্চিত ছিল, গৃহের ভিত্তি পত্তন করিতেই তাহা নিঃশেষিত হইল। ভিত্তি নির্মাণে যে এত অর্থ-ব্যয় হইবে তাহা আগে বুঝিতে পারা যায় নাই। মৃত্তিকার নিম্নস্তরে আবিষ্কৃত গঙ্গার স্রোতোধারার অব্যাহত গতি রক্ষা করিতে যাইয়া ব্যয়াধিক্য ঘটে। ঋণ করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে শরৎ মহারাজ বাধ্য হইলেন এবং ৫৭০০৲ টাকা ঋণ করিয়া ও অবশিষ্ট টাকা নিজে দিয়া সম্বৎসরের মধ্যে নির্মাণকার্য প্রায় সমাধা করিলেন। একতলায় ছয়খানি, দ্বিতলে তিনখানি ও ত্রিতলে একখানি সর্বসমেত এই দশ-খানি ঘর তখন নির্মিত হইয়াছিল।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে উদ্বোধন কার্যালয় নবনির্মিত ভবনে উঠিয়া আসে। শরৎ মহারাজের দিনলিপি হইতে জানা যায় যে, ইহার এক বৎসর পরে, ১৯০৯ অব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তিনি পার্শ্ববর্তী এক কাঠা চারি ছটাক জমি ১৮৫০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন এবং গৃহ

নির্মাণ কার্যের জন্য পুনরায় ২৮০০৲ টাকা ধার করিয়াছিলেন। বর্তমান অফিস-ঘর ও তদুপরি দ্বিতলের ঘরখানি ঐ নূতন জমির উপরে ১৯১৫ অব্দের প্রারম্ভে নির্মিত হয়।

মঠের কর্তৃপক্ষীয় কেহ কেহ উদ্বোধনের সঞ্চিত তহবিল গৃহ-নির্মাণে ব্যয় করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তদুপরি শরৎ মহারাজ যখন বহু সহস্র টাকার ঋণ স্বীকারে প্রবৃত্ত হইলেন তখন ঘোরতর আপত্তি উঠিল। কিন্তু জগন্মাতার উপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল ও আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন এই মহাপুরুষকে কোন বাধাই বিচলিত করিতে পারে নাই। আর বাস্তবিক পক্ষে বিচলিত হওয়ার হেতুও তিনি দেখিতে পান নাই। কারণ, শ্রীশ্রীমার বাসের জন্য তিনি গৃহনির্মাণ করিতেছিলেন, নিজের শিষ্য বা নিজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ ভক্তেরাই তজ্জন্য তাঁহাকে টাকা ধার দিয়াছিলেন এবং সে ধার পরিশোধের জন্য ব্যস্ততারও প্রয়োজন ছিল না। তাহা ছাড়া, উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত স্বামিজীর গ্রন্থাবলী তখন বিপুলসংখ্যায় বিক্রয় হইতেছিল।

কথাপ্রসঙ্গে শেষজীবনে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'যখন উদ্বোধনের বাড়ী হয় তখন এগার হাজার টাকা দেনা। ঐ দেনা ঘাড়ে নিয়ে বাড়ী করা হল। বই বিক্রী ইত্যাদি দ্বারা তা শোধ হয়েছিল। মাকে রাখবার জন্যেই এই বাড়ী করা। তাঁকে কেন্দ্র করে—তাঁর জন্যেই সব এইভাবে ভরপুর হয়ে তখন সকল কাজ করতুম।' [প্র]

* * *

স্বামী সারদানন্দের দিনলিপি হইতে জানা যায়:

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি কর্তৃক মিনার্ভা থিয়েটারে আহূত জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় 'বর্তমান যুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ'।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ স্বামিজীর মন্দিরের ভিত্তিপত্তন হয় এবং

উহার তিনদিন পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এলাহাবাদ হইতে আগমন করেন।

১৪ই মার্চ তিনি মন্দির ও চার্টার সংক্রান্ত কাজে ব্যাপৃত ছিলেন; ১৭ই মার্চ রামকৃষ্ণ মিশন চার্টার সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে মিষ্টার মোহিনীর সঙ্গে মঠে আসিয়াছিলেন; এবং ৮ই মে রামকৃষ্ণ মিশন চার্টার সংক্রান্ত কাগজপত্র ষ্টোকো দ্বারা নিষ্পত্তি করাইবার উদ্দেশ্যে (for getting the R. K. M. papers settled by Stokoe) কেদার মহারাজের মারফত মিষ্টার মোহিনীর নিকট ৮৫৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬মে মে শরৎ মহারাজের রত্নগর্ভা জননী নীলমণি দেবী পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মঠে পাঁচ টাকার ও শ্রীশ্রীমাকে পাঁচ টাকার আম কিনিয়া দিতে বলিয়াছিলেন।

১০

শ্রীশ্রীমায়ের সেবা

সন্ধ্যা হইতে অরুণোদয় পর্যন্ত চারিপ্রহর একাসনে বসিয়া স্বামী সারদানন্দ ৺কালীপুজা করিতেন, প্রথমদিকের মঠ-জীবনে অনেকে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার পুজায় তন্ত্রধারকের প্রয়োজন হইত না। প্রতিবৎসর ঠাকুরের জন্মতিথি-পুজার রাত্রে ঠাকুরঘরে বসিয়া গিরিশবাবু-রচিত এই গানটি গাহিতেন, 'দুঃখিনী ব্রাহ্মণী-কোলে কে শুয়েছ আলো করে।' আর স্বামিজীর জন্মতিথি-পুজায় গাহিতেন স্বামিজীর স্বরচিত গান: 'একরূপ অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামি-কালহীন, দেশহীন সর্বহীন নেতি-নেতি বিরাম যথায়।'

বেলুড় মঠে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৺শিবচতুর্দশীর রাত্রে শরৎ মহারাজ একাসনে বসিয়া চারি প্রহরে চারিবার শিবপুজা করিলেন। পুজার অন্তে তানপুরা সহযোগে গান, গানের পরে পরবর্তী প্রহরের পুজা —এইভাবে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। গানের সময় একটি ভক্ত পাখোয়াজ বাজাইয়াছিলেন। পরদিন শরৎ মহারাজ স্বহস্তে ঠাকুরপুজাও করিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের নিজ বাটী নির্মিত হইয়াছে, এবং শরৎ মহারাজ তাঁহাকে আনয়ন করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় জয়রামবাটী হইতে মায়ের এক আহ্বানলিপি আসিল। মা লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ভাইয়েরা পরস্পর পৃথগন্ন হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, শরৎ মহারাজকে উপস্থিত থাকিয়া ভাগ বাটোয়ারার কাজটি করিয়া দিতে হইবে। তিন বৎসর পূর্বে মায়ের গর্ভধারিণী শ্যামাসুন্দরী দেবী লোকান্তরিত হওয়ায় কার্যতঃ তিনিই এখন ভাইদের সংসারে অভি-

ভাবিকা ছিলেন। যোগীন-মা, গোলাপ-মা [১] ও জনৈক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া ২৩শে মার্চ শরৎ মহারাজ বিষ্ণুপুরের পথে জয়রামবাটী যাত্রা করিলেন।

পরদিন বেলা এগারটায় ক্ষুদ্র আমোদর-নদ পার হইয়া তিনি জয়রামবাটীর মৃত্তিকাস্পর্শ করিলেন এবং বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম ও ও আমোদরে স্নান করিয়া ধূলা-পায়ে মার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন। কোয়ালপাড়া হইতে পাঁচ মাইল রাস্তা তিনি পদব্রজে আসিয়াছিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিতেই মা তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন ও চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমু খাইলেন। মায়ের মধ্যমভ্রাতা কালীকুমারের নবনির্মিত গৃহে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল।

জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে সকালে উঠিয়া শরৎ মহারাজ নদীর ধারে যাইতেন, পথের ক্লান্তি বৃক্ষতলে বসিয়া দূর করিতেন ও তৎকালে আপনমনে একএক দিন গাহিতেন, 'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই'—বুদ্ধচরিতের এই গানটি। তারপর স্নানাদি সারিয়া শ্মশানের মধ্যবর্তী আমলকীবৃক্ষের তলায় অনেকক্ষণের জন্য ধ্যানমগ্ন হইতেন। গৃহে ফিরিয়া চা পান করিবার পর স্বামিজীর জ্ঞানযোগ গ্রন্থখানির সম্পাদনা-কার্যে মনোনিবেশ করিতেন। গ্রন্থখানি তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন ; স্বামিজী তাঁহার বক্তৃতাবলী যথেচ্ছ কাটিয়া ছাঁটিয়া গ্রন্থাকারে সম্পাদন করিবার অধিকার তাঁহাকে দিয়াছিলেন। আহার

---

১ যোগীন-মা ও গোলাপ-মা ঠাকুরের শিষ্যা ও মায়ের সেবিকা। যোগীন-মার পূর্ণনাম যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস, আর অন্নপূর্ণা দেবীর ডাকনাম ছিল গোলাপ। মা কলিকাতায় আসিলে বা তীর্থাদি স্থানে গমন করিলে যোগীন-মা ও গোলাপ-মা জয়া-বিজয়ার মত তাঁহার সঙ্গিনী হইতেন। মায়ের সুখ সুবিধার দিকে গোলাপ-মা সতত দৃষ্টি রাখিতেন ও মায়ের বাড়ীতেই বাস করিতেন।

করিতে যাইয়া তিনি মাকে প্রণাম করিতেন ও বিশ্রামান্তে আবার লেখাপড়ার কাজ লইয়া বসিতেন। বৈকালে পুনরায় নদীর ধারে যাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরিয়া আসিতেন। সন্ধ্যার পর মামারা ও গ্রামের লোকেরা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতেন। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে চা পান করিতেন ও সুখদুঃখের কথা কহিতেন।

শরৎ মহারাজ জয়রামবাটীতে চলিয়া যাইবার পর সকল ধর্মের প্রতিনিধি লইয়া কলিকাতা টাউন হলে ৯ই হইতে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত তিনদিন ধর্মসভার (Convention of Religions) অধিবেশন হয়। সেই সভায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। ইংরাজী ভাষায় লিখিত অভিভাষণ জয়রামবাটী হইতে তিনি পাঠাইয়া দেন; এবং এই সভার শেষ দিনের অধিবেশনে স্বামী নির্মলানন্দ কর্তৃক উহা পঠিত হয়। এই সারগর্ভ রচনার উপসংহারে ঠাকুরের সমগ্র শিক্ষার সারমর্ম যেভাবে অতি অল্পকথায় নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা সত্যই অপূর্ব।[২]

শরৎ মহারাজ জয়রামবাটীতে আসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও কামারপুকুর যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বদিন সদলে কামারপুকুর যাইয়া ও সানন্দে তিনদিন তথায় অবস্থান করিয়া শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী ফিরিয়া আসেন। কামারপুকুর হইতে, ভক্তের আমন্ত্রণে, তিনমাইল দূরবর্তী নবাসন গ্রামে তিনি গিয়াছিলেন এবং তথায় সমস্ত দিন সৎপ্রসঙ্গে কাটাইয়া ফিরিবার

---

২ পূজনীয় শরৎ মহারাজ শাক্তধর্ম সম্বন্ধে লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে লিখিতে হয়। তাঁহারই কথানুসারে পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন (পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের পুত্র) শাক্তধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ করেন।

সময় শশী মহারাজের সহোদরা এক ভগিনীকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। দরিদ্রা ভগিনী আসন পাতিয়া মুড়ি খাইতে দিয়াছিলেন আর তিনিও আনন্দ করিয়া সেই মুড়ি খাইয়াছিলেন। অথচ ভক্ত-বাড়ীতে অবেলায় খাওয়া হইয়াছিল এবং বিকালবেলা কিছুই খাইতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না।

শরৎ মহারাজ কামারপুকুর হইতে ফিরিয়া আসার পরেই বিষয়-বিভাগের কাজ আরম্ভ হইল। জমিজমা মাপজোখ করিবার জন্য কোয়ালপাড়া হইতে কেদারনাথ দত্ত আসিলেন। ক্রমে ঐ কাজ সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, এইবারে লেখাপড়ার ভিতর দিয়া বিভাগকার্য সম্পূর্ণ হইবে। স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ তিনজন সালিশের অন্যতম তাজপুরের সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমা কোন্ ঘরে থাকিতে ইচ্ছা করেন জানিতে চাহিলেন। মা বলিয়া পাঠাইলেন, 'ঠাকুর বলতেন, ইঁদুর গর্ত করে, সাপ সেই গর্তে থাকে।' সারদাপ্রসাদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জমিজমা ঘরবাড়ী সবই যখন ভাগ হয়ে যাচ্চে তখন মার জন্যে কোন ঘর নির্দিষ্ট না থাকলে তিনি জয়রামবাটীতে বাস করবেন কি করে?' মা বলিয়া পাঠাইলেন, 'দুদিন প্রসন্নের ঘরে, দুদিন কালীর ঘরে থাকব।' বিভাগকর্তারা আর প্রশ্ন না করিয়া মা যে ঘরে থাকিতেন সেই ঘরখানি প্রসন্ন-মামার ভাগে ফেলিয়া দিলেন।

বিভাগ-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সমাধা হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়াই যে শরৎ মহারাজ জয়রাম-বাটীতে আসিয়াছিলেন অন্তর্যামিনী মায়ের তাহা অগোচর ছিল না। নিজেই তিনি এইবার যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং ২১শে মে অপরাহ্ণে জয়রামবাটী হইতে যাত্রা করিয়া ২৩শে রবিবার সকালে কলিকাতায় পৌছিলেন। যোগীন-মা, গোলাপ-মা এবং দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্রী

রাধু ও মাকু সহ নিজবাটীতে প্রথম শুভাগমন করিয়া ও বাটী দেখিয়া মা নিরতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীশ্রীসারদামাতার উদ্দেশ্যে রচিত ভবনে তাঁহাকে আবাহন ও আনয়ন করিয়া সারদানন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। নিজেকে তিনি 'মার বাড়ীর দারোয়ান' মাত্র জ্ঞান করিয়া তাঁহারই তৃপ্তিবিধানের জন্য সকল কাজ পূর্বে যেমন করিতেছিলেন তেমনই করিয়া যাইতে লাগিলেন; কেবল তাঁহার কর্মশক্তি যেন বহুগুণে বর্ধিত হইয়া সর্বত্র তাঁহাকে জয়শ্রী-মণ্ডিত করিয়া তুলিল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী হইতে গঙ্গা অতি নিকটে; ছাদে উঠিলেই গঙ্গাদর্শন হয়। আবার উত্তরদিকে দূরে দৃষ্টিপাত করিলে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর ঝাউগাছগুলির সমুন্নত শির দেখিতে পাওয়া যায়। মা দেখিয়া আনন্দিত হইতেন, এবং গোলাপ-মার সঙ্গে খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া পদব্রজে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন।

শ্রীশ্রীমা নিজে ঠাকুরপূজা করিতেন ও ঠাকুরকে ভোগ দিতেন। কত ভক্ত তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া ও তাঁহার স্নেহাশীর্বাদ লাভ করিয়া তাঁহারা নিজেদের শোকতাপ দৈন্য ভুলিয়া যাইতেন। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই মার কাছে অধিকক্ষণ থাকিবার সুযোগ পাইতেন, পুরুষেরা তাঁহার দ্বারীর সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইতেন। শেষে প্রসাদ ধারণ করিয়া ও 'আবার এসো' এই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরাগমনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেন। মায়ের বাটী অপার্থিব শান্তি ও আনন্দ-নিকেতন হইয়া উঠিল।

প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানটি শরৎ মহারাজের চিরাভ্যস্ত কাজ; শয্যা-শায়ী না হইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম বড় একটা ঘটিত না। গঙ্গাগর্ভে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ জপ-তর্পণ করিতেন; অনন্তর একখানি কেটো

বস্ত্র পরিধানপূর্বক একহাতে ভিজা কাপড় ও গামছা এবং অন্যহাতে একঘটী গঙ্গাজল লইয়া ফিরিতেন। বস্তুগুলি যথাস্থানে রক্ষাপূর্বক উপরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিতেন; কদাচিৎ বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত দিবা ও রাত্রির মধ্যে আর উপরে গমন করিতেন না। তারপরে বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া নিজাসনে বসিয়া চা পান করিতেন ও দপ্তর খুলিয়া কাজে মন দিতেন। চিঠিপত্র লেখা, বিবিধ তহবিলের হিসাবপত্র ঠিক রাখা, মিশনের জনহিতকর কাজের বিবরণ বা তৎসংক্রান্ত আবেদন ও প্রাপ্তিস্বীকার লিখিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দেওয়া, প্রবন্ধ রচনা, উদ্বোধনের গ্রন্থাবলী সম্পাদনা ইত্যাদি তাঁহার এই সময়কার কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পূজা সমাপ্ত হইলে শ্রীশ্রীমা নীচে প্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন ও শরৎ মহারাজ কিছুক্ষণের জন্য হাতের কাজ বন্ধ রাখিয়া ভাণ্ডারে যাইয়া উহা গ্রহণ করিতেন। যোগীন-মা এই সময়ে স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে মায়ের বাড়ীতে আসিয়া ভোগ রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে বসিতেন। মহারাজ তাঁহার কাছে মায়ের স্বাস্থ্য হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তঃপুর সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিয়া লইতেন এবং কি করিলে তাঁহাকে অধিকতর সুখী করিতে পারা যাইবে তদ্বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

সন্ধ্যারতির পর জপাদি সারিয়া শ্রীশ্রীমা মাঝে মাঝে বলিয়া পাঠাইতেন, 'শরৎকে বল দুটো গান গাইতে।' বৈঠকে একটি তানপুরা ও একজোড়া বাঁয়া-তবলা ছিল; তবলা কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত, সাধারণতঃ তানপুরা ও বাঁয়া সহযোগে গান চলিত। তানপুরাটি বাঁধিয়া শরৎ মহারাজ অপরের হাতে দিতেন এবং বাঁয়া হাতে গান ধরিতেন: 'এস মা এস মা'—'শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে'—'নিবিড় আঁধারে মা তোর'

—'দনুজদলনী নিজজনপ্রতিপালিনী শ্রীকালী' ইত্যাদি। জগন্মাতার প্রিয় সেবক তাঁহারই তৃপ্তিবিধানের নিমিত্ত তন্ময় হইয়া একটির পর একটি গান গাহিয়া চলিতেন, উপরে ঠাকুরঘরে মেয়েদিগকে সঙ্গে লইয়া বসিয়া মাতাঠাকুরাণীও একমনে শ্রবণ করিতেন। সমস্ত বাড়ীখানি সুরতরঙ্গে ভরিয়া উঠিত, একটা দিব্য ভাবের আবেশে জমজম করিত।

ঠাকুরের আদেশে শ্রীশ্রীমা, তাঁহার তিরোভাবের কিছুকাল পর হইতেই, মন্ত্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ মন্ত্রদান প্রধানতঃ ঠাকুরের সমকালীন ভক্তগণের ও ভক্ত-পরিবারসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় শিষ্যসংখ্যা প্রথমদিকে তত অধিক ছিল না। ইদানীং নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহু মুমুক্ষু নরনারী তাঁহার শ্রীপদে আশ্রয় লাভ করিবার জন্য আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং নিত্যনূতন দীক্ষার্থীর সমাবেশে মাতৃভবনের পুণ্যশ্রীও সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মন্ত্রদান করিয়া কোন কোন বিশেষ-জিজ্ঞাসুকে মা বলিয়া দিতেন, 'নীচে গিয়ে শরতের কাছে ওসব জেনে নাও।' মায়ের আদেশে শরৎ মহারাজ এক এক জনকে উদ্দিষ্ট বিষয় লিখিয়াও দিতেন।

নূতন বাড়ীতে আসিয়া শ্রীশ্রীমার পানিবসন্ত হইয়াছিল। উহা সারিয়া যাওয়ার পর তাঁহাকে গাড়ীতে করিয়া গড়ের মাঠ ইত্যাদি স্থানের মুক্ত বায়ুতে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত। প্রায় ছয় মাসকাল নিজবাটীতে বাস করিয়া ও সেবকের মনোবাঞ্ছা পুর্ণ করিয়া ১৬ই নভেম্বর তিনি জয়রামবাটী যাত্রা করেন।

মাতাঠাকুরাণী নিরাপদে জয়রামবাটীতে পৌছিয়াছেন এই সংবাদ পাইবার দুইতিন দিন পরেই (২৭শে নভেম্বর) তত্রত্য সেবককে শরৎ মহারাজ লিখিয়াছিলেনঃ "শ্রীমার বাতের কথা শুনিয়া ভাবিত আছি। একটু কমিয়াছে কিনা লিখিয়া সুখী করিবে। আর একটি

ছোট শিশিতে করিয়া বাঘের চর্বির তেল শীঘ্র পাঠাইব। শুনিলাম উহা বাতের খুব ভাল; মালিস করিতে হয়। শ্রীশ্রীমাকে যোগীন-মার, আমার ও এখানকার সকলের সভক্তি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবে। তিনি এখান হইতে যাওয়াতে সব শূন্য হইয়া রহিয়াছে। যদি শ্রীশ্রীমাকে ফাল্‌গুনে আনিতে পার তো বড় ভাল হয়। এই বাত বাড়িয়াছে—শীতকালে না জানি কত কষ্ট হইবে।"

অন্তরঙ্গ আপ্তজনের অন্তরের টান উপেক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীমা অধিক দিন দেশে বাস করিতে পারিলেন না। শীঘ্রই তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং এখন হইতে অধিকাংশ সময় এখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমা দেশে থাকিতে পুজনীয় শরৎ মহারাজ তাঁহার জন্য কিরূপ ব্যাকুল ও চিন্তান্বিত থাকিতেন, তল্লিখিত আরও অনেক পত্রে ইহার কিছু কিছু নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। একজনকে[৩] তিনি লিখিয়াছিলেন (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩): 'চা১০ দিনেরও অধিক হইল শ্রীশ্রীমার কোন সংবাদ না পাইয়া আমরা সকলে বিশেষ চিন্তিত আছি। তিনি কেমন আছেন জানিয়া সত্বর সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবে। প্রতি সপ্তাহে তাঁহার শারীরিক কুশলসংবাদ পত্রদ্বারা জানাইতে ভুলিও না। ..তিনি শারীরিক কুশলে থাকিলে সপ্তাহে সপ্তাহে সংবাদ দিবে এবং শরীর পুনরায় অসুস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ জানাইবে ও প্রতিদিন বা একদিন অন্তর একখানি করিয়া পত্র দিবে।' এক সপ্তাহ পরে ঐ ব্যক্তিকেই পুনরায় লিখিয়াছেন: 'শ্রীশ্রীমার জর পুনরায় হইয়াছিল জানিয়া ভাবিত রহিলাম। কারণ, আবার না হয়। যাহা হউক, তোমরা সকলে তাঁহার নিকটেই আছ এবং সর্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছ, ইহাতে অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। তজ্জন্য তোমার ও তোমার পরিবার-

৩ কোয়ালপাড়ার কেদারনাথ দত্ত।

বর্গের এবং…শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত ছেলেদের সর্বতোভাবে কল্যাণ হউক, ইহাই ৺ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি।' বারান্তরে আর একজনকে[৪] লিখিয়াছিলেন, 'তোমাদের ভরসাতেই মাকে দেশে পাঠাইলাম।'

* * *

মাতাঠাকুরাণী তাঁহার ভাইদিগকে আশৈশব মানুষ করিয়াছিলেন এবং বরাবরই স্নেহযত্ন করিতেন। সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় ভাইয়েরাও তাঁহাদের দিদির উপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়ের মৃত্যুকালে মা যখন তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হন ও শিয়রে বসিয়া আদরে পালিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করেন, তখন অভয় দিদির চক্ষুতে চক্ষু রক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এরা সব রইল, এদের তুমি দেখো।' অভয়ের স্ত্রী সুরবালা তখন অন্তঃসত্ত্বা। স্বামিশোকে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে ও সেই অবস্থায় তিনি এক সুকুমারী প্রসব করিলে প্রসূতি ও প্রসূতা উভয়েরই জন্য মা চিন্তান্বিত হন। ভাইয়ের অন্তিম কথা স্মরণ করিয়া ও ঠাকুরের ইচ্ছা জানিয়া মা এই কন্যাটির প্রতিপালনভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি সুরবালা ও তাঁহার কন্যা রাধারাণী বা রাধুকে অবলম্বন করিয়া অসংসারী মায়ের এক সংসার গড়িয়া উঠে।

ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রসন্নকুমারের দুই কন্যা নলিনী ও মাকু (সুশীলা) বয়সে রাধুর বড় ছিল এবং রাধুর বিবাহের পূর্বেই তাহাদের বিবাহ হয়। নানা কারণে নলিনীর শ্বশুরগৃহে থাকা সম্ভবপর হয় নাই এবং তাহার জননীর মৃত্যুর পর পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করায় বিমাতার গৃহে বাসও কষ্টকর হইয়া পড়ে। অগত্যা শ্রীশ্রীমা নলিনীকে নিজের কাছেই স্থানদান করেন। মাকুর অবস্থাও নলিনীর প্রায়

৪ শ্রীনলিনবিহারী সরকার। ইনি তখন ফুলুই-শ্যামবাজারে থাকিয়া ডাক্তারী করিতেন।

অনুরূপ হওয়ায় তাহাকেও অধিকাংশ সময় নিজের কাছে রাখিতেন। এইরূপে মায়ের সংসার ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

শ্রীশ্রীমা যখন কলিকাতাদি স্থানে গমন করিতেন তখন রাধু ও তাহার গর্ভধারিণী ব্যতীত নলিনী, মাকু, ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেব, প্রতিবেশিনী ভানুপিসী প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন; ক্বচিৎ কোন ভ্রাতৃবধূ সন্তানাদি সহ দলবৃদ্ধি করিতেন; আবার শ্বশুরকুলের আত্মীয়েরাও সময়ে সময়ে আসিয়া তুইচারি দিন তাঁহার কাছে অবস্থান করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বিরাট ভক্ত-সংসারও গড়িয়া উঠিতে-ছিল; দেশে বা কলিকাতায় বা অন্যত্র যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, প্রবাহাকারে ভক্তগণের ভিড় লাগিয়াই থাকিত।

শ্রীশ্রীমায়ের সেবা বলিতে প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের সকলেরই সেবা—ইঁহাদের সকলের তত্ত্বাবধান এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও মনস্তুষ্টি-বিধান। মহাশক্তি-ধর আধিকারিক পুরুষ ব্যতীত অপর কেহই একাজের যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না। স্বামী সারদানন্দ এই গুরু দায়িত্ব বহন করিবার শক্তি ও অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে জনৈক ভক্ত সন্তানকে মাতাঠাকুরাণী একদিন বলিয়াছিলেন, 'শরৎ যে কদিন আছে আমার ওখানে [কলিকাতায়] থাকা চলবে। তারপর আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে, দেখি না। যোগীন ছিল।···শরৎটি সর্বপ্রকারে পারে—শরৎ হচ্চে আমার ভারী। রাখাল শরৎ টরৎ এরা সব আপনার শরীর থেকে বেরিয়েচে [অর্থাৎ অন্তরঙ্গ]।' ভক্তটি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ পারেন না?' মা কহিলেন, 'না, রাখালের সে ভাব নয়—ঝঞ্ঝাট বইতে পারে না। মনে মনে পারে, কি কারুকে দিয়ে করাতে পারে—রাখালের ভাবই আলাদা।' 'বাবুরাম মহারাজ?' 'না, সেও পারে না।' 'মঠ চালাচ্চেন যে?' 'তা হোক, মেয়ে-মানুষের ঝঞ্ঝাট! দূর থেকে খবর নিতে পারে।···এই রাধুর বিয়ের কথা—এটি আমার

বোঝা। অনেক ভক্ত সাহায্য কত্তে পারে দশহাজার টাকাও দিতে পারে, আপন মায়ের বোঝা কে মনে কচ্চে? আপনার জন কটি আর?—দুচারটি। ঠাকুর বলেছিলেন, কটিই বা অন্তরঙ্গ!'

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার নামে শ্রীশ্রীমায়ের জনৈক মন্ত্রশিষ্য একদা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া মায়ের বাড়ীতে আসেন এবং তাহাকে দীক্ষিত করিবার জন্য মাকে অনুরোধ করেন। মা তাঁহার নিজের শরীর অসুস্থ বলিয়া কিছুদিন পরে আসিতে বলিলেও সুরেনবাবু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেইদিনই দীক্ষা দিবার জন্য নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিয়া বসেন। তাহাতে মা বলেন, 'আচ্ছা, শরতের কাছে যাও, সে যা ব্যবস্থা করবে তাই হবে।' 'আমরা আর কাউকে জানিনা, এক আপনাকেই জানি'—ইত্যাকার কথা সুরেনবাবুর মুখে শুনিয়া মা কহিলেন, 'বল কি? শরৎ আমার মাথার মণি! সে যা ব্যবস্থা করবে তাই হবে।' অগত্যা তাঁহারা শরৎ মহারাজের কাছে যাইয়া দীক্ষার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তিনিও মার শরীর অসুস্থ বলিয়া আপত্তি জানাইলেন। তারপর মার মুখের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, 'মা এই বলেচেন? আচ্ছা, তোমরা অমুক দিন প্রস্তুত হয়ে আসবে।'

শ্রীশ্রীমা তাঁহার যোগ্যতম সেবককে এত করিয়া মান দিলেও আমাদের কল্পনাতীত এক অদ্ভুত নিরহঙ্কার ভাব লইয়া জগন্মাতার এই বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করিতেন। সত্য সত্যই তিনি নিজেকে মায়ের দ্বারী জ্ঞান করিতেন। একবার এক অপরিচিত ভদ্রলোক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিচয়-জিজ্ঞাসু হইলে তিনি ঐ 'দারোয়ান' পরিচয়টিই দিয়াছিলেন এবং তাহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র না থাকায় ভদ্রলোকটিও তাঁহাকে বাড়ীর দারোয়ান বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় নামে মেডিকেল স্কুলের ছাত্র এক যুবা হ্যারিসন রোড হইতে সপ্তাহে একবার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসিত। একদিন বেলা প্রায় তিনটার সময় পায়ে হাঁটিয়া ও ঘামিয়া সে আসিয়াছে, সরাসরি উপরে চলিয়া যাইবে এমন সময় দেখিতে পাইল, স্বামী সারদানন্দ সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। 'এখন মার কাছে যেতে দেব না, তিনি এইমাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরেচেন' —এই কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া সে আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না, তাঁহার বিশাল দেহে এক ধাক্কা দিয়া, 'মা কি একা আপনার ?' বলিয়াই উপরে যাইতে উদ্যত হইল। মহারাজ একপাশে সরিয়া গেলেন। কিন্তু উপরে যাইয়া মাকে প্রণাম করিতেই যুবকটির মন কেমন হইয়া গেল এবং নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া মায়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া সে কহিল, 'মা আজ এক মহা অন্যায় করে ফেলেচি, আমার কি হবে ?' মাদুর পাতিয়া বসিতে দিয়া এবং নিজেও এক পাশে বসিয়া মা পাখা লইয়া হাওয়া করিতে গেলেন, কিন্তু সে পাখাখানি টানিয়া লইয়া নিজেই হাওয়া করিতে ও কৃতাপরাধের কথা বারবার ব্যক্ত করিতে লাগিল। মা কহিলেন, 'অপরাধ কি বাবা, ছেলের আবার অপরাধ কি ? আচ্ছা, আমি শরৎকে বলে দেব সে যেন তোমার উপর খুসী হয়।' সিঁড়ি দিয়া সসঙ্কোচে নামিতে নামিতে কেবলই সে ভাবিতেছিল, আজ শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা না হইলেই বাঁচি। শরৎ মহারাজ কিন্তু সিঁড়ির নীচে পূর্ববৎ দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাহাকে দেখিয়া মৃদুমধুর হাসিতেছিলেন। সে প্রণাম করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতেই তিনি হাতে ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন ও বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, 'অপরাধ আবার কি ? এমন ব্যাকুল না হলে কি তাঁর দেখা পাওয়া যায় ?' [প্র]

একদিন শরৎ মহারাজ দপ্তর খুলিয়া লিখিবার উপক্রম করিতেছেন

এমন সময় সুরেন্দ্রকান্ত সরকার নামে শ্রীশ্রীমার এক মন্ত্রশিষ্য ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তিনি সুরেনবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমাকে যে এত বড় প্রণামটা করচ এর মানে কি বল তো?' 'সে কি মহারাজ, আপনাকে করব না তো কাকে করব?' প্রণত ব্যক্তির মুখে এই উত্তর শুনিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, 'তুমি যাঁর কাছে যাও ও যাঁর কৃপা পেয়েচ, আমিও তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে এখনই আমার এই আসনে বসিয়ে দিতে পারেন।'

১১

লীলা-ভাষ্য প্রণয়ন ঃ প্রণেতার নিজানুভূতি

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই স্বামী সারদানন্দের শ্রেষ্ঠ কীর্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ রচনা আরম্ভ হয়। মাতাঠাকুরাণীর অনুমতি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তিনি উহাতে আত্মনিয়োগ করেন এবং কিঞ্চিন্ন্যূন দশ বৎসরে ঐ মহাগ্রন্থের পাঁচখণ্ড লেখা সম্পূর্ণ করেন। নভেম্বর মাস হইতে তৎসম্পাদিত উদ্বোধন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে উহা প্রকাশিত হইতে থাকে।

লীলাপ্রসঙ্গ লেখার উদ্বোধক কারণ সম্বন্ধে নিজমুখে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ উদ্বোধনে ছাপাবার জন্যে ঠাকুরের সম্বন্ধে তখন নানারূপ প্রবন্ধ আসত। সবগুলিই এত অধিক ভ্রমপূর্ণ যে কেটে ছেঁটে সম্পূর্ণ নূতন করে লিখতে হত। আমার কেবলই মনে হত, আমরা থাকতেই এতটা ভুল ধারণা প্রচার হবে? তা ছাড়া, মাষ্টার মশায় তখন খুব বলে বেড়াতেন, ওরা ঠাকুরের প্রকৃত জীবন ভুলে অন্য পথে চলেচে। সেকথায় খুব রাগ হয়েছিল। ঐ দুই ঘটনা ঠাকুরের জীবনী লেখার প্রধান হেতু। [প্র]

গ্রন্থকার কেবলমাত্র 'প্রধান হেতু' ব্যক্ত করায় আনুষঙ্গিক অনেক হেতুই বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়। আমরা শুনিয়াছি যে, ঠাকুরের একান্তভক্ত গিরিশবাবু লীলাপ্রসঙ্গ রচনায় প্রবৃত্ত হইতে তাঁহাকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের তত্ত্ব—তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার সাধনারহস্য ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বামিজী কিছুই না লিখিয়া যাওয়ায় এবং শক্তিমান অধিকারী অপর কেহ ঐ কার্যে হস্তক্ষেপ না করায় ঠাকুরের সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ও ভ্রান্ত মতবাদসমূহ প্রচারিত হইবে যাহার ফলে

গণ্ডীবদ্ধ উপদলসমূহ সৃষ্ট হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহার নরলীলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিবে—গিরিশবাবু এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐরূপ আশঙ্কার সঙ্গত কারণও দেখা দিয়াছিল। আমরা সকলেই জানি যে, ঠাকুরকে বকলমা-দান বা ভার-সমর্পণ গিরিশবাবুর জীবনে এক অপূর্ব ঘটনা। এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কিছুকাল যাবৎ প্রচারিত হইতেছিল যে, সাধনভজন ইত্যাদি কষ্টসাধ্য ব্যাপারের কিছুমাত্র প্রয়োজন এযুগে নাই ; কেহ যদি 'রামকৃষ্ণ, আমি তোমাকে বকলমা দিলাম' এই কথাটি একবারমাত্র বলিতে পারে, তাহা হইলে উহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে—তাহার ইহপরকালের সকল দায় ঠাকুর গ্রহণ করিবেন, যতই দুষ্কৃতকারী সে হউক না কেন। বকলমা দান যে আদৌ মুখের কথার ব্যাপার নহে, বহু তপস্যার, বহু সাধনার অন্তে স্বতই সাধক জীবনে বকলমা-দানের অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, উৎসাহের আধিক্যে এই কথাটি তলাইয়া বুঝিবার মনোবৃত্তিরও যেন অভাব ঘটিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, পুস্তকাকারে প্রকাশিত লীলাপ্রসঙ্গের প্রথম অধ্যায়েই ('শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে') স্বামী সারদানন্দ গিরিশের বকলমা-দানের কথা উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারই জীবন বিশ্লেষণ করিয়া অত্যন্ত নিপুণতার সহিত উহার রহস্যভেদও করিয়াছেন। শরৎ মহারাজের মুখে শুনিয়াছি, বকলমা-সম্পর্কিত বর্ণনাটি গিরিশবাবুকে তিনি পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন এবং গিরিশবাবুও উহা ঠিক ঠিক হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে উদ্বোধনের ভূতপূর্ব প্রকাশক স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দের নিকট শুনিয়াছিলাম, লীলাপ্রসঙ্গ পড়িয়া গিরিশবাবু এতই মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, উহার একটি শব্দও পরিবর্তিত করা চলে না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেন।

কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতর থাকিয়া লীলাপ্রসঙ্গ রচনা করিতে

হইয়াছিল সেই কথা শরৎ মহারাজ একদিন নিজমুখে এইরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন,—তখন (১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের রথযাত্রার সময়) তিনি ৺পুরীর 'শশী নিকেতন' নামক বাটীতে ছিলেন : "যখন লীলাপ্রসঙ্গ লেখা হয় তখন কতদিকে গণ্ডগোল ছিল। মা উপরে রয়েচেন, রাধু রয়েচে, ভক্তের ভিড়—হিসাবপত্র রাখা —আবার বাড়ী তৈরি করায় অনেক টাকা ধার হয়েচে। নীচের ছোট ঘরটিতে বসে লীলাপ্রসঙ্গ লিখচি। তখন কেহ আমার সঙ্গে কথা কইতে সাহস পেত না। আমার অনেকক্ষণ ধরে কথা কইবার সময়ই ছিল না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলে 'চটপট সেরে নাও' বলে সংক্ষেপে শেষ করতুম। লোকে মনে করত, ভারী অহঙ্কারী। এই বাড়ীতে (শশী নিকেতনে) বসে লীলাপ্রসঙ্গ লিখেচি কয়েক খণ্ড (অধ্যায়)। ভক্তদের সম্বন্ধে কিছুই লেখা হয়নি, ঠাকুরের সম্বন্ধে লেখবার অন্ত নাই। মনটা লেখবার মত হলে লেখা যেত।" 'শশী নিকেতনে' বসিয়া লিখিত 'মধুরভাবের সারতত্ত্ব' শীর্ষক অধ্যায়টিকে গ্রন্থকার নিজে লীলাপ্রসঙ্গের সর্বাপেক্ষা সুলিখিত অধ্যায় মনে করিতেন।

লীলাপ্রসঙ্গে স্বামিজী ও গোপালের মা ব্যতীত ঠাকুরের অপরাপর বিশিষ্ট পার্ষদগণের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় নাই, এবং ঠাকুরের অন্ত্যলীলার বর্ণনাটিও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে দেখা যায়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শরৎ মহারাজ যখন ৺কাশীতে ছিলেন, তখন এক দিন বুড়োবাবা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'লীলাপ্রসঙ্গখানা পুরো করে ফেলুন,।' তিনি উত্তর দেন, 'আর বোধ হয় হবে না। সেরূপ প্রেরণাই পাচ্চি না। ঠাকুরের যতটুকু ইচ্ছা ছিল করিয়ে নিয়েচেন। এখন লীলাপ্রসঙ্গ পড়লে মনে হয়, এসব কি আমি লিখেচি? অবাক হয়ে যাই। এখন আর কিছু করতে ইচ্ছা হয় না। সবই যেন, মনে হয়, তিনি করচেন।'

লীলাপ্রসঙ্গ ঠাকুরের জন্মকথা হইতে আরম্ভ করিয়া ধারাবাহিক-ভাবে লিখিত হয় নাই। উহার প্রথম দুই খণ্ডে প্রধানতঃ তাঁহার গুরু-ভাবের কথাই বলা হইয়াছে; তৃতীয় খণ্ডে সাধকভাব সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে; এবং চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে যথাক্রমে ঠাকুরের বাল্য-জীবন ও ভক্তগণের বিশেষতঃ স্বামিজীর সহিত মিলন-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমেই গুরুভাব লিখিবার কারণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন: "ঠাকুরের ভাবমুখে অবস্থান এবং তাঁহাতে গুরুভাবের স্বাভাবিক বিকাশপ্রাপ্তি এই বিষয়টি প্রথমে না বুঝিতে পারিলে তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র, অদৃষ্টপূর্ব মনোভাব এবং অসাধারণ কার্যকলাপের কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না বলিয়াই আমরা ঐ বিষয় পাঠককে সর্বাগ্রে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম।" [লী ২। নিবেদন]

গুরুভাব পরমদেবতা ঈশ্বরের ভাব। সুতরাং ঠাকুরের ঐশ্বরিক ভাব বা ঈশ্বরত্বকে কেন্দ্র করিয়াই লীলাপ্রসঙ্গ বিরচিত হইয়াছে। ঐরূপ হইলেও কিন্তু নরদেহী ঠাকুরের মানবীয় ভাবকে মোটেই উপেক্ষা করা হয় নাই। গ্রন্থকার বলিয়াছেন: "প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতারচরিত্রের মানবভাবটি ঢাকিয়া চাপিয়া দেবভাবটির আলোচনাই করা হইয়াছিল। সন্দেহশীল বর্তমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটির আলোচনাই চলিয়াছে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ঐ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তদুভয় ভাব যে একত্র একই কালে বিদ্যমান থাকে এই কথাই পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস করিব। বলা বাহুল্য, দেবমানব ঠাকুরের পুণ্যদর্শন জীবনে না ঘটিলে অবতার-চরিত্র ঐরূপে দেখিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না।" [লী ৩।১]

এই মহাগ্রন্থে ঠাকুরের অলৌকিক জীবন বেদান্ত-পুরাণ-তন্ত্রাদি সর্বশাস্ত্র-সহায়ে অনুশীলিত হইয়াছে, এবং তাঁহার অসাধারণ মনোভাব

ও কার্যকলাপ অপরাপর অবতারখ্যাত মহাপুরুষগণের মনোভাব ও কার্যকলাপের সহিত তুলনায় আলোচিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের উপলব্ধিসমূহ কিরূপে সর্বশাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণিত করিয়া উহাদিগকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে বা সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে, এবং বিভিন্ন যুগের মহাপুরুষগণের জীবনে অভিব্যক্ত বিভিন্ন ভাবসমূহের সমষ্টি ও তদতিরিক্ত যুগোপযোগী ভাব শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে একাধারে অভিব্যক্ত হইয়া কিরূপে তাঁহাকে 'অবতারবরিষ্ঠ' করিয়াছে—এই সকল কথা অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও উপলব্ধিজনিত অন্তর্দৃষ্টির সহিত নিপুণভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের কলেবরে উহার বিস্তৃত আলোচনা কখনই সম্ভবপর নহে। তবে এই কথাটি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, শাস্ত্রানুকূল যুক্তির সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা মনন করিতে যাঁহারা অভিলাষী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে পরম পাথেয়স্বরূপ হইয়াছে। ইহার অনুশীলনে ঠাকুর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্বের মূর্ত প্রকাশরূপে প্রতিভাত হইবেন, সর্বশাস্ত্রের সারমর্ম সহজেই অধিগত হইবে, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে অভিনীত শ্রীভগবানের বিভিন্ন নরলীলার মাধুর্যও বহুল পরিমাণে আস্বাদিত হইবে। শ্রীরাম-কৃষ্ণ-জীবনের ন্যায় মহদুদার ভাবরাজিতে পরিপূর্ণ এই মহাগ্রন্থ সাধকের ব্যক্তিগত ভাব ও ইষ্টনিষ্ঠার ব্যাঘাত না ঘটাইয়া বরং উহার গভীরতাই সম্পাদন করিবে এবং জগতের ধর্মসাহিত্যের ভাণ্ডারে অতুলনীয় সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হইয়া শেষদিন পর্যন্ত মানবজাতির কল্যাণ করিতে থাকিবে।

শ্রীশ্রীসারদামাতা তাঁহার বরপুত্র শ্রীসারদানন্দ কর্তৃক লিখিত এই গ্রন্থখানির প্রতি অনুরাগসম্পন্না ছিলেন। তিনি কলিকাতায় থাকিলে শরৎ মহারাজ স্বয়ং তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেন, আর যোগীন-মার পাশে বসিয়া একমনে তিনিও শ্রবণ করিতেন। তিনি দেশে থাকিলে

উদ্বোধনে প্রকাশিত লীলাপ্রসঙ্গ সাধারণতঃ কাহারও দ্বারা পাঠ করাইয়া শুনিতেন। মার জীবনের যেসব ঘটনা লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল ঘটনার খুঁটিনাটি তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে যোগীন-মার মধ্যবর্তিতায় শরৎ মহারাজ জানিয়া লইয়াছিলেন। তাই মা বলিতেন, 'শরতের বইয়ে সব ঠিক ঠিক লিখেচে।' লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর জনৈক উচ্চশিক্ষিত ভক্ত [১] বলিয়াছিলেন, 'মা, শরৎ মহারাজ কি সুন্দর বইই না লিখেচেন।' মা উত্তর দিলেন, 'শরতের বই বুঝতে বিদ্যাবুদ্ধির দরকার করে।'

স্বামিজীর জীবনের শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাকুরের তিরোভাবের পুর্ব পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলী শরৎ মহারাজ লীলাপ্রসঙ্গে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। স্বামিজীর জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনার সংঘাত, তাঁহার পাশ্চাত্য যুক্তিবাদে পুষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির দ্বন্দ্বময় রূপ, তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসা এবং তাঁহার উপর ঠাকুরের দিব্যস্পর্শ হইতে সঞ্জাত অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির প্রভাব, ইত্যাদি—এমন সহানুভূতির সহিত ও সুনিপুণ তুলিকায় তিনি চিত্রিত করিয়াছেন যে, অপর কাহারও পক্ষেই এই কাজ সম্ভবপর ছিল বলিয়া মনে হয় না। আর উহা হইতে তিনি যে স্বামিজীর কতখানি অন্তরঙ্গ ছিলেন তাহাও কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি হয়।

লীলাপ্রসঙ্গের ভাষার শৈলী অনেকটা গ্রন্থকারের নিজস্ব। আলোচনার বিষয়বস্তু যেখানে জটিল ও দুরবগাহ ভাষাও সেখানে গুরুগম্ভীর ; আর যেখানে কেবলমাত্র লীলাংশের বর্ণনা, ভাষা সেখানে অপেক্ষাকৃত লঘু। উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা উপলব্ধির বিবৃতি দিতে যাইয়া কোথাও ভাষা বিন্দুমাত্র আড়ষ্ট বা অস্পষ্ট হইয়া পড়ে নাই। মনে হয় যেন প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুকে চক্ষের সম্মুখে রাখিয়াই তিনি উহার

১ বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন। নিজস্ব ভঙ্গীতে লীলাপ্রসঙ্গের ভাষা যেমন বলিষ্ঠ তেমনই শ্রীসম্পন্ন।

লীলাপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের জানা একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি। গ্রন্থকারের জীবিতকালে লীলাপ্রসঙ্গের পাঁচ খণ্ডের প্রত্যেকটির তিনচারিটি করিয়া সংস্করণ হইয়াছিল। শেষের দিকে গ্রন্থের কোন কোন স্থলে কিছু কিছু পরিবর্তন বা সংযোজনা দ্বারা পরিবর্ধন করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে ছিল, কিন্তু প্রকাশকের ত্রুটিতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে নাই। শেষবার ৺কাশীতে অবস্থানকালে দুঃখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'কখন যে বই ফুরিয়ে যায় আর কখন আবার ছাপা হয়, আমি জানতেও পারি না।' ঈপ্সিত সংযোজনার একটি স্থলও তিনি ঐ সময়ে উল্লেখ করিয়াছিলেন। ঠাকুর দাস্যভাব-সাধনকালে সহজ অবস্থায় সাদাচোখে মা-সীতার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং ঐভাবে জন্মদুঃখিনী সীতার সর্বাগ্রে দর্শন পাওয়াতেই বোধ হয় তাঁহারও জীবন দুঃখপূর্ণ হইয়াছিল, এই কথা বলিতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, সেই দর্শনের ফলে সীতার অতিমধুর হাসিটিও তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই হাসি প্রাপ্তির কথা লীলাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই। [প্র]

* * *

লীলাপ্রসঙ্গ প্রথম প্রকাশিত হইতে থাকার সময়ে এইরূপ একটি কথা উঠিয়াছিল যে, ঠাকুরের বিশেষ বিশেষ কার্য ও মনোভাবের বিবৃতিমাত্র না দিয়া গ্রন্থকার ঐসকলকে নিজে যেভাবে বুঝিয়াছেন তাহাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে নিজের বুদ্ধিবিবেচনাকেই ঠাকুরের দুরবগাহ চরিত্রের পরিমাপক করা হইয়াছে এবং পাঠক সাধারণের নিজের নিজের ভাবে তাঁহাকে বুঝিবার পথেও বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইয়াছে। তদুত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন: "বিষয় বিশেষ

ধরিতে ও বুঝিতে মানব চিরকালই তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সহায়তা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে এবং পরেও তদ্রূপ করিতে থাকিবে। ঐরূপ করা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। উহাতে একথা কিন্তু কখনই প্রতিপন্ন হয় না যে, গ্রাহ্য বিষয়াপেক্ষা তাহার মনবুদ্ধ্যাদি বড়। দেশ, কাল, বিশ্ব, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি সকল অনন্ত পদার্থকেই মানব, মন-বুদ্ধির অতীত জানিয়াও, পূর্বোক্তভাবে সর্বদা ধরিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ঐসকল পদার্থকে তাহার ঐরূপে বুঝিবার চেষ্টাকে আমরা পরিমাণ করাও বলি না, দূষণীয়ও বিবেচনা করি না।...মন ও বুদ্ধির সাধনপ্রসূত শুদ্ধতা ও সূক্ষ্মতার তারতম্যানুসারেই লোকে তাঁহাদের (লোকোত্তর পুরুষদিগের) দিব্যভাব ও কার্যকলাপ অল্প বা অধিক পরিমাণে বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে আমরা যতদূর বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি, সমধিক সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিকতরভাবে উহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। অতএব ঐ দেবচরিত্র বুঝিবার জন্য আমরা নিজ নিজ মনবুদ্ধির প্রয়োগ করিলে উহাতে দূষ্য কিছুই নাই; কেবল ঠাকুরের চরিত্রের সবটা বুঝিয়া ফেলিয়াছি—একথা মনে না করিলেই হইল।" [লী ২। নিবেদন]

সাধনপ্রসূত সূক্ষ্মদৃষ্টি বা অনুভূতির সাহায্যেই যে লীলাপ্রসঙ্গের গ্রন্থকার ঠাকুরের মনোভাব ও কার্যকলাপ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার নিজের স্বীকৃতি। সুতরাং বিচারশীল মন লইয়া অনুসন্ধান করিতে পারিলে, ঐ গ্রন্থের মধ্যেই যে তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনা ও উপলব্ধিসমূহের একটা আভাস পাওয়া যাইবে, একথা বলাই বাহুল্য।

নির্বিকল্প সমাধি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বার। এইরূপ একটা ধারণা অনেকের মনে ছিল যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘমধ্যে এক স্বামিজী ব্যতীত অপর কাহারও ঐ সমাধি হয় নাই, তবে সমাধির কাছাকাছি অবস্থা বা উচ্চাঙ্গের ধ্যানাবস্থা অনেকেরই হইয়াছে। কেহ কেহ আবার

বিপরীত মত পোষণ করিতেন।[২] এই বিষয়ে বাদানুবাদের ফলে একদিন শরৎ মহারাজের সেবক[৩] তাঁহার কাছে উপনীত হইয়া, তাঁহার নির্বিকল্প সমাধি হইয়াছে কিনা বলিতেই হইবে বলিয়া ধরিয়া বসেন। প্রথমতঃ পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলেও শেষে তিনি বলিয়াছিলেন, 'লীলাপ্রসঙ্গে নির্বিকল্প সমাধির বর্ণনা আছে তো? লীলাপ্রসঙ্গের কোন কথা আমি না জেনে লিখি নি।' [প্র]

আমাদের বেদান্তাধ্যাপক স্বামী জগদানন্দ, যিনি আজীবন ঐ শাস্ত্রের চর্চা করিয়াছেন ও নিরভিমান জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া বহুজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন, একদিন লেখককে বলেন: "শরৎ মহারাজের নির্বিকল্প সমাধি হইয়াছিল কিনা, আমি তো কিছুই শুনি নাই। কিন্তু লীলাপ্রসঙ্গ পড়িয়া, প্রত্যক্ষদর্শী পুরুষ ভিন্ন এইভাবে লিখিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বরং উহা পাঠের পর, এখন কেহ তাঁহার নির্বিকল্প সমাধি হয় নাই বলিলে বিরক্তি বোধ হয়।

"ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্যদের সম্বন্ধে অনেক পড়িয়া বা শুনিয়া থাকিলেও, শরৎ মহারাজ সম্বন্ধে মঠে আসিয়া অনেকদিন পর্যন্ত বিশেষ কিছু জানিতাম না। মনে করিয়াছিলাম, তিনি বোধ হয় তেমন উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। ঠাকুরের জন্মতিথি—লক্ষ্মণ মহারাজ পূজা করিতেছেন, আর আমি তন্ত্রধারক। যতক্ষণ পূজা চলিল, শরৎ মহারাজ আমার কাছে বসিয়া রহিলেন। ভিতরে এক অপূর্ব গম্ভীরভাব উপলব্ধি করিতে লাগিলাম—inexplicable (ভাষায় বুঝানো যায় না)। পূজা

---

২ ১৯১৬ অব্দের প্রারম্ভে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতি ঢাকায় গমন করেন ও সপ্তাহ দুই আর্মাণীটোলায় কাশিমপুরের জমিদারদের বাড়ীতে বাস করেন। সেখানে ভক্তমেলায় বাবুরাম মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরের কৃপায় এই দেহে নির্বিকল্প সমাধি, মহাভাব এসব হয়েচে।' শ্রীঅতুলচন্দ্র চৌধুরী তখন উপস্থিত ছিলেন।

৩ স্বামী অসিতানন্দ।

শেষ হইলে তিনি উঠিয়া গিয়া প্রসাদী চন্দনের এক টিপ আমার কপালে পরাইয়া দিলেন। তদবধি, কিছু না শুনিয়াও, ভিতরে আপনা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা জন্মাইতে লাগিল।" [প্র]

স্বামী সারদানন্দ যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের তিরোভাবের পূর্বকালীন একটি উক্তিতে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। জনসমক্ষে চাপা মানুষ শরৎ মহারাজের অন্তরের ঐশ্বর্য ব্যক্ত করিবার জন্যই যেন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, 'ভাই শরৎ, আমার যে ব্রহ্মবেদান্ত গোল হয়ে গেল। তুমি তো ব্রহ্মবিদ্যা জান, কি বল দিকি ?'

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ যথেষ্ট সাধনভজন করিতেন। তিনি একদিন একান্তে শরৎ মহারাজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলে মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'এটুকু উপলব্ধি হয়েচে যে সবই তিনি। এই যে পেছনে আলমারীটা আছে, এও তিনি।' ইহা ব্রহ্মের সগুণ ভাবের উপলব্ধি।

জগৎকারণ ব্রহ্মকে 'জগদম্বা' নামে নির্দেশ করিয়া 'ভারতে শক্তি-পূজা' গ্রন্থে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন : "জগদম্বা সগুণা এবং নির্গুণা উভয়ই। পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া বলিয়া ভারতের দর্শনকার যে দুই পদার্থ জগতের মূলে নির্দেশ করিয়াছেন, উহা একই বস্তুর একই কালে বিদ্যমান দুই বিভিন্ন ভাব বা প্রকাশবিশেষ। তবে দেশকালাবচ্ছিন্ন বা নামরূপাবলম্বনে সবাহ্যান্তর্জগৎ-উপলব্ধিকারী মানবমন একই কালে একেবারে জগদম্বার ঐ দুই ভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম। কারণ, মানবমন স্বভাবতঃ এমন উপাদানে গঠিত যে, উহা আলোকান্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি ভাবকে একত্রে একই সময়ে গ্রহণে অপারগ। সেজন্য দেশকালাবচ্ছিন্ন সগুণ ভাবের উপলব্ধির সময় সে জগদম্বার নির্গুণ ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না;

এবং সমাধি সহায়ে উচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া যখন সে জগন্মাতার নির্গুণ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে, তখন আর তাহার নয়নে তাঁহার সগুণ ভাবের ও সগুণভাবপ্রসূত জগতের উপলব্ধি হয় না। তবে সমাধিভূমি হইতে নামিয়া পুনরায় সাধারণভাব প্রাপ্ত হইলেও তাহার সমাধি-কালানুভূত জগদম্বার নির্গুণ ভাবের যে কতকটা স্মৃতি থাকিয়া যায়, তাহাতেই সে নিঃসংশয় বুঝিতে পারে, তিনি নির্গুণা ও সগুণা উভয়ই।"

জগদম্বার নির্গুণ ও সগুণ উভয়বিধ ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ উভয়বিধ ভাব সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইতে যিনি না পারিয়াছেন তাঁহার পক্ষে এরূপ সুস্পষ্ট বিবৃতি দান সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান অল্প; তথাপি যতটুকু দেখা আছে তাহাতে এই বিবৃতির জুড়ি কোথাও খুঁজিয়া পাই না।

জগন্নিয়ামক ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেকের মনেই একটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ধারণা বিদ্যমান। বেদান্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে কিছু বলেন না। অন্ততঃ বেদান্তের অদ্বৈতবাদপ্রতিপাদক প্রস্থানত্রয় পড়িয়া নিজে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন ধারণাই করিয়া উঠিতে পারি নাই। আর নির্গুণব্রহ্মমাত্র অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিপাদ্য হওয়ায় ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়া মাথা ঘামাইবার-ও উহার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। উহার বিচারে জগতের ন্যায় জগন্নিয়ামক বলিয়া কথিত ঈশ্বরও যদি মিথ্যা হইয়া পড়েন তাহাতে আপত্তির বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। অনেকে মায়ার ভিতর দিয়া দৃষ্ট বা মনবুদ্ধির সাহায্যে কল্পিত ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। ঐরূপ হইলে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব আরোপিত বস্তুমাত্র বা মিথ্যা হইয়া পড়ে।

মানববিগ্রহধারী ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে তাহার স্বরূপতত্ত্ব শুনিয়া

ও স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে ঘোষণা করিলেন ঃ "একমেবাদ্বিতীয়ং [ব্রহ্ম] নির্গুণ ও সগুণ ভাবে আপনাতে আপনি বিভক্ত থাকায় ইহাকেই শাস্ত্রে স্বগতভেদ বলিয়াছে, তাঁহাতে একটা আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তব্যাপী বিরাট আমিত্ব বিকশিত রহিয়াছে।...সেই বিরাট 'আমি'টা থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, আর সেই ভাবতরঙ্গই স্বল্পাধিক পরিমাণে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিতে পাইয়া মানবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমি'গুলো উহাকেই বাহিরের জগৎ ও বহির্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া ধরিতেছে ও বলাকহা ইত্যাদি করিতেছে।... বড় 'আমি'টার শক্তিতেই মানবের ছোট আমিগুলো রহিয়াছে ও স্ব স্ব কার্য করিতেছে, এবং বড় আমিটাকে দেখিতে ধরিতে পাইতেছে না বলিয়াই ছোট আমিগুলো ভ্রমে পড়িয়া আপনাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিমান মনে করিতেছে।...নির্গুণ ও সগুণের মধ্যস্থলে এইরূপে যে বিরাট আমিত্বটা বর্তমান উহাই 'ভাবমুখ'। কারণ উহা থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবের স্ফুরণ হইতেছে। এই আমিত্বই জগজ্জননীর আমিত্ব বা ঈশ্বরের আমিত্ব। এই বিরাট আমিত্বের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বলিয়াছেন—অচিন্ত্যভেদাভেদস্বরূপ জ্যোতির্ঘনমূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।" [লী ১।৩]

এই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী—"জীবন্ত, জাগ্রত, একমেবাদ্বিতীয়ম্, ইচ্ছা ও ক্রিয়ামাত্রেরই প্রসূতি অনন্তকৃপাময়ী জগজ্জননী"কেই ভক্ত ভজনা করিয়া থাকেন আপন আপন ভাবে। তিনি ভক্তের ভাবানুকূল রূপ ধারণ করিয়া থাকেন ও সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করেন। ভুক্তি, মুক্তি, ভক্তি— কিছুই তাঁহার প্রসাদ ভিন্ন লব্ধ হয় না।

লীলাপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, ঠাকুরের বেদান্ত-সাধনার গুরু সন্ন্যাসী তোতাপুরী বেদান্তোক্ত কর্মফলদাতা ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে ভক্তি ও উপাসনা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার

করিতেন না। ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি মায়াকে তিনি ভ্রমমাত্র বলিয়া জানিতেন এবং উহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব স্বীকারের বা উহার প্রসন্নতার জন্য উপাসনার আবশ্যকতা মানিতেন না। তাঁহার মতে, অজ্ঞান হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য সাধকের কেবলমাত্র পুরুষকারই অবলম্বনীয়; তজ্জন্য ঈশ্বর বা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের করুণা ভিক্ষার প্রয়োজন নাই—কেননা, উহা কুসংস্কারমাত্র।

এইরূপ ধারণাবশতঃ তোতাপুরী ভক্তের ভাববিহ্বল চেষ্টাদি দেখিলে সময়ে সময়ে বিদ্রূপ করিয়া বসিতেন। একদিন সন্ধ্যাসমাগমে ঠাকুরকে করতালি দিয়া 'হরিবোল হরিবোল' 'হরিগুরু, গুরুহরি', 'হরি প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন' ইত্যাদি বলিতে বলিতে শ্রীভগবানের স্মরণমনন করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আরে কেঁও রোটি ঠোকতে হো?' ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, 'দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করচি, আর তুমি কিনা বলচ আমি রুটি ঠুকচি!'

কিছুদিনের মধ্যেই পুরীজীর বলিষ্ঠ শরীরে রোগের সঞ্চার হইল—রক্তামাশয় হইয়া ক্রমে উহা কঠিনাকার ধারণ করিল। ঠাকুর ঔষধ-পথ্যের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু রোগের প্রকোপ তাহাতে বাড়িল বই কমিল না। মনকে সমাধিমগ্ন করিয়া তোতা দেহের যন্ত্রণা ভুলিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন যন্ত্রণা এতই বাড়িয়া গেল যে, শুইয়া বা বসিয়া কোন অবস্থায়ই সোয়াস্তি পান না। মনকে শরীর হইতে টানিয়া লইয়া সমাহিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পেটের যন্ত্রণায় মন সেইদিকেই ছুটিল—সমাধি ভূমিতে উঠিতে না উঠিতে নামিয়া পড়িতে লাগিল। পুরীজী শরীরের উপর ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং হাড়মাসের খাঁচাটাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া চিরতরে সকল যন্ত্রণার অবসান করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। বিশেষ যত্নে মনকে ব্রহ্মচিন্তায় স্থির রাখিয়া তোতা জলে নামিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য,

হাঁটিয়া প্রায় পরপারে চলিয়া আসিলেও কলিকাতার গঙ্গায় ডুব জল পাইলেন না। তখন অবাক হইয়া ভাবিলেন, 'একি দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার মত জলও আজ নদীতে নাই! একি ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা!'

"অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল। তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা, জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা, জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা— তুরীয়া, নিগুর্ণা মা! এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী মূর্তিতে অবস্থিত!—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ।" [লী ১।৮]

জগদম্বার অচিন্ত্য বিরাট রূপ দেখিতে দেখিতে তোতা গম্ভীর অম্বারবে দিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন। তৎপদে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়া সমস্ত রাত্রি মার নামে ও ধ্যানে কাটাইলেন। প্রাণ সমাধি-স্মৃতির অপূর্ব উল্লাসে উল্লসিত, শরীরে যন্ত্রণার অনুভবমাত্র নাই।

প্রভাতে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইলে তোতা রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করিয়া কহিলেন, 'রোগই আমার বন্ধুর কাজ করিয়াছে—কাল জগদম্বার দর্শন পাইয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্তও হইয়াছি। এতদিন আমি কি অজ্ঞই ছিলাম!...আমি এখন বুঝিয়াছি, তিনিই আমাকে এই শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন...এখানে আবদ্ধ

রাখিয়াছেন…।' ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'মাকে যে আগে মানতে না, আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যা 'ঝুট্' বলে তর্ক করতে! এখন দেখলে, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচে গেল। আমাকে তিনি পূর্বে বুঝিয়েচেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক নয় তেমনি।' [লী।১৮] তোতা জগদম্বার মন্দিরে গিয়া শ্রীমূর্তির সম্মুখে ভক্তিভরে প্রণত হইলেন।

"তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া" যাহা দেখিল, শ্রীগুরুপ্রসাদে গ্রন্থকারের মনও উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া একদিন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, নতুবা এমন জীবন্ত ভাষায় এমন জীবন্ত বর্ণনা সম্ভবে না।

একদিন স্বামী জগদানন্দ ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরীর 'জ্ঞানের পূর্ণতা'র অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে শরৎ মহারাজ 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥' এই শ্লোকটি মাত্র বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

আর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'বেদের একোঽহং বহু স্যাম্ আর তন্ত্রের কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব এক।' জগদানন্দজী অধিক বুঝিতে চাহিলে বলেন, 'সাধন না করলে বোঝা যাবে না।' [প্র]

* * *

অধিকারিভেদে ঠাকুর তাঁহার শিষ্যগণের প্রত্যেককে দিয়া এক বা একাধিক ভাবের সাধনা করাইয়াছিলেন। নিজেরা বিশেষ বিশেষ ভাবের সাধক হইয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ-তনয়েরা অল্পবিস্তর সর্বভাবেই জগৎকারণকে লইয়া আনন্দোপভোগ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের জীবনে ভাববিশেষের উপর অতিরিক্ত ঝোঁকবশতঃ গোঁড়ামি, বা অপর ভাবের উপর বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হইত না। কারণ তাঁহারা তাঁহাদের গুরুদেবের সর্বভাবসমন্বিত জীবনের জ্বলন্ত সংস্পর্শে

আসিয়াছিলেন, আর তাঁহারই কৃপায় সর্বভাবের মিলনভূমি 'ভাবাতীত ভাবে'রও আভাস পাইয়াছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ শক্তিসাধক ছিলেন। স্ত্রীমূর্তিতে জগন্মাতার বিভূতির বিশেষ প্রকাশ দেখিয়া প্রকৃত শক্তিসাধকেরা নারীমাত্রকে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন ও সিদ্ধাবস্থায় সকল নারীর ভিতর জগন্মাতার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন। স্বামী সারদানন্দও যে ঐরূপে ধন্য হইয়াছিলেন সেকথা স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 'ভারতে শক্তিপূজা' নামক গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখিয়াছেন : "যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছে তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তিকাখানি ভক্তিপূর্ণচিত্তে অর্পিত হইল।"

সারদানন্দ একসময়ে নিজেতে প্রকৃতিভাব আরোপ করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। জীবনের শেষের দিকে একবার যখন তিনি খুব অসুস্থ, সেই সময়ে ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষের নিকট মহাপুরুষ মহারাজ এই তথ্য প্রকাশ করেন। শরৎ মহারাজের রক্ত-প্রস্রাব হইতেছে শুনিয়া মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, 'দুর্গা, তুমি ভেবো না, ও স্ত্রীভাবে সাধনা করে ; ঠাকুরও করেছিলেন।'[৪] এই ভাব-সাধনায় সিদ্ধির ফলেই সম্ভবতঃ উত্তরকালে—মাতাঠাকুরাণীর তিরোভাবের পরে যখন স্ত্রীভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিতেন—নিজেদেরই একজন জ্ঞান করিয়া মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে তাঁহার সহিত কথা কহিতেন।

পুরুষাভিমানী ব্যক্তির লেখনীতে নারীচরিত্রের চিত্রণ বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ, প্রকৃত মনোভাবের প্রকাশক না হইয়া প্রায়শঃ উহা ঘটনাসমষ্টির প্রাণহীন বর্ণনামাত্র হইয়া দাঁড়ায়। লীলাপ্রসঙ্গে গোপালের মার জীবনকাহিনী যে অনুপম সুষমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, যোগীন-মা ও

৪ দুর্গাপদবাবু পরে শ্রীগুরুদাস গুপ্তকে কথাটি বলিয়াছিলেন।

গোলাপ-মা কথিত বৃত্তান্তগুলি যে মেয়েদের ভাষায় ও ভাবে অনবদ্য হইয়াছে, ইহার মধ্যেও গ্রন্থকারের প্রকৃতিসত্তার ছাপ বিদ্যমান।

বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে শরৎ মহারাজ বিভিন্ন ভাবের যেসব সঙ্গীত তদ্গতচিত্ত হইয়া গাহিতেন তাহাতেই তাঁহার জীবনে ঐসকল ভাবানুভূতির গভীরতা ফুটিয়া উঠিত। যেমন ৺জন্মাষ্টমীতে বাল-গোপালে বাৎসল্যভাবের গান, ৺রাসপুর্ণিমায় ব্রজগোপীর মধুরভাবের গান, দোলপুর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যলীলার গান, ইত্যাদি। একবৎসর রাস-পুর্ণিমার রাত্রে রাসের মেলা দেখিয়া 'শ্রীম' প্রায় নয়টার সময় মায়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—সঙ্গে দুইএকটি ভক্ত।[৫] নীচের ছোট ঘরটিতে শরৎ মহারাজ বসিয়া আছেন, উপরে শ্রীশ্রীমা রহিয়াছেন, শ্রীম কহিলেন, 'শরৎ মহারাজ, অনেকদিন তোমার গান শুনি নি, একটা গান গাও।' কিন্নরকণ্ঠে শরৎ মহারাজ গাহিলেন:

বাজিল বাঁশরী গো সই রাই বলে আজ নিকুঞ্জবনে।
তোরা কে কে যাবি আয় লো, শ্যাম-দরশনে॥
শুনিলে শ্যামের বাঁশী, মনপ্রাণ হয় উদাসী,
ইচ্ছা মনে হইগে দাসী শ্যামের চরণে॥

তখন হরিপাল পর্যন্ত রেলপথ খুলিয়াছে। শরৎ মহারাজ ও তুলসী মহারাজ হরিপাল হইতে হাঁটাপথ ধরিয়া মায়ের দেশে চলি-য়াছেন। আরামবাগ পৌঁছিবার পুর্বরাত্রে যে গ্রামে (তেলো-ভেলে?) তাঁহারা রাত্রিবাস করিলেন তথায় এক 'ডাকাতে' কালী আছেন। কালীমন্দিরে বসিয়া আপনভাবে শরৎ মহারাজ গান ধরিলেন:

তোর মুখ দেখে কি হয় না লো ভয়,
কোন্ গুণে মা বলে তোরে।
মায়ের কি ধার ধারিস বেটী,
মা বলাস তুই গায়ের জোরে॥

---

[৫] শ্রীমুকুন্দবিহারী সাহা শ্রীম'র সঙ্গে ছিলেন।

তুই কি বেটী মায়ের মতন,
মার মত কি জানিস যতন,
বল্ আবাগী কাঁদায় কে এমন ;—
পা চেপে তুই মারলি পতি
মত্ত মাগী নেশার ঘোরে ॥
তোর আঁধারবরণ বসন দশদিশি,
কবে কার তুই হলি হিতৈষী,
তোর বরণঘটায় পালিয়ে যায় নিশি ;—
(ওলো ও সর্বনাশী)
রাক্ষসী তুই খিদের চোটে
সৃষ্টি রাখিস উদরে ॥

বহু বৎসর পরের ঘটনা। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে, ঠাকুরের জন্মতিথির রাত্রে ব্রাহ্মমুহূর্তে, ৺কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে অনেকের 'সন্ন্যাস' হইয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড দালানটি নবীন ও প্রবীণ সন্ন্যাসীতে পরিপূর্ণ। শরৎ মহারাজ একটির পর আর একটি করিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়া চলিয়াছেন ; সকলে ধ্যানমগ্ন।

মায়ের বাড়ীতে শরৎ মহারাজের জনৈক শিষ্য[৬] তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরের কোন সন্ন্যাসী সন্তান সম্বন্ধে কথা কহিতেছিলেন। শিষ্যটি বলিলেন, 'তিনি তো ঠাকুরেরই সন্তান—তাঁর তো ঠাকুরের কৃপায় সবই হয়েছিল,…।' শরৎ মহারাজ কহিলেন, 'তুমি আমাদের কি মনে করেচ বল তো, যে আমাদের ভিতর সকলেরই সব কিছু হয়েচে? তিনি আমাদের ভিতর কাউকে কাউকে দুইএকটি বাদ রেখেচেন তা আমরা জানি। এই মনে কর না, আমাকেই, স্বামিজীকে যা দিয়েচেন তার একটি ঠাকুর দেন নি। (খানিক থামিয়া) তবে সেজন্যে, তাঁর কৃপায়, আমার দুঃখ রাখেন নাই—(শিষ্যের দিকে স্থিরভাবে তাকাইয়া) তোমাদের দেখে।'

৬ শ্রীনিখিলেশ্বর সান্যাল।

১২

মিশন পরিচালনা

কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের বাটী নির্মাণের সূচনা হইতেই শরৎ মহারাজের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। বাটী-নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর তিনি কলিকাতায় থাকিলে বরাবর ঐ বাটীতেই বাস করিতেন। কর্ম-প্রয়োজনে মাঝে মাঝে আসিয়া মঠেও দুইএক দিন থাকিতেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ যেদিন আসিতেন সেইদিনই কলিকাতায় ফিরিতেন। বাবুরাম মহারাজ ঐসময়ে মঠ পরিচালনা করিতেন ও মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার সহকারী ছিলেন।

দুঃস্থসেবাকার্যে প্রেরণ করিবার জন্য সেবক সংগ্রহ করিতে কখন কখন তিনি মঠে আসিতেন। মঠে তখন সাধুব্রহ্মচারীর সংখ্যা অধিক না থাকায় কোনরূপে মঠের কাজ চালাইবার মত লোক রাখিয়া বাকি প্রায় সকলকেই তখনকার মত ছাড়িয়া দিতে হইত।

প্রয়োজন দেখা দিলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামকৃষ্ণ মিশন বড় বড় রিলিফকার্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পুরী জেলায় বন্যাজনিত ভীষণ দুর্ভিক্ষে এবং তাহার পরের বৎসর চিল্‌কা হ্রদের মধ্যবর্তী দ্বীপসমূহে অজন্মাজনিত দুর্ভিক্ষে মিশনের কর্মীরা দীর্ঘকাল অন্নদানরূপ সেবাকার্য করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে রামকৃষ্ণ মিশন রেজিষ্টারী করা হয়। এই বৎসরেই 'যুগান্তর' পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ও মাণিকতলা বোমার মামলার আসামী দেবব্রত ও শচীন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিতে আসেন। মামলায় তাঁহারা নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলেন, মন্ত্রদীক্ষা দিয়া শ্রীশ্রীমা আপন স্নেহাঙ্কে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন,

তথাপি স্বামী সারদানন্দ ব্যতীত কর্তৃপক্ষস্থানীয় অপর কেহই তাঁহাদিগকে মঠভুক্ত করিতে সাহস পান নাই। শরৎ মহারাজ তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাদের কার্যের জন্য স্বয়ং দায়ী থাকিবেন বলিয়া মঠাধ্যক্ষ শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুমতিও আদায় করিলেন। আর কেবল এই দুইজনকেই নহে, পরে পরে এইরূপ আরও কতিপয় পথভ্রান্ত যুবককে মঠে স্থান দিয়া তিনি তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুপথে পরিচালিত করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ লিখিয়াছেন: "১৯১২ সালের মে কিংবা জুন মাসে একেবারে বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া উদ্বোধনে যোগদান করি।··· এখানে আসিবার পুর্বে তৎকালীন বিপ্লববাদী দলের সহিত সংস্রব থাকায় পুলিশের নজর আমাদের উপর খুবই ছিল।···আমি উদ্বোধনে আছি, এই সন্ধান পুলিশ পাইয়া গেল। ইহার কয়েকদিন পরেই উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মচারীর নিকট হইতে দেখা করিবার জন্য পুজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের নিকট খবর আসে। স্বামী সারদানন্দজী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া উক্ত পুলিশ কর্মচারীর সহিত দেখা করেন। ইহার ফলে আমাকে প্রায় দেড় বৎসর উদ্বোধন হইতে বাহিরে গিয়া থাকিতে হয়। স্বামী সারদানন্দজীর স্নেহভালবাসা ছিল অতুলনীয়। তাঁহার কৃপা না হইলে ঐসময়ে আমাদের মত বিপ্লববাদী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট যুবকের শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে আসা অসম্ভব হইত।"[১]

বিশ্বাস করিয়া যাঁহাদিগকে স্বামী সারদানন্দ এইভাবে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, বিশ্বাসভঙ্গের পরিচয় তাঁহাদের কেহই কোনকালে দিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। তাঁহাদের প্রতিভা ও কর্মশক্তি সঙ্ঘের কাজে নিয়োজিত হইয়া বিভিন্নক্ষেত্রে উহার প্রসার আনয়ন ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছে। দেবব্রত (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) অত্যন্ত

১ উদ্বোধন: শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা।

যোগ্যতার সহিত উদ্বোধনের সম্পাদকরূপে প্রায় তিনবৎসর এবং মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ ও ইংরাজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদকরূপে প্রায় চারিবৎসর কাজ করিয়া অকালে দেহরক্ষা করেন।

আশ্রয়দান ও আশ্রিতের পক্ষাবলম্বন হৃদয়বান সারদানন্দের স্বভাবগত ছিল। মঠের প্রাথমিক অবস্থায়, ঠাকুরের সম্পর্কে আসেন নাই এমন লোকের মঠে স্থান পাওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। অনেক দিন পরীক্ষার পর যদি বা কেহ স্থান পাইতেন, ঠাকুরের কোন ত্যাগী সন্তানকে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে হইত। সমর্থনকারিগণের অগ্রণী ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্র-মধ্যে স্বামিজী লিখিয়াছেন ঃ "পড়াশুনাটা বিশেষ করা চাই, বুঝলে শরৎ? মেলা মুখ্যু ফুখ্যু জড় করিস নি বাপু। দুটো চারটে মানুষের মত এককাট্টা কর দেখি।"

শরৎ মহারাজের হৃদয়বত্তার সঙ্গে স্বামিজী ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারই জন্য অনেক অযোগ্য লোকও মঠে স্থান পাইতেছে, এরূপ কোন অভিযোগের উত্তরেই সম্ভবতঃ উপরোধে পড়িয়া স্বামিজীকে ঐরূপ লিখিতে হইয়াছে। কিন্তু সে লেখার অন্তর্নিহিত সুর এতই সহানুভূতিপূর্ণ যে, শরৎ মহারাজের কার্যে স্বামিজী অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, বলিয়া তো মনেই হয় না, বরং তাহার বিপরীত ধারণাই জন্মায়।

বিশ্বাস করিয়া বিশ্বস্ত কর্মীর দল সৃষ্টি করিতে স্বামী সারদানন্দ অদ্বিতীয় ছিলেন। অখণ্ড বিশ্বাসে কাজে নিযুক্ত করিয়া তিনি সেবককে তাহার আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিতেন এবং পরে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়া তাহার সেই প্রবুদ্ধ শক্তিকে চরিতার্থ করিবার সুযোগ দিতেন। তিনি বলিতেন, ঠিক ঠিক বিশ্বাস কাহারও প্রতি হইলে কখনও সে অবিশ্বাসের কার্য করে না। একবার

নবাগত এক ব্যক্তির[২] হাতে তিনহাজার টাকা দিয়া তিনি তাঁহাকে দূরবর্তী সেবাকেন্দ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

* * *

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ৺কাশী হইতে সংবাদ আসিল, যোগীন-মার বিধবা একমাত্র কন্যা গনুর দুই পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। সেবাশুশ্রূষা ও অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য শরৎ মহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারীকে কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন। ছেলে দুইটি মৃত্যুমুখে পতিত হইল ও পুত্রশোকার্তা কন্যার জন্য যোগীন-মা বিচলিত হইয়া পড়িলেন। যোগীন-মার সংসারাশ্রম সুখের ছিল না; স্বীয় বৃদ্ধা জননীর সঙ্গে পিত্রালয়ে থাকিয়া তাঁহার সেবায় ও কঠোর তপশ্চর্যায় তিনি কালাতিপাত করিতেন। এইরূপ অবস্থাপন্না, ঠাকুরের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্তা ও মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গিনীগণের অগ্রগণ্যা বলিয়া, আবশ্যক হইলে যোগীন মহারাজ ও শরৎ মহারাজ তাঁহাকে দেখাশোনা করিতেন। বিশেষতঃ তিনি শরৎ মহারাজের আবাল্য পরিচিতা ছিলেন। যোগীন-মাকে সঙ্গে লইয়া শরৎ মহারাজ কাশীতে আসিলেন, কিন্তু তাঁহারা এখানে আসিবার কিছুদিন পরে গনুও কাশীপ্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর যোগীন-মা ও তাঁহার অন্যান্য দৌহিত্র-সন্তানগণকে সঙ্গে লইয়া শরৎ মহারাজ ১৯শে মার্চ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কলিকাতায় আসিবার পর যোগীন-মার দৌহিত্রগণ পিতৃগৃহেই বাস করিতেছিল। কিন্তু মাথাগরম জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের দুর্ব্যবহারে উহার কনিষ্ঠ ভাই তিনটি সেখানে টিকিতে পারিতেছে না ও তজ্জন্য যোগীন-মাকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখিয়া শরৎ মহারাজ পরে, ১৯১৫ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, উহাদিগকে নিজের কাছে আনিয়া রাখেন।

---

২ স্বামী হরানন্দ।

২০শে মার্চ বেলুড় মঠে ঠাকুরের সাধারণ মহোৎসব। শরৎ মহারাজ সকালবেলা মঠে আসিলেন ও পশ্চিমের বারান্দায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। বেলা বারটার সময় একবারমাত্র আসন ত্যাগ করিয়া সমস্ত মঠ বেড়াইয়া আসিলেন। প্রায় একটার সময় জনৈক ব্রহ্মচারীকে ডাকাইয়া আনিয়া ঠাকুরঘরের সিঁড়ির রেলিং ও পিলার দেখাইয়া কহিলেন, 'সিঁড়ি দিয়ে যেরূপ এলোমেলোভাবে লোক ওঠানাবা করচে, পিলার ভেঙে না লোক চাপা পড়ে।' পিলারের নিকট তুইটি ছেলেকে প্রহরী রাখা হইল। প্রায় একঘণ্টা পরে 'গেল গেল' রব উঠিল ও সেই ব্রহ্মচারী ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, পিলারটিকে পিছন করিয়া শরৎ মহারাজ রাস্তা আটকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—পিলার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ধীরশান্তভাবে মহারাজ হাত ধরিয়া ধরিয়া লোক নামাইয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুরঘর তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

১৯১১ অব্দের ১০ই জুন শ্রীশ্রীমার পালিতা কন্যা শ্রীমতী রাধারাণীর বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হয়। মায়ের আহ্বানে যোগীন-মা, গোলাপ-মা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী গমন করেন। বিবাহকালে সুযোগ বুঝিয়া বরপক্ষীয়েরা শরৎ মহারাজের নিকট হইতে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য মোটা টাকা দাবী করিয়া আদায় করিয়াছিল। কেদারনাথ দত্ত তাহাতে আপত্তি ও বিরক্তি-প্রকাশ করিলে মা কেদারনাথকে ডাকিয়া সরাইয়া লন।

জয়রামবাটী হইতে কলিকাতা ফিরিবার পথে শরৎ মহারাজ তুপুর বেলা কোয়ালপাড়া মঠে পৌছেন। কোতুলপুরের নিকটবর্তী থিরি গ্রামের ফজলু খাঁ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'গতি কি হবে? উপায় কি?' মহারাজ ঠাকুরঘরের বারান্দায়, আর ফজলু খাঁ নীচে অনতিদূরে মাধবীতলায় বসিয়া। তিনি উত্তর দিলেন, 'ভগবানের নামজপ ইত্যাদি কর।' ফজলু খাঁ কহিল, 'নামজপ

অনেকদিন তো করে আসচি, কিছুই তো হচ্চে না।' মহারাজ বলিলেন, 'নোঙ্গর ফেলে দাঁড় টানলে নৌকা এগোয় কি? তেমনি, সংসারে আসক্তি রয়েচে, তাই হচ্চে না।' ফজলু খাঁ কাতরভাবে কহিল, 'সাধু মহাপুরুষরা ইচ্ছা করলে সে আসক্তি কাটিয়া দিতে পারেন। আমি অনেক মুসলমান ফকিরের সঙ্গ করেচি, কিন্তু কোথাও শান্তি পাই নি। আমার বিশ্বাস, আপনি আমার কিছু করে দিতে পারেন।' তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া শরৎ মহারাজ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে মঠাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া তাহাকে ঠাকুরঘরের বারান্দায় নিজের কাছে বসাইয়া কথা কহিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া ফজলু খাঁ বাড়ী ফিরিল। [প্র][৭]

৯ই জুন পূজনীয় শশী মহারাজকে তাঁহার গুরুভ্রাতারা চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আনয়ন করেন। দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর মাদ্রাজে ঠাকুরের ভাব প্রচার করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ও তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহরক্ষার পর স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধনে লিখিয়াছিলেন: "বিগত ৪ঠা ভাদ্র, সন ১৩১৮—ইংরাজী ২১শে আগষ্ট, ১৯১১ খ্রীঃ—বেলা ১টা ১০ মিনিটের সময়, সাধারণের সুপরিচিত, মাদ্রাজস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অশেষ গুণালঙ্কৃত অধ্যক্ষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম প্রাচীন প্রচারক রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণ স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ মহারাত্রির নিবিড় অঞ্চলাবরণে মহাসমাধিতে সুখশয়ন লাভ করিয়াছেন।

"১৭৮৫ শকে স্বামিজী ইহ সংসারে আগমন করিয়াছিলেন এবং ১৮৩৩ শকে অভয়ধাম প্রাপ্ত হইলেন।...

"গুরুগতপ্রাণতা, উদ্দেশ্যের একতানতা, সেবাপরায়ণতা এবং

৭ স্বামী ধ্রুবানন্দ হইতে প্রাপ্ত।

জলন্ত ত্যাগ ও ঈশ্বরভক্তি একদিকে যেমন প্রিয়দর্শন স্বামিজীকে ভক্তের নিকট আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে আবার তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, শাস্ত্রজ্ঞান এবং সহানুভূতি ও সহৃদয়তা তাঁহাকে সংসার-দাবদগ্ধ জীবগণের নিকট আশা ও শান্তিপ্রদ আশ্রয়স্থল-স্বরূপে অবলম্বনীয় করিয়াছিল।"

অতঃপর সূত্রাকারে তাঁহার জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন, "বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তিনি কলিকাতা পৌঁছেন এবং ঐদিন হইতেই কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ও কবিরাজগণের হস্তে তাঁহার চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়। এইরূপে প্রায় আড়াইমাস কাল কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর অন্তর্গত···শ্রীরামকৃষ্ণ শাখামঠে [মায়ের বাড়ীতে] রোগের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া স্বামিজী সমাধিতে দেহ-রক্ষা করেন। সমাধিতেই যে তিনি দেহরক্ষা করেন তদ্বিষয় তাঁহার ঐকালে সর্বাঙ্গে অসাধারণ বহুকালব্যাপী পুলক দেখিয়াই তদীয় গুরুভ্রাতৃগণ অনুমান করিয়াছিলেন।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বিয়োগবেদনা অপসৃত হইতে না হইতে, ১৩ই অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা সিষ্টার নিবেদিতা দার্জিলিং শৈলে দেহত্যাগ করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সম্মিলিত হন।

এই বৎসরের মধ্যেই একদিন অপরাহ্নে শ্রেষ্ঠ ফরাসী গায়িকা, স্বামিজীর একান্ত অনুরাগিণী ও তাঁহার পূর্ব য়ুরোপ পরিভ্রমণের অন্যতমা সঙ্গিনী মাদাম কাল্‌ভে বেলুড় মঠ দেখিতে আসেন। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী শ্রীকুমুদবন্ধু সেন তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে স্বামিজীর মন্দির ও ঠাকুরঘর দর্শন করাইলেন এবং শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। ঠাকুরঘরে আসিয়া মাদাম স্বামিজীর মুখে শ্রুত আলোকে লইয়া যাওয়ার বৈদিক প্রার্থনাটি শুনিতে চাহিলে শরৎ মহারাজ সুর করিয়া আবৃত্তি

করিলেন : অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি ॥ স্বামিজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মাদাম ঠাকুরকে একটি গান গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন। পরদিন বিকালে কুমুদবাবু ও স্বামিজীর ভ্রাতা মহিমবাবু (মহেন্দ্রনাথ দত্ত) সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, মাদাম মঠের কর্তৃপক্ষকে দিবার জন্য শীলমোহর করা একখানি খাম তাঁহাদের হাতে দেন। কুমুদবাবু সেই খাম লইয়া আসিলে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'দেখ স্বামিজীর কি প্রভাব, এত বিলাসের মধ্যে থেকেও তাঁকে ভুলতে পারে নি!'

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ। স্বামিজীর জন্মতিথি-পূজার দিন সকালে তাঁহার ঘরের সম্মুখে বসিয়া শরৎ মহারাজ তানপুরা সহযোগে গাহিলেন,—'একরূপ অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কালহীন, দেশহীন সর্বহীন নেতি-নেতি বিরাম যথায়।' তারপরে 'মুঝে বারি বনোয়ারী সৈঁইয়া যানেকো দে' ও 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' গান দুইখানি গাহিয়া গিরিশবাবুরচিত 'নাচে বাহু তুলে ভোলা ভাবে ভুলে' গানটিও গাহিলেন। গানের পর স্বামিজীর কথা বলিতে বলিতে তিনি কহিলেন, 'যাঁরা কথায় কথায় বলেন, স্বামিজীকে আমরা মানি, তাঁরা কি অর্থে যে 'মানি' বলেন তা অনেক সময় বুঝতে পারি না। এই মানার অর্থ যদি এই হয় যে আমরা তাঁর পট পূজা করি, অবশ্যি সেও একরকম মানা বটে, কিন্তু প্রকৃত মানা হল, তাঁর আদর্শে জীবন গঠন করা—তাঁর প্রদর্শিত পথে অবিচলিতভাবে কাজ করা।'

এই বৎসর গঙ্গা-সাগর মেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য আরব্ধ হয়, এবং ৮ই ফেব্রুয়ারী ঠাকুরের বীরভক্ত নটকবি গিরিশচন্দ্র নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া ইষ্টপাদপদ্মে মিলিত হন। রুগ্নশয্যায় তাঁহাকে শরৎ মহারাজ প্রায় প্রত্যহ আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। একদিন প্রত্যুষে গিরিশবাবুকে যখন তিনি দেখিতে আসিয়াছেন, কুশলাদি জিজ্ঞাসার

পর তাঁহার একটু তাকিয়া হেলান দিয়া বসিতে ইচ্ছা হইল। যে তাকিয়া-টিতে বসিবেন মনে করিয়াছেন তাহার উপরে গিরিশের একটি হাতকাটা জামা রহিয়াছে দেখিয়া জামাটি তিনি অন্যত্র সরাইয়া রাখিলেন ও সরাইবার সময় নিজের মাথায় স্পর্শ করিলেন। গিরীশ উহা দেখিতে পাইয়া মৃদুহাস্য সহকারে, যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া নমস্কার করিলেন।

গভীর রাত্রে গিরিশের দেহত্যাগ হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর অতুলকৃষ্ণ সেই রাত্রেই দেহ শ্মশানে লইয়া যাইতে জেদ করেন। সকলে তাহাতে অমত প্রকাশ করিলে তিনি কহিলেন, 'আমি বাসিমড়া করতে দেব না, তবে এক শরৎ মহারাজ যদি বলেন তবে আমার আপত্তি নাই।' শরৎ মহারাজ সেকথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'ওঁদের শরীর বাসিমড়া হয় না। কেবল সাহিত্যিকেরাই নয়, ঠাকুরের অনেক ভক্তেরাও তাঁকে দেখতে আসবে।' নিজেও তিনি পরদিন সকালে দেখিতে গিয়াছিলেন।

উপর্যুপরি আঘাতে শরৎ মহারাজের মন অবসন্ন হইল এবং শরীরের উপর উহার প্রতিক্রিয়া হইতে অধিক বিলম্ব ঘটিল না—তাঁহার পায়ে বাত দেখা দিল। চিকিৎসকগণ উপদেশ দিলেন, সমুদ্রজলে পা ডুবাইয়া চলাফেরা করিতে হইবে। সুতরাং পুরীই প্রশস্ত স্থান বিবেচিত হইল। শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় থাকিলে বা শীঘ্র তাঁহার এখানে আসার সম্ভাবনা থাকিলে শরৎ মহারাজ অন্যত্র যাইতেন না; এবং শরৎ মহারাজ কলিকাতায় না থাকিলে মাতাঠাকুরাণীও এখানে আসিতে চাহিতেন না। একবার যখন শরৎ মহারাজ কাশীতে আছেন সেই সময়ে মার জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় আসিবার কথা হইয়াছিল; ভক্তেরা পুনঃপুনঃ চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন, কখন মা আসিবেন। মাকে সেই কথা নিবেদন করা হইলে তিনি উত্তর দেন, 'আগে শরৎ

আসুক, তারপরে যাওয়ার কথা। শরৎ কলকাতায় না থাকলে আমার যাওয়া সম্বন্ধে কোন কথাই হতে পারে না। শরৎ ভিন্ন আমার ঝক্কি পোয়াতে পারে এমন কে আছে?' [প্র] পুরী গমনে কিছু বিলম্ব ঘটিল। ১৯১৩ অব্দে ঠাকুরের জন্মমহোৎসব হইয়া যাওয়ার পর শরৎ মহারাজ পুরী যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহযাত্রী হইলেন যোগীন-মা, যোগীন-মার গর্ভধারিণী ও জনৈক ব্রহ্মচারী।

পুরীতে 'শশী নিকেতন' নামে বলরাম বসু মহাশয়দের বৃহৎ এক অট্টালিকা আছে। কলিকাতার বলরাম-ভবনের ন্যায় শশি-নিকেতনের দ্বারও ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের জন্য উন্মুক্ত থাকিত। শরৎ মহারাজ এখানেই অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন সান্ধ্যভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন সমস্ত বাড়ীখানি আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে, উঠানে তাঁবু পড়িয়াছে, দ্বারে সিপাহী বন্দুক হাতে পাহারা দিতেছে। বাড়ীর কর্মচারী আসিয়া জানাইল, বুঁদির রাজা বাড়ীখানিকে জবরদখল করিয়াছেন। শরৎ মহারাজ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী আসিয়া ইংরাজীতে কহিলেন, 'আপনারা নিজেদের মালপত্র লইয়া যাইতে পারেন।' মহারাজ উত্তর দিলেন, 'আপনি ভুল করিয়া থাকিবেন, এ বুঁদি নয়, খাস ইংরাজের রাজ্য।' সেক্রেটারী তখন দুই হাতে মহারাজের পাদস্পর্শ করিয়া পাণ্ডার কীর্তির কথা কহিলেন। রাজার জন্য পাণ্ডা এক ধর্মশালা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; তিনি ধর্মশালায় থাকিতে অসম্মত হওয়ায় এই বাটী দেখাইয়া দিয়াছে।

অপ্রত্যাশিত ও অবশ্যম্ভাবীকে মাথা পাতিয়া লইতে শরৎ মহারাজ কখনও কাতর হইতেন না। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া, সমুদ্র-তীরে বলরামবাবুদের যে আর একখানি বাড়ী ছিল সেখানে চলিয়া গেলেন। সেই রাত্রে মন্দির হইতে প্রসাদ আসিল এবং প্রসাদ পাইতে

বসিয়া প্রসন্নমুখে তিনি কহিলেন, 'রাজার উৎপাতে প্রসাদ পাওয়া—এ বড় কম কথা নয়।' এক সপ্তাহ পরে রাজ-অভিনয়ের উপর যবনিকা পড়িল, বাড়ী-ঘর পরিষ্কৃত হইতে আর এক সপ্তাহ কাটিল, মহারাজও শশি-নিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় পাঁচমাস পুরীবাস করিয়া শরৎ মহারাজ জুলাই মাসের শেষে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন—কাঁথি ও বর্ধমানে ভীষণ বন্যা হইয়াছে, সেবাকার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দামোদরের আকস্মিক প্লাবন বাঙ্গলার বুকে প্রলয়ের সূচনা করে, এবং অত্যন্ত দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন সহস্র সহস্র নরনারীর জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হন। মিশনের ইতিহাসে উহা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

কাঁথির ভগবানপুর থানায় রামকৃষ্ণ মিশন আট মাস ধরিয়া সেবাকার্য করিয়াছিলেন। তদানীন্তন বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য মিঃ পি. সি. লায়ন ২১শে নভেম্বর ভগবানপুর ক্যাম্প হইতে স্থানীয় কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে লিখিয়াছিলেন: 'আপনার মিশন এখানে যে অতি চমৎকার সাহায্যদান কার্য করিয়া যাইতেছেন উহার প্রতি আমার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য প্রেরণ করিলাম।'

গঙ্গা-সাগর মেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য এক বৎসর বন্ধ ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নূতন উৎসাহে উহা পুনরায় আরব্ধ হয়।

বৎসরের মধ্যভাগে শরৎ মহারাজ মূত্রাশয়ের পীড়ায় আক্রান্ত হন। শ্রীশ্রীমা তখন কলিকাতায় ছিলেন। পাছে মা চিন্তিত হন সেইজন্য ব্যাধির উৎকট যন্ত্রণা তিনি নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। মায়ের কিন্তু ভাবনার অন্ত ছিল না; উদ্বেগাকুলকণ্ঠে ভক্তদিগকে বলিতেছিলেন, 'কি হবে গো, আমার সৃষ্টিধর যে অসুখে পড়েছেন!' দশবার দিন পরে ব্যাধির উপশম হইল।

রোগমুক্ত হইয়া স্বামী সারদানন্দ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় 'আর্থার এ্যাভেলনে'র Principles of Tantra (তন্ত্রতত্ত্ব) গ্রন্থের সমালোচনা করেন। সমগ্র সমালোচনাটি এ্যাভেলন গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।[৪]

১৯১৫ অব্দে, ঠাকুরের জন্মোৎসবের কিছুদিন পরে, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় দুর্ভিক্ষ করাল মূর্তিতে দেখা দিল। সেবক সংগ্রহ করিতে শরৎ মহারাজ মঠে আসিলেন। বাবুরাম মহারাজ তরুণ সাধুদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন, 'পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ হয়েচে, শরৎ মহারাজ এসেচেন সেবক সংগ্রহ করতে, কে যাবে বল ?' তরুণদল প্রায় সকলেই

---

৪ Principles of Tantra শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব-কৃত 'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ। সমালোচনার শেষাংশ এইরূপ : "The latest configuration of Tantrikism dates from this, its wonderful absorption and assimilation of Buddhism, and from this important fact it derives some important features of its later development. The prophecy of Gautama Buddha on the eve of investing his aunt with Abhisampada or Sannyasa was fulfilled too literally when the proximity and free intercourse between the two orders of monks and nuns created in Buddhist history that odious problem for their religious life which they had to solve by introducing some mysterious rites, the philosophy of which, however, can be traced in the Vedas. No wonder if the current of such developments grew deeper and dirtier in time ; only it is alleviating that there were cross-currents of constant correction following from Vedantic sources Neither it is possible to deny that the Buddhistic phase of Tantrikism absorbed into the fold of Hinduism non-Aryan conceptions and rites of worship far more promiscuously than its pre-Buddhistic phase, but history proves that the digestive and secretive processes as it were, have ever since been working, tardily sometimes, but successfully always, and the Tantras, as the marvellous resentment of the Vedas and the Vedanta, have at last appeared in the boldest relief, through that miraculous embodiment of the synthetic spirituality of the whole race which we have to recognise today by the name of Sri Ramakrishna Paramahangsa."

বলিয়া উঠিল, 'আমি যাব, আমি যাব।' যে কয়েকজন চুপ করিয়া ছিল তাহাদের দিকে চাহিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, 'তোদেরও যেতে হবে। ঠাকুরের কাজ আমি একাই চালিয়ে নিতে পারব।' তখনই স্থির হইয়া গেল মঠ হইতে দশজন সেবাকার্যে গমন করিবে।

শরৎ মহারাজ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন ও তামাক খাইতেছিলেন। লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া বাবুরাম মহারাজ কার্যান্তরে গমন করিলে কহিলেন, 'বাইরের কাজের ভারও যখন বাবুরামদা নিয়েচেন, তখন জানলুম স্বামিজীর কাজ এখন থেকে ঠিক চলবে। আজ থেকে আমি নিশ্চিন্ত।'

সেবাকার্যের বন্দোবস্ত করিয়া শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে ১৯শে এপ্রিল জয়রামবাটী যাত্রা করিলেন—তথায় মায়ের নূতন বাড়ী নির্মিত হইবে, তাহার প্রাথমিক ব্যবস্থা করিয়া আসিবেন।

শ্রীশ্রীমাকে লিখিত শরৎ মহারাজের একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে, এই বৎসর, সম্ভবতঃ রথযাত্রা উপলক্ষে, শরৎ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি অনেকে পুরী গমন করিয়াছিলেন। সমগ্র পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

পুরী। শশী নিকেতন।
৯ই ভাদ্র, ১৩২২
আগষ্ট ২৬, ১৯১৫

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী-শ্রীচরণকমলেষু—

মা, আপনার ৩০শে শ্রাবণ তারিখের কৃপাপত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। রাধুর মার টাকা পাঠাইবার জন্য কলিকাতায় লিখিয়াছিলাম। উক্ত টাকা পৌঁছিয়াছে কিনা তাহা জানাইবেন। রাধুর মার পুরাতন ঘর যদি আপনি কিনিয়া লয়েন তাহা হইলে লিখিলেই টাকা পাঠাইয়া দিব। ১২ই ভাদ্র আমরা কলিকাতা না যাইয়া ২০শে ভাদ্র যাইব, এইরূপ স্থির হইয়াছে। কারণ, ১৫ই জন্মাষ্টমী, রামের মা প্রভৃতি উহা না দেখিয়া এখান হইতে যাইতে অভিলাষ করিতেছেন না।

বিভূতি লিখিয়াছে বাঁকুড়ায় অন্নকষ্ট হইয়াছে। রোজ ৪।৫ শত লোক তাহার বাসার নিকট দিয়া চব্বিশ পরগণা, কলিকাতা, হুগলী প্রভৃতি স্থানে কাজকর্ম পাইবার আশায় দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেছে।

আপনার নিমিত্ত যে ঘর করিবেন তাহা কার্তিক মাসে আরম্ভ করিয়া দিবার ভার কাহারও উপর দিয়া আসিলেই চলিবে। কোয়ালপাড়ার কেদারের উপর ঐ বিষয়ের ভার দেওয়া আমার মতে মন্দ হইবে না।

রাধারাণীর আর অসুখ হয় নাই জানিয়া বিশেষ আনন্দ হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে প্রার্থনা তাহার পূর্ব্বের ন্যায় অসুখ আর কখনও যেন না হয় এবং সে যেন এখন হইতে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে।

আমরা সকলে এখানে আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে ভাল আছি। যোগীন-মা, রামের মা, বাবুরামের মা ও গোলাপ-মা আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইতেছেন। বাবুরাম মহারাজ, হেমেন্দ্র, শচীন, পূর্ণানন্দ, রাসবিহারী ও আমি আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ করিতেছে ও করিতেছি। শচীন আপনার আদেশ মত ৺তারকনাথের সোমবার পালন করিতেছে। এগারটি সোমবার পালন করা হইয়া গিয়াছে। আর একটি বাকি, তাহা হইলেই এক বৎসর পূর্ণ হয়। তাহার শরীর এখনও সারে নাই, মধ্যে মধ্যে পেটের অসুখে বড় দুর্বল হইয়া পড়ে।

কলিকাতায় সকলে ভাল আছে, সংবাদ পাইয়াছি। ইতি—

শ্রীচরণাশ্রিত

শরৎ

আশুধান্য কাটা সুরু হইয়া নোয়াখালী ও ত্রিপুরার অন্নকষ্ট যখন কমিয়া আসিয়াছে, সেই সময় দিন পনর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে কাছাড় জেলা ও ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা বন্যাপ্লাবিত হইল। শরৎ মহারাজ কলিকাতা হইতে সেবকদিগকে লিখিলেন, 'বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। ঐসকল স্থান তোমাদের কর্মস্থানের নিকটে, তোমরা ওখানকার অবস্থা যেমন বুঝিবে তেমন কাজ আরম্ভ করিবে। এজন্য নূতন করিয়া আর তোমাদের অনুমতি চাহিতে হইবে না। ঠাকুরের কৃপায় টাকা আসিবেই।'

কাছাড় শিলচরের একটি সেবাকেন্দ্র লইয়া মোট চৌদ্দটি কেন্দ্রে রামকৃষ্ণ মিশন সেইবার চাউল বিতরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর বাঁকুড়াতেও একটি সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইল এবং অনেক দিন ধরিয়া সেখানেও কাজ চলিল।

রামকৃষ্ণ মিশন এইরূপে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গলায় ও বাঙ্গলার বাহিরে কাশী-কনখল-বৃন্দাবনাদি স্থানে সেবাকার্য পরিচালনা করিয়া ও শেষোক্ত স্থানগুলিতে স্থায়ী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান বলিয়া জনসাধারণে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। হৃদয়বান স্বামিজীর সর্বভূতে আত্মানুভূতির দিব্য প্রেরণা হইতে উহার জন্ম, এবং হৃদয়বান সারদানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের নিষ্ঠায় ও যত্নে উহার পুষ্টি। রামকৃষ্ণ মিশনই ভারতবর্ষে শিবজ্ঞানে জীবসেবা শিক্ষা দিয়া মানুষকে দেবত্ব-বিকাশের নূতন পথ দেখাইয়াছে।

মানুষের ঐহিক ও আত্মিক উন্নতির সহায়ক সকল বিষয়েই এই সেবার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত হইলেও প্রথমাবস্থায় রামকৃষ্ণ মিশন বিশেষভাবে আর্তত্রাণকার্যে মনোযোগ দিয়াছিলেন। কারণ, পরাধীন ও দরিদ্র ভারতে অন্নবস্ত্রের অভাবটাই তখন সমধিক অনুভূত হইয়াছিল। অন্নদানের সঙ্গে সঙ্গে অসহায় রোগীর পরিচর্যার জন্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য স্থায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহও গড়িয়া উঠিতেছিল।

মিশনের সাময়িক সেবাকার্য ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য অর্থবল ও লোকবলের প্রয়োজন, একথা বলাই বাহুল্য। সাময়িক সেবাকার্য করিতে যাইয়া মিশনের স্বল্পসংখ্যক সাধুরা স্থানীয় সহৃদয় লোকদিগকে নিজেদের ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া সহকর্মী করিয়া লইতেন, এবং অর্থের জন্য মিশনের সম্পাদক স্বয়ং জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাইতেন।

স্বামী সারদানন্দ জনসাধারণের প্রদত্ত প্রতিটি পয়সার হিসাব

রাখিতেন এবং হিসাবপরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া উহা সংবাদপত্রে বা পুস্তিকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেন। একটি পয়সাও যাহাতে অপব্যয়িত না হয়, বিশেষতঃ নিজেদের স্থবিধার জন্য সেবকেরা যাহাতে অধিক ব্যয় না করিয়া বসেন সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। এই সকল কারণে রামকৃষ্ণ মিশন সহজেই দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

পরবর্তী কালে একজনের পত্রের উত্তরে শরৎ মহারাজ লিখিয়াছিলেন: "ভক্তমণ্ডলী লইয়া সমিতি গঠন করিয়াছ—উত্তম কথা। যতটুকু পারিবে সেবাব্রত ততটুকু করিবে বৈকি। কর্মের কৌশল অথবা টাকা তুলিবার কৌশল ঐ সমিতির কার্যের জন্য জানিতে চাহিয়াছ। ঐ বিষয়ে কোনরূপ অপূর্ব কৌশল আমার জানা নাই। স্থতরাং বলিব কিরূপে? আমি যখন যে কোনও কাজে লাগিয়াছি তাহা মনে প্রাণে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং অর্থের অভাব হইলে লোককে সাদাসিধাভাবে বলিয়াছি—এই কাজের জন্য এই অর্থের প্রয়োজন, যদি কিছু দিতে পার ত দাও—এই পর্যন্ত। তুমিও ঐরূপ করিয়া দেখিতে পার। তোমার ভাগ্যে কি হইবে, জানি না।"

নিজের জীবন দিয়া শরৎ মহারাজ সেবাকার্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। একজনকে[৫] সেবাকেন্দ্রে প্রেরণ করিবার পূর্বে বলিয়াছিলেন, 'হ্যাঁরে, লোকের টাকা লোককে দিবি, তোর কি দিবি? তোর হৃদয় দিবি, ভালবাসা দিবি, প্রাণ দিবি।' উপদিষ্ট ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেবাকেন্দ্রের দরজা কি রাত্রেও খুলে রাখব?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।'

ছোট বা বড় প্রত্যেক কাজেরই ভাল ও মন্দ দুইটি দিক থাকে।

---

৫ শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ।

বহুর পক্ষে বহুপরিমাণে যে কাজ মঙ্গলজনক, স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিশেষ হানিকর হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ঐরূপ স্থলে উভয় দিক রক্ষা করিয়া, অর্থাৎ কাজের ও ব্যক্তিবিশেষের দুইয়েরই যাহাতে ক্ষতি না হয় সেইভাবে কর্তব্য নির্দেশ করা কঠিন ব্যাপার।

একবার জনৈক চিকিৎসাভিজ্ঞ সাধু সেবাকেন্দ্রে যাইতে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, ঐসকল স্থলে প্রত্যেকবারই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে বলিয়া তিনি যাইতে ইচ্ছা করেন না। 'আচ্ছা যাও, এবার কিছু হবে না'—এই বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া শরৎ মহারাজ তাঁহাকে কাজে পাঠাইয়াছিলেন। সেইবার সেই আশীর্বাদসিক্ত ব্যক্তির বিন্দুমাত্র চিত্তবিক্ষেপও যে ঘটে নাই, কর্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাহা সবিস্ময়ে বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ঐরূপ ঘটিলেও ইহা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। কাহারও সাময়িক মনোভাব তাহার সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করে না বা করিতে পারে না।

বেলুড় মঠে একদিন রাত্রে—১৯২৫ অব্দে মিশনের বাৎসরিক সভার পর—শরৎ মহারাজকে সঙ্ঘসম্পর্কিত কতকগুলি প্রশ্ন করা হয়। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এইরূপ: 'কোন আশ্রমে কাজে নিযুক্ত থাকা কালে পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য যদি কারো অনিষ্ট হওয়ার—সাধুজীবন মলিন হওয়ার সম্ভাবনা দাঁড়ায়, সেরূপ স্থলে সে কি করবে?' মহারাজ খুব জোরের সহিত উত্তর দিলেন, 'সেস্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে চলে যাবে।' [প্র]

এই বৎসরের প্রথমদিকে শরৎ মহারাজ যখন কাশীতে ছিলেন সেই সময়, একদিন একজন[৬] তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনারা যখন আমাদের কাজ করতে বলেন তখন আমাদের কল্যাণ দেখেন, না

---

৬ স্বামী হরানন্দ।

আশ্রমের কাজ দেখেন?' কিছু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'এই রকমের প্রশ্ন তো এ পর্যন্ত আমাকে আর কেউ করে নি। এক একটা আশ্রমের সৃষ্টি কি করে হয়েচে জান? তুমি হয়তো কোথাও কাজে বা বেড়াতে গিয়ে, স্থানটি পছন্দ হওয়াতে, সেখানে আশ্রম করে বসলে। তারপরে লোকের প্রয়োজন বুঝে মঠকে জানালে। কর্তৃপক্ষীয় অধিকাংশের মত হওয়াতে আশ্রমটি রাখাই স্থির হয়ে গেল। আশ্রম রাখতে গেলেই লোক পাঠাতে হবে, আর কাজ করতে বলতেও হবে। তবে কি জান, যার কাজকর্মে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হবে সে কথা না শুনে চলে যাবে। এমন কি, আমার শিষ্যও যদি আমার কথা না শুনে চলে যায় তাতে তার অকল্যাণ হবে না। গুরুশক্তি যিনি আশ্রয় দিয়েচেন তিনি কোন কালে রুষ্ট হন না।' [প্র]

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, উহার কেন্দ্রসমূহে উপযুক্ত কর্মীর সংস্থান করিতে আজীবন যাঁহাকে ভাবিতে হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে উপর্যুক্তরূপ ঘোষণা যে কতখানি মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচায়ক তাহা শতমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না! শাস্ত্রের দোহাই না দিয়া—যে শাস্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয় যে, শিষ্য নির্বিচারে গুরুর যেকোন আদেশ প্রতিপালন করিবে, কিংবা সঙ্ঘের দোহাই না দিয়া—যে সঙ্ঘের অনুশাসনে উহার আদেশ অমান্য করা ঈশ্বরাদেশ লঙ্ঘনের সামিল, ইহা মানবাত্মার অখণ্ড স্বাধীনতার স্বীকৃতি। নিজের জীবনে স্বামী সারদানন্দ কখনও এই স্বীকৃতির অমর্যাদা করেন নাই।

একবার এক আশ্রমের অধ্যক্ষকে তিনি লিখিয়াছিলেন: "সকলের আত্মা চিরস্বাধীন বলিয়া তাহার মনে সকল বিষয়ে সর্বদা স্বাধীনতা-লাভের ইচ্ছার উদয় হয়। যথার্থ নেতা কখন তাহার ঐ স্বাধীনতা-লাভের ইচ্ছায় বাধা দেন না। কেবল ঐ স্বাধীনতা লাভ করিলে

যাহাতে সে উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে তাহার চেষ্টাই করিয়া থাকেন। যেসকল সেবক তোমার নিকটে মঠে আছেন তাহাদিগকে ঐভাবে চালনা করিতে হইবে। নতুবা তাহাদিগের মনে যদি এই ধারণা একবার দৃঢ় হইয়া যায় যে, মঠে থাকিয়া তাহাদিগের স্বাধীন-ভাবে কোন কার্য করা অসম্ভব, তাহা হইলে তাহারা পলায়ন করিবার চেষ্টাই করিবে। একমাত্র ভালবাসার বন্ধনেই তাহারা মঠে রহিয়াছে এবং সকল কার্য নিজের ইচ্ছাতেই করিতেছে, কাহারও দ্বারা বাধ্য হইয়া নহে—এই ভাবটি যাহাতে তাহাদের মনে থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।"

মায়ের বাড়ীতে একদিন শরৎ মহারাজ সঙ্ঘগুরু শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজকে হাত জোড় করিয়া করুণস্বরে কহিলেন, 'মহারাজ, এইবার আমাকে অব্যাহতি দাও।' ইতঃপূর্বে এমনভাবে কথা বলিতে শরৎ মহারাজকে কেহ কখনও দেখে নাই। মহারাজও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েচে শরৎ?' 'সেদিন উমানন্দকে গালমন্দ করেছিলুম—কেন সে আমাকে না বলে বৃন্দাবন ছেড়ে এল। উমানন্দ কিন্তু বলেছিল, চিঠি দিয়েচি। আমি সেকথা মানতে পারি নি। আজ দেখলুম কেমন করে সে চিঠিখানা পুরাতন চিঠির মধ্যে মিশে গেচে। সে সত্যি কথাই বলেছিল, আমিই অযথা গালমন্দ করেচি। উমানন্দকে একদিন ডেকে এনে ক্ষমা চাইতে হবে।' মহারাজ কহিলেন, 'অতটা না করলেও চলবে।' অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তির নিকট শরৎ মহারাজ সত্যসত্যই পরে একদিন ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

* * *

১৯১৬ অব্দে, মার্চ মাসের শেষে, শরৎ মহারাজ যোগীন-মা ও স্বামী ভূমানন্দকে সঙ্গে লইয়া গয়াধামে আসিলেন—যোগীন-মার গর্ভধারিণী

স্বর্গতা হইয়াছেন, মধুমাসে তিনি এখানে মাতৃকৃত্য করিবেন। গয়ার কাজ সুসম্পন্ন হইবার পর তাঁহারা কাশী হইয়া বৃন্দাবনে যান এবং ২০শে মে পর্যন্ত তথায় বাস করেন।

বৃন্দাবনে শরৎ মহারাজ গোপেশ্বর মহাদেব দর্শন করিতে আসিলে এক সাধুর সঙ্গে দেখা হইল। সাধুটি সেখানেই থাকিতেন। তিনি শরৎ মহারাজকে কাছে বসাইয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন, এবং বৈষ্ণব বাবাজীদিগকে বেদবিরোধী বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। শরৎ মহারাজ চুপ করিয়া শুনিয়া গেলেন ও শান্তভাবে সাধুকে কহিলেন, 'একবার গোবিন্দজীউ দর্শনে যেতে হবে মহারাজ, উঠি তবে।' গোবিন্দজীউ দর্শনের কথায় সাধু মুখভার করিলেন। ইহার পরে শরৎ মহারাজ প্রায়ই গোপেশ্বর শিব দর্শন করিতে আসিতেন ও সেই সাধুর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র হাতজোড় করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। সাধু কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আর কথাটি কহিতেন না।

বৃন্দাবন হইতে শরৎ মহারাজ এলাহাবাদে আসেন এবং তথায় তাঁহার কলেজের সহপাঠী ও গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দের আতিথ্যে দুইতিন দিন অতিবাহিত করিয়া ২৫শে মে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতা হইতে শ্রীশ্রীমাকে তিনি নিম্নোক্ত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন ঃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — কলিকাতা, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী-শ্রীচরণকমলেষু—

মা, আমার অসংখ্য অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনি জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে কলিকাতায় আসিবেন একথা রাসবিহারীর পত্রে জানিয়া আমরা ৮ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন হইতে রওনা হইয়া গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছি। আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে পথে কোন কষ্ট হয় নাই এবং শরীরও মন্দ নাই।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার কলিকাতায় আসিবার শুভদিন আছে। ঐদিনে যদি আসিবার

অভিমত হয় তাহা হইলে পত্রোত্তরে জানাইবেন, সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিব। ঐদিন ভিন্ন জ্যৈষ্ঠমাসে কলিকাতায় আসিবার অন্য শুভদিন নাই। ঐদিন না আসিতে পারিলে ৬ই আষাঢ় শুভদিন আছে।

বৃষ্টি হইয়া এখানে ঠাণ্ডা রাখিয়াছে। এখানকার ভক্তগণ কুশলে আছেন। ললিত [জয়রামবাটী হইতে] ফিরিয়া আসিয়া আমার সহিত দেখা করিয়াছিল এবং সমস্ত কথা বলিয়াছে। আপনাকে লইয়া আসিবার জন্য অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে আমার জয়রামবাটী যাওয়া আবশ্যক বুঝিলে পত্রোত্তরে আদেশ করিলেই আমি আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইব। যদি আমার যাইবার প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে আপনাকে আনিবার জন্য গণেনকে পাঠাইয়া দিব।

যোগীন-মা. গোলাপ-মা, গণেন প্রভৃতি এখানকার সকলের ও মঠের সকলের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন। ইতি—

শ্রীচরণাশ্রিত দাস

শ্রীশরৎ

পত্রে যে ললিতবাবুর (ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়) নাম উল্লিখিত আছে তিনি শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে ও সংগৃহীত অর্থে চারিখানি কাঁচা গৃহ সমেত মায়ের নূতন বাড়ী নির্মিত হয় এবং বাটীর পুর্বদিকে সংলগ্ন ও উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত পুণ্যপুকুর নামক পুষ্করিণীটি ক্রয় করিয়া উহার পঙ্কোদ্ধার করানো হয়। ১৫ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) শুভদিন দেখিয়া মা যখন নূতন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ করেন, শরৎ মহারাজ তখন বৃন্দাবনে। পত্রোত্তরে মায়ের আহ্বান পাইয়া তিনি জয়রামবাটীতে আসিলেন ও নূতন বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে কয়েক-দিন বাস করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। মা তাঁহার ইষ্টদেবী ৺জগদ্ধাত্রীর নামে নূতন বাড়ী উৎসর্গ করিতেছেন এই মর্মে দলিল নিষ্পন্ন হইল, এবং কলিকাতার পথে কোয়ালপাড়া মঠে আসিয়া মা সেই অর্পণনামা রেজিষ্টারী করিয়া দিলেন।

৬ই জুলাই জয়রামবাটী হইতে যাত্রা করিয়া পথে তুইদিন কোয়াল-

পাড়ায় ও একদিন বিষ্ণুপুরে থাকিয়া শ্রীশ্রীমা ১০ই সন্ধ্যার পর কলিকাতায় শুভাগমন করেন।

কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মস্থানের সংলগ্ন ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ভূমিখণ্ড—'সুখলাল গোস্বামীর ভিটা'—উচিত মূল্যে ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য শরৎ মহারাজ বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রবোধবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায় এই বৎসরের মধ্যেই ঐ জমি (১৮ কাঠা) সংগৃহীত হয়। কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দির করা সম্বন্ধে শরৎ মহারাজের এতই আগ্রহ ছিল যে, জনৈক ভক্তকে[৭] একদিন বলিয়াছিলেন, 'হ্যাঁরে, কাশী থেকে তৈরি মন্দির ওয়াগনে করে নিয়ে এসে কামারপুকুরে বসিয়ে দিলে হয় না?' বহু বৎসর পরে হইলেও, তাঁহার মুখোচ্চারিত এই কথাটি প্রায় আক্ষরিক অর্থেই পূর্ণ হইয়াছিল—কাশীর নিকটবর্তী চুনার হইতে মন্দিরের মাপে কাটা বেলে-পাথর ওয়াগনে বোঝাই হইয়া কামারপুকুরে আনীত হইয়াছিল।

এই বৎসরে, শ্রীশ্রীমার দেশে অবস্থানকালে, পাশ্চাত্যদেশীয় দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। একজন দীনবন্ধু এণ্ডরুজ, অপর ব্যক্তি ব্রাজিলবাসী এক বৃদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার। দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করেন, 'বোলপুরে একটি বেয়াড়া ছেলেকে আমরা বাগ মানাতে পারচি না; আপনারা তাকে এখানে বা বেলুড়ে রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন?' শরৎ মহারাজ সবিনয়ে কহিলেন, 'না, আমাদের এখনো ওরকম ছেলে রাখার ব্যবস্থা নেই।' ইঞ্জিনীয়ার সাহেব স্পেনীয় ভাষায় কথা বলেন, ইংরাজী জানেন না; তাঁহার ছেলে একটু আধটু ইংরাজী বলিতে পারে, সহকারীরূপে ছেলেকে সঙ্গে লইয়া তাই ভারতে আসিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত ভক্তির

৭ শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ।

সহিত ক্যাথলিক ধরণে নতজানু হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পুজনীয় শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলেন ও বলিলেন, 'আমি প্রভু রামকৃষ্ণের দেখা পেয়েচি। তিনি আমাকে ভারতে আসতে আদেশ করেচেন, আপনাদের মঠগুলি দেখতে বলেচেন। আপনি কি আমার সম্বন্ধে অনুরূপ কোন আদেশ তাঁর কাছ থেকে পেয়েচেন?' শ্রদ্ধাভরে ও প্রসন্নমুখে বৃদ্ধের দর্শনকথা শুনিয়া শরৎ মহারাজ শান্তকণ্ঠে কহিলেন, 'কই, আমি তো কিছু পাই নি।'

বর্ষ শেষ হইবার পূর্বেই রামকৃষ্ণ মিশন এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়িল। ১১ই ডিসেম্বর ঢাকায় দরবার অভিভাষণে বাঙ্গলার লাট লর্ড কারমাইকেল মিশনের নাম উল্লেখ করিয়া এমন কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিলেন যাহার ফলে, পুলিশের নির্যাতন-ভয়ে, জনসাধারণ ও সরকারী চাকুরিয়া পূর্ববৎ মিশনের জনসেবা-কার্যে সাহায্য ও সহানুভূতি করিতে সাহস পাইবে না। ইহার লক্ষণ প্রকট হইতে একদিনও বিলম্ব হইল না, এবং অনেকে মিশনের সভ্যতালিকা হইতে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করার কথাও চিন্তা করিতে লাগিলেন।

লাট সাহেবের দুইটি উক্তি এইরূপ: "নীচমনা ও নিষ্ঠুর লোকেরা [অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদীরা] তরুণবয়স্কদের বিপথগামী করিবার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের মত প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগদান করে; উহাদের পাল্লায় না পড়িলেই এই তরুণেরা স্বদেশের প্রকৃত জনসেবক হইয়া উঠিতে পারিত।" "নিজেদের দলবৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ইহারা রামকৃষ্ণ মিশনের ন্যায় পরোপকারী প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইবার সুযোগ গ্রহণ করে, কিংবা আর্তসেবাকার্যে যোগ দেয়, এবং এইরূপে উচ্চমনা ও অপরিণামদর্শী ছেলেদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদিগকে প্রভাবিত করে।"[৮]

---

৮ মূল ইংরাজী কথাগুলি এইরূপ:

They (the recruiters of the criminal movement) "often seize the

স্বামিজীর অদৃষ্টপূর্ব স্বদেশপ্রেম বাঙ্গলার শিক্ষিত যুবকদিগকে দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে উদ্দীপিত করে, এবং তৎপ্রচারিত অভীঃ-মন্ত্র ও গীতায় শ্রীভগবানের বিঘোষিত আত্মার অমরত্ব তাহাদিগকে মৃত্যু-ভয়রহিত করিয়া তুলে। পুলিশ ইহা জানিত এবং কোথাও খানাতল্লাসী করিতে যাইয়া গীতা কিংবা স্বামিজীর গ্রন্থ ও ছবি দেখিতে পাইলেই খাপ্পা হইয়া উঠিত।[৯] স্বামিজীর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন তদীয় ভাবধারা বহন করে বলিয়া বিদেশী ইংরাজ সরকার অন্তরে উহাকে পছন্দ

---

opportunity which membership in a charitable society, like the Ramkrishna Mission or participation in the relief of distress, gives them to meet and influence the boys who have noble ideas, but who have not enough experience to judge where a particular course must lead." "Mean and cruel men do join these societies in order to corrupt the minds of young men who would, if only they were not interfered with, be benefactors to their fellow-countrymen."

৯ স্বামিজীর ও গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজ সরকারের কিরূপ ধারণা ছিল তাহা ১৯১৮ অব্দে প্রকাশিত Sedition Committee Report এর ২৪নং অনুচ্ছেদে বিবৃত আছে। উহা এইরূপ: "In 1886 had died the Bengali ascetic Ramakrishna....After his death his doctrines were preached by some of his disciples, the chief of whom was Narendra Nath Datta, a young bhadralok B. A., subsequently famous as Swami Vivekananda....He organised centres of philanthropic and religious effort under the supervision of a Ramakrishna Mission and carrying much farther the teachings of his master, preached that Vedantism was the future religion of the world, and that, although India was now subject to a foreign power, she must still be careful to preserve the faith of mankind. She must seek freedom by the aid of the Mother of strength (Sakti). Vivekananda died in 1902; but his writings and teachings survived him, have been popularised by the Ramakrishna Misson and have deeply impressed many educated Hindus....So indeed was the teaching of the Bhagabad Gita or Lard's song of the Mahabharat epic recited by Sri Krishna, the incarnation of the Preserver of the World, before the great long-ago battle of Kurukshetra."

করিত না, কিন্তু রাজনৈতিক-সংশ্রবশূন্য ও নিঃস্বার্থ জনসেবাব্রতী মিশনের বিরুদ্ধে কোনও কথা খোলাখুলিভাবে বলিবার সুযোগও সে পাইত না। স্বামী সারদানন্দ যেদিন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রভৃতিকে, এককালে বিপ্লবী দলে থাকা সত্ত্বেও, মঠে স্থান দিলেন, সেইদিন হইতে সরকার মঠের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিল ও বেলুড় মঠ গুপ্তপুলিশের হানা দিবার ক্ষেত্র-বিশেষে পরিণত হইল। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মধ্যে মধ্যে মঠ পরিদর্শন করিতে আসিয়া স্বামী সারদানন্দের মধুর ব্যবহারে আপ্যায়িত হইয়া যাইতে লাগিলেন। দীর্ঘকালের অনুসন্ধানে কোনও দোষ আবিষ্কৃত না হওয়া সত্ত্বেও লাটের বক্তৃতায় মিশনকে যেভাবে অভিযুক্ত করা হইল তাহাতে মিশনের অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া উঠিল।

সরকারের সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা মঠে স্থান না পাইলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব যে হইত না, একথা বলাই বাহুল্য। তাহাদিগকে এখন সরাইয়া দিয়া আশু প্রতিকারচেষ্টা চলিতে পারে, কিন্তু একবার যাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, এবং আনুগত্যে ও আচরণে নিজেদের বিশ্বস্ততা যাহারা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত করিয়াছে, তাহাদিগকে আশ্রয়চ্যুত করা, বহুর স্বার্থে হইলেও যারপরনাই বেদনাদায়ক। স্বামী সারদানন্দের মত মহাপ্রাণ ও আশ্রিতবৎসল ব্যক্তি এমন কথা চিন্তাও করিতে পারেন না।

এই দুঃসময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা হইতে বহুদূরে, দক্ষিণভারতে। সারদানন্দ একাই অবস্থার প্রতিকারে উদ্যোগী হইলেন এবং শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর লইয়া পুলিনবিহারী মিত্রের সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট হাউসে যাইয়া লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ গুর্লের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তারপরে ভবানীপুরে স্বামিজীর বাল্যবন্ধু উকিল দাশরথি সান্যালের সঙ্গে মিলিত হইয়া রামকৃষ্ণ মিশন গভর্ণিং বডির পক্ষ হইতে একখানি মেমোরিয়াল বা স্মারকপত্র প্রস্তুত করিলেন ও বাঙ্গলা সরকারের চিফ

সেক্রেটারীর মারফত ১৯১৭ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী উহা লাট সাহেবকে পাঠাইয়া দিলেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার ঠাকুরের সাধারণ জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসব দেখিবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তৎপূর্ব দিনে আসিয়া বেলুড় মঠে রাত্রিবাস করিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ মঠে উপস্থিত থাকিয়া সাদরে দেশবন্ধুকে অভ্যর্থনা করেন।

২রা মার্চ মিঃ গুর্লে ও তারপরে একদিন গুপ্তপুলিশের বড় কর্তা মিঃ ডেনহ্যাম মঠে আসেন। ১০ই মার্চ স্বামী সারদানন্দ গভর্ণমেণ্ট হাউসে যাইয়া লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন ও উভয়ের মধ্যে প্রায় একঘণ্টা কথাবার্তা হইল। ২৬শে মার্চ স্বামী সারদানন্দকে এক পত্র লিখিয়া লাট সাহেব তাঁহার দরবার-ভাষণে কৃত উক্তি প্রকারান্তরে প্রত্যাহার করিলেন।[১০]

লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর সারদানন্দ মন্ত্রিসভার

---

১০ পত্রখানি এই:

Governor's Camp,
Bengal.
26th. March, 1917

Dear sir,

I thank you for having come to see me and for the trouble you have taken to tell me about the origin of the Ramkrishna Mission, and its aims and objects.

I read with great interest the memorial which the Mission authorities submitted to me sometime ago. I regret very much to hear that words used by me at the Durbar in December last regarding the Mission should have led in any way to the curtailment of the good Religious, Social and Educational work the Mission has done and is doing. As you, I know, realise my object was not to condemn the Ramkrishna Mission and its members. I know the character of the Mission's work is entirely non-political, and I have heard nothing but good of its work of social service for the people. What I wanted to impress upon the public is this: Charitable and

সদস্য কূটনীতিজ্ঞ মিঃ পি. সি. লায়নের সঙ্গেও দেখা করেন এবং উহার ফলে শচীন ও সতীশ (স্বামী চিন্ময়ানন্দ ও স্বামী সত্যানন্দ) এই দুই জনের উপর হইতে পুলিশের নজর অপসৃত হয়। পুলিশের নজর লইয়াই তাঁহারা মঠে স্থানলাভ করিয়াছিলেন!

মেমোরিয়াল প্রস্তুত করা, লাট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কার্যে শরৎ মহারাজকে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সহিত আলাপে লর্ড কারমাইকেল অভিভূত হইয়াছিলেন, আমরা শুনিয়াছি। লর্ডবংশীয় মহামান্য রাজপ্রতিনিধি তাঁহার দরবার ভাষণে কৃত উক্তি প্রত্যাহার করিতেছেন, ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাসে ইহা এক অপূর্ব ঘটনা।

মিশনকে ও নিজের আশ্রিতগণকে এইরূপে নিরাপদ করিয়া শরৎ মহারাজ বাত ও মূত্রাশয়ের পীড়ায় শয্যাগ্রহণ করেন। ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ, দুর্গাপদ ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালের চিকিৎসায় ফল হইতেছে না দেখিয়া তাঁহাদের পরামর্শে অবশেষে মেজর বার্ডকে আনয়ন করা হয়। ২৯শে মার্চ হইতে প্রায় এক পক্ষকাল তিনি রোগের অশেষ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন।

---

philanthropic work such as the Mission undertake is being adopted deliberately by a section of the revolutionary party as a cloak for their own nefarious scheme and in order to attract to their organisations youths who are animated by ideals such as those which actuate the Mission, with the intention of perverting these ideals to their own purposes, and with this object unscrupulous use is being made of the name and reputation of the Ramkrishna Mission.

I have full sympathy with the real aims of the true Ramkrishna Mission and it was this abuse of the name of the Mission that I wish to prevent. I hope the words 1 used will help the Mission to guard against the illegitimate use of its name by unscrupulous people.

Yours very sincerely,
(Sd.) Carmichael.

১৩

শ্রীশ্রীমায়ের ভাবে

শ্রীশ্রীসারদা-মাতার অন্তরঙ্গ-সেবক সারদানন্দ মাকে কেন্দ্র করিয়া, মায়ের ভাবে ভরপুর হইয়া সকল কাজ করিতেন—নিজমুখে বলিয়াছেন। তাঁহার জীবনের এক একটি কাজ যেন সর্বস্বরূপা জগন্মাতার পূজার এক একটি উপচাররূপে পরিকল্পিত। তাই কাজগুলিও সফলতায় ও সুষমায় ভরিয়া উঠিত।

আর কাজের বিরাম ছিল না বলিলেই হয়। শ্রীশ্রীমা তাঁহার জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছেলেন, 'শরৎকে দেখ না, কত কাজ করে, কত হাঙ্গামা পোয়ায়—মুখটি বুঁজে থাকে। ও সাধু মানুষ, ওর এত সব কেন? ওরা ইচ্ছা করলে দিনরাত ভগবানে মন লাগিয়ে বসে থাকতে পারে; কেবল তোমাদের মঙ্গলের জন্যে এদের নেমে থাকা।'[১]

* * *

শরৎ মহারাজ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন ও পূর্ববৎ কাজকর্মে ব্যাপৃত আছেন, সেই সময় বাবুরাম মহারাজ কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য বলরাম-ভবনে আসিলেন। শরৎ মহারাজ প্রায় নিত্যই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন ও ডাক্তার বিপিনবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

গুরুভ্রাতৃগণের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগবশতঃ তাঁহাদের কাহারও কঠিন অসুখের সংবাদ পাইলেই তিনি ছুটিয়া যাইতেন। পূর্বে একবার মঠে বাবুরাম মহারাজের কলেরা হয়; রোগের সূচনাতেই সেই সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই বলিয়া তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন, এবং

---

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

সংবাদ পাইবামাত্র যে পর্যন্ত না বাবুরাম মহারাজ নিরাময় হইয়া উঠিলেন সেই অবধি মঠেই অবস্থান করিয়াছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ দাক্ষিণাত্য হইতে পুরীধামে আসিয়াছেন শুনিয়া হরি মহারাজ তাঁহাকে দর্শন করিতে তথায় যান ও কিছুদিন পুরীবাস করিবার পর অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার দুই পায়ে উপরি উপরি কয়েকটি অস্ত্রোপচার করিতে হয় এবং অস্ত্রোপচারগুলি তিনি সজ্ঞানে হাসিমুখে সহ্য করিলেন দেখিয়া ডাক্তার যারপরনাই বিস্মিত হন। তাঁহার অসুখের সংবাদ পাইয়াই শরৎ মহারাজ একজন সেবক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিজের যাওয়ার আবশ্যকতা বোধ করিলে অবিলম্বে লিখিয়া জানাইতে তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। এদিকে অসুখের অবস্থায় হরি মহারাজ শরৎ মহারাজকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিত্য সকালবেলা যখন কলিকাতার লোক আসিবার সময় হইত, তিনি বলিয়া উঠিতেন, 'দেখ তো, শরৎ এল কিনা?' যাত্রী লইয়া শেষ গাড়ীখানি চলিয়া যাইত ও শরৎ মহারাজ আসিলেন না দেখিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া যাইতেন। বিলম্বে সেই সংবাদ শরৎ মহারাজের নিকট পৌঁছিল ও সান্যাল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ১৭ই অক্টোবর তিনি পুরীতে আসিলেন।

শশি-নিকেতনের বারান্দায় শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজ বসিয়া আছেন, শরৎ মহারাজ তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং 'এস শরৎ, বস'—মহারাজের এই সাদর আহ্বানে পার্শ্ববর্তী কেদারায় উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। সান্যাল মহাশয় কিন্তু মহারাজকে অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্ন করিয়াই একেবারে হরি মহারাজের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হরি মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মহারাজ কহিলেন, 'শরৎ, তুমি যখন এসেচ এইবার আমি

নিশ্চিন্ত।' অতঃপর 'যাই হরিভাইকে দেখে আসি' বলিয়া মহারাজের অনুমতি লইয়া শরৎ মহারাজ হরি মহারাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কেহ কোন কথাই কহিলেন না, হরি মহারাজ ছোট বালকের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একখানা চেয়ার ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া শরৎ মহারাজ তাঁহার পাশে বসিলেন, এবং তাঁহার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পুরী হইতে শ্রীশ্রীমাকে শরৎ মহারাজ নিম্নোক্ত পত্রখানি লিখিলেন:

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী-শ্রীচরণকমলেষু—

মা, আমার অসংখ্য অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন। গত মঙ্গলবার আমি ও সান্যাল কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া বুধবার প্রাতে এখানে পৌঁছিয়াছি। এখানে আসিবার কারণ, হরি মহারাজের কঠিন পীড়া—তাহা আসিবার পূর্বে আপনাকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছি। আশা করি সেই পত্র পাইয়াছেন, উহা দেশড়ার ডাকে দিয়াছিলাম।

এখানে আসিয়া দেখিলাম হরির অসুখ খুব কঠিন বটে, তবে এখনও মন্দের ভালর দিকে। ডাক্তারেরা বলিতেছেন, যদি কোন উপসর্গ উপস্থিত না হয় তাহা হইলে ১০।১২ দিন বাদে তাহাকে কলিকাতায় কোনরূপে লইয়া যাওয়া চলিবে। হরি এখন একেবারে শয্যাশায়ী। তাহার বাঁ হাত পায়ে ও ডান পায়ে তিন জায়গায় কাটিয়া পুঁজ বাহির করিয়া দিতে হইয়াছে। সেজন্য পাশ ফিরিয়া শুইবার পর্যন্ত সাধ্য নাই। দিবারাত্র চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতে হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে কৃপা করিয়া অদ্ভুত সহগুণ দিয়াছেন, তাই সে আপনাদের উপর নির্ভর করিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া আছে ও আনন্দের সহিত কথাবার্তা গল্পগান করিয়া কাটাইতেছে। আশীর্বাদ করিবেন তাহাকে যেন এযাত্রা আরোগ্য করিয়া শীঘ্র কলিকাতায় লইয়া যাইতে পারি। হরির অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন।

শ্রীযুক্ত রাখাল মহারাজ ভাল আছেন। হরির অসুখের দরুন বিশেষ ভাবিত ও ভীত হইয়াছিলেন। আমরা আসায় ও ডাক্তারেরা একটু ভাল বলায় ভয় একটু কমিয়াছে। আপনাকে অসংখ্য প্রণাম জানাইতেছেন।

অমূল্য, জ্ঞানানন্দ, ঈশ্বর প্রভৃতি যেসকল ছেলেরা এখানে আছে ও সান্যাল আপনাকে অসংখ্য প্রণাম জানাইতেছে।

আপনার ৩০শে আশ্বিন তারিখের পত্র কলিকাতা হইয়া অদ্য এখানে আসিয়াছে। এই ম্যালেরিয়ার সময়ে রাঁধুনীটি ছাড়িয়া গিয়াছে জানিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলাম।

৺জগদ্ধাত্রীপূজার পরেও আসিতে পারিবেন না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আপনি যখন এসময়ে কলিকাতায় আসিবেন না তখন ৺জগদ্ধাত্রীপূজার সময় জয়রামবাটীতে আমরা যাইয়া কি করিব। ঐ সময়ে যাইয়া যদি ম্যালেরিয়ায় ভুগি তাহা হইলে আপনার চিন্তা বাড়াইয়া কষ্ট দেওয়া হইবে মাত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় যদি আপনার মাঘ মাসে আসা স্থির হয় তখন বরং যাইলে চলিবে।

পূজার জন্য কত টাকা পাঠাইব লিখিবেন। কলিকাতায় ফিরিয়া পাঠাইয়া দিব। যেসকল দ্রব্য পাঠাইতে লিখিয়াছেন ও যোগীন-মা যাহা যাহা বলিয়া দিবেন সেই সকল পাঠাইয়া দিব।

ভানি (পিসী) অভাব জানাইয়া এক পত্র দিয়াছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার বিষয়ে যাহা হয় করিব।...ইতি—

শ্রীচরণাশ্রিত সন্তান

শ্রীশরৎ

শরৎ মহারাজের পুরীতে আসার কয়েকদিন পরেই ডাক্তারেরা স্থির করিলেন, হরি মহারাজের আর একটি অস্ত্রোপচার করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া হরি মহারাজ যেন ভয় পাইলেন ও কান্নার স্বরে বলিলেন, 'আমি আর অপারেশন নিতে পারব না।' শরৎ মহারাজ কাছে বসিয়া তাঁহার হাতে মাথায় বুকে ও মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, 'এই একটিবার শরীর থেকে মনটাকে তুলে নেবে, তার আর কি হয়েচে?' হরি মহারাজ অবশেষে সম্মত হইলেন ও হাসিয়া বলিলেন, 'তা শরৎ, তুমি যখন বলচ, তাই না হয় করা যাবে।'

অস্ত্রোপচার হইয়া গেল। সেইদিন হইতে শরৎ মহারাজ হরি মহারাজকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাছে বসিয়া গল্প

করিতেন। সান্যাল মহাশয় তাঁহাদের অতীত জীবনের—বরাহনগর মঠের ও হিমালয়ের কত কথা কহিতেন। তারপর হরি মহারাজ কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিলে তাঁহাকে ও শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজকে সঙ্গে লইয়া শরৎ মহারাজ ১০ই নভেম্বর কলিকাতায় মায়ের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অসুস্থ শরীর লইয়া বাবুরাম মহারাজ তখনও বলরাম-ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন; শরৎ মহারাজ পূর্ববৎ তাঁহার দেখাশোনা করিতে লাগিলেন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ। ১লা জানুয়ারী সন্ধ্যার পর শরৎ মহারাজ বায়োস্কোপে 'লা মিজারেব্‌ল্' দেখিতে যান; ৪ঠা সন্ধ্যার পূর্বে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বাৎসরিক উৎসবে গমন করেন; ৫ই রামমোহন লাইব্রেরীতে সার জন্ উড্রফের বক্তৃতা শুনিয়া আসেন; এবং ৭ই বিবেকানন্দ সমিতির মাসিক অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন।

শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। ৪ঠা জানুয়ারী জন্মতিথির দিন তাঁহার শরীরে সামান্যভাবে জ্বর দেখা দেয়। চিকিৎসা সত্ত্বেও সেই জ্বর ক্রমশঃ প্রবলাকার ধারণ করে এবং তাঁহার দেহের অবস্থা শঙ্কাজনক করিয়া তুলে। ১৮ই জানুয়ারী স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ কর্তৃক প্রেরিত তারে সেই সংবাদ পাইয়া শরৎ মহারাজ মার প্রিয়শিষ্য ডাক্তার কাঞ্জিলাল, ডাক্তার সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, গোলাপ-মা, যোগীন-মা, স্বামী ভূমানন্দ ও দয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া জয়রামবাটী গমন করেন। কাঞ্জিলালের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় নিরাময় হইয়া ২৮শে জানুয়ারী মা অন্নপথ্য গ্রহণ করেন।

এই অসুখের পর শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে কলিকাতায় লইয়া আসিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মা তখন আসিতে সম্মত হইলেন না। শরৎ মহারাজ দয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া, কামারপুকুর ও বদনগঞ্জ হইয়া, কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং মায়ের সেবা ও সকল কাজে

সাহায্য করিবার জন্য শ্রীমতী সরলাকে জয়রামবাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। সরলাদেবী মায়ের শিষ্যা ও ধাত্রীবিদ্যাকুশলা ছিলেন।

বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রবোধবাবুর ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁহার বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার জন্য স্বামী সারদানন্দ বদনগঞ্জে গিয়াছিলেন। তথায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং জনসাধারণ তাঁহাকে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করে। বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "নিবেদিতা স্কুলের উইলে একটি সর্ত দিয়েচেন কি জান ?—'আমার স্কুলে যেন সরকারী সাহায্য না নেওয়া হয়।' Education should be cheap and national (শিক্ষা হবে স্বল্পব্যয়সাধ্য ও জাতীয়ভাবাপন্ন)।"

বদনগঞ্জ হইতে তাঁহাকে শ্যামবাজার গ্রামে প্রবোধবাবুর নিজ গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। শ্যামবাজার শ্রীরামকৃষ্ণের সাত অহোরাত্রব্যাপী সংকীর্তনবিলাসের স্মৃতি বুকে লইয়া তীর্থে পরিণত হইয়াছে। এখানে প্রবোধবাবুর এক জ্ঞাতিভ্রাতা কাতরভাবে শরৎ মহারাজকে বলেন, 'মহারাজ, আমি যে জীবনে অনেক কুকর্ম করেচি, আমার গতি কি হবে ?' সহানুভূতির স্বরে মহারাজ উত্তর দিলেন, 'এমন পাপ কি আছে গো, যাতে ভগবানের দয়া বন্ধ হয়ে যাবে ? আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে এক পা এগুলে ভগবান দশ পা এগিয়ে আসেন।' [প্র]

মার্চ মাসের মধ্যভাগে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হইতে কোয়ালপাড়ায় আসেন এবং কোয়ালপাড়া মঠের সন্নিকটে তাঁহারই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত 'জগদম্বা আশ্রমে' দেড় মাস বাস করেন। কোয়ালপাড়ায় আসিয়া মা পুনরায় জ্বরে আক্রান্ত হন এবং দিনের পর দিন জ্বর বাড়িতেই থাকে। ৫ই এপ্রিল কোয়ালপাড়া হইতে প্রেরিত তারে সেই সংবাদ পাইয়া শরৎ মহারাজ সেইদিনই ডাক্তার কাঞ্জিলাল, স্বামী ভূমানন্দ ও স্বামী পরমেশ্বরানন্দকে কোয়ালপাড়ায় পাঠাইয়া দেন। হরি মহারাজ

তখনও চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন, আবার সঙ্কটাপন্ন পীড়া লইয়া স্বামী প্রজ্ঞানন্দ চিকিৎসিত হইবার জন্য মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন; তাঁহাদের, বিশেষতঃ প্রজ্ঞানন্দের একটা ব্যবস্থা না করিয়া শরৎ মহারাজ নিজে যাইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার যাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া মা নিজেই বলিয়াছিলেন, 'তার অনেক কাজ, হয়তো অনেক অসুবিধা হবে।'

অসুখের পূর্ব হইতেই সরলা মায়ের সেবায় ছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন: "ডাক্তার কাঞ্জিলাল আসিয়া বুঝিলেন যে [শরৎ] মহারাজের আসা একান্ত দরকার। কারণ জর ক্রমশই বাড়িতেছে, আর ঐ অবস্থায় কেবল বলিতেছেন, 'কই শরৎ এল, আহা তার হাত কি ঠাণ্ডা, আমার সব দেহ জলে গেল!' মহারাজকে তার করা হইল, তিনি যোগীন মা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মা বলিয়া উঠিলেন, 'এই বাবা তুমি এসেচ!' তারপরে তাঁহার গায়ে হাত দিয়া ক্রন্দনের সুরে কত কথাই বলিতে লাগিলেন। কাছে বসিয়া মহারাজ মায়ের মাথায় হাত বুলাইতেছেন, হাওয়ায় মার চুলগুলি উড়িতেছে দেখিয়া হাত দিয়া সরাইয়া দিতেছেন আর বলিতেছেন, 'এই যে মা, এরা সব এসেচে—সেরে যাবেন।' পরদিনই [১৮ই এপ্রিল] মার জর ছাড়িয়া গেল। মহারাজ কহিলেন, 'এবার মা আপনাকে এখানে রেখে যাব না, সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যাব।'" [প্র]

তাড়াতাড়ি কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিবার জন্য শরৎ মহারাজ বিষ্ণুপুর হইতে বরাবর ঘোড়ার গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, এবং যোগীন-মা ব্যতীত ডাক্তার সতীশবাবু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বিষ্ণুপুর হইতে কোয়ালপাড়ার ব্যবধান প্রায় ২৩ মাইল হইবে।

শ্রীশ্রীমা অন্নপথ্য করিলেন দেখিয়া সকলেই যখন আনন্দে আছেন

এমন সময় একদিন সংবাদ আসিল যে, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রজ্ঞানন্দ একান্তভাবে শরৎ মহারাজের অনুগত ছিলেন, শরৎ মহারাজও সঙ্ঘের কাজে প্রজ্ঞানন্দের প্রতিভা উত্তরোত্তর অধিকতরভাবে নিয়োজিত হইবে এইরূপ আশা পোষণ করিতেন। গম্ভীরপ্রকৃতি শরৎ মহারাজ অন্তরের ব্যথা চাপিয়া রাখিয়া সেদিন শুধু বলিয়াছিলেন, 'প্রজ্ঞানন্দ ভদ্রলোক ছিল।' সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মেজাজ না হারাইয়া তিনি কথা কহিতে পারিতেন—এই অর্থে মহারাজ 'ভদ্রলোক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কোয়ালপাড়া মঠে সন্ধ্যারতির পর 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগবন্দন, বন্দি তোমায়'— স্বামিজী-রচিত চৌতালের এই গানটি প্রত্যহ গীত হইত। বেতালে, বেসুরে ও বিকট চীৎকারে সকলে মিলিয়া যেভাবে উহা গাহিতেন তাহা সঙ্গীতজ্ঞ শ্রোতার কানে বাজিত। অশেষ ধৈর্য সহকারে ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া শিখাইয়া শরৎ মহারাজ গানটি তাঁহাদের আয়ত্তীভূত করিয়া দিয়াছিলেন।

কোয়ালপাড়া হইতে, যাত্রা বদল করিবার জন্য, শ্রীশ্রীমা ২৮শে এপ্রিল জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৫ই মে তথা হইতে রওনা হইয়া ৭ই রাত্রি আটটায় কলিকাতায় পৌছেন। কোয়ালপাড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত মা পালকিতে আসিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে তখন লোকের ভীড়। উপরে শরৎ মহারাজের ঘরে হরি মহারাজ অসুস্থ। নীচে প্রজ্ঞানন্দের সহকর্মী শচীন তাঁহাকে অনুগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। ১৯শে জুলাই শ্রীশ্রীমা, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সকলের উপস্থিতিতে ভাগ্যবান শচীন শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য পুজনীয় বাবুরাম মহারাজকে দেওঘরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেখানে তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আক্রান্ত হন

ও তাঁহাকে লইয়া মহাপুরুষ মহারাজ কলিকাতায় বলরাম-ভবনে চলিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিবার মাত্র তিনদিন পরে, ৩০শে জুলাই বেলা ৪টা ১৫ মিনিটে তিনি মহাসমাধিমগ্ন হন। তাঁহার দেহত্যাগে শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজ বালকের ন্যায় রোদন করিতে থাকেন। শরৎ মহারাজও অশ্রুমোচন করিতে করিতে প্রথমতঃ তাঁহাকে শান্ত করিতে যত্নপর হইলেন এবং তিনি একটু স্থির হইলে বাবুরাম মহারাজের সুপবিত্র দেহ বেলুড় মঠে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার কথায় শরৎ মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরের মহাভাবের সময় বাবুরাম মহারাজ ভিন্ন আর কেউ তাঁকে ছুঁতে পারতেন না। স্বামিজী, মহারাজ এঁরা সকলেই বীরভাবের সাধক। বাবুরাম মহারাজের মনে পুরুষোচিত কোন ভাব ছিল না, তাই হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। ঠাকুরের লীলাসহচররূপে বাবুরাম মহারাজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেখানে স্বামিজীও নাই, আমাদের কা কথা। তোমরা বাবুরাম মহারাজের কথা যত বেশী চিন্তা করবে, ততই তোমাদের কল্যাণ হবে।'

দেবস্বভাব বাবুরাম মহারাজকে শরৎ মহারাজ কতখানি শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন তাহা একদিনের ঘটনায় কিছুটা বুঝিতে পারা গিয়াছিল। সেদিন ৺বিজয়া। মঠের পুরাতন ঘাটের নিকটে খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া শরৎ মহারাজ সাধু ও ভক্তগণের প্রণাম গ্রহণ করিতেছিলেন। এমন সময় বাবুরাম মহারাজ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া নতশিরে তাঁহাকে প্রণাম করিবার উপক্রম করিলেন। শরৎ মহারাজ অমনি খপ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং দুইহাতে এমনভাবে শূন্যে উঠাইলেন যে, তাঁহার পদযুগল শরৎ মহারাজের কপালে ঠেকিয়া গেল। 'কেমন, এবার হয়েচে তো?'—শরৎ মহারাজ কহিলেন। বাবুরাম মহারাজ যুক্তকরে নমস্কার করিলেন।

বাবুরাম মহারাজের দেহরক্ষার পর হরি মহারাজ বলরাম-ভবনে স্থানান্তরিত হন ও সেখান হইতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কাশীধামে সেবাশ্রমে চলিয়া যান।

এই বৎসর ভারতব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জায় যত লোক মরিয়াছিল, চারি বৎসরব্যাপী মহাযুদ্ধও তত লোকক্ষয় ঘটাইতে পারে নাই। এই মহামারীর সঙ্গে সঙ্গে দেশে বস্ত্রাভাব দেখা দেয়। শরৎ মহারাজের আগ্রহে প্রায় ছয় হাজার টাকা মূল্যের বস্ত্র সংগৃহীত হইয়া বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে মিশনের স্থায়ী কেন্দ্রসমূহ হইতে বিতরিত হইয়াছিল।

ডিসেম্বর মাসের একদিন শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করিলেন, 'মা, সকলে অনেকদিন ধরে বলচে আপনার জন্মতিথি-পূজা এখানে করবার জন্যে। আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে এখানে একটু উৎসব করা হয়।' মা কহিলেন, 'তা সকলে যখন চাইচে তা হলে হোক।'

উৎসবের দিন সকাল গঙ্গাস্নান করিয়া ও ঠাকুরপূজা সারিয়া শ্রীশ্রীমা তক্তাপোষের উপর পা ঝুলাইয়া বসিলেন। তাঁহার পরিধানে তসরের শাড়ী ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—কোনও ভক্ত দিয়াছেন। ভক্তেরা একে একে আসিয়া তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিয়া যাইতে লাগিলেন। ফুল জড় হইয়া ঘরের অর্ধেক ভর্তি হইয়া গেল। 'ও শরৎ, মাকে প্রণাম করবে এস' বলিয়া যোগীন-মা শরৎ মহারাজকে ডাকিয়া আনিলেন। আনন্দে ও আবেগে কম্পিতপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি মাকে প্রণাম করিলেন ও পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি না দিয়াই চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। 'কই পুষ্পাঞ্জলি দিলে না?'—এই বলিয়া যোগীন-মা তাঁহার হাতে ফুল তুলিয়া দিলেন; তিনি কম্পিতহস্তে কোনরূপে অঞ্জলিদান করিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীমার ভাইঝিরা—রাধু, মাকু, নলিনী সকলেই তখন কলিকাতায়

ছিল। মাকুর শিশুপুত্র ন্যাড়াকে মা ভালবাসিতেন ও হয়তো কোন ভক্ত আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিতেন। ন্যাড়া শরৎ মহারাজকে লাল-মামা বলিয়া ডাকিত ও সর্বদা তাঁহার কোলে চড়িয়া বেড়াইত। রাধু তখন অন্তঃসত্ত্বা ; সে কোন গোলমাল সহ্য করিতে পারিতেছিল না বলিয়া ৩১শে ডিসেম্বর মা তাহাকে লইয়া নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং বাড়ীতে চলিয়া যান ও কিছুদিন তথায় বাস করেন। ন্যাড়া তখন শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিত, 'তোমার মা কোথায়?' মাকুকে দেখাইয়া শরৎ মহারাজ বলিতেন, 'এই যে আমার মা।' ন্যাড়া বলিত, 'তোমার মা স্কুল-বাড়ীতে গেচে।'

স্কুল-বাড়ীতে যাইয়াও রাধু সুস্থ বোধ করিতেছে না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে লইয়া দেশে চলিয়া যান, এবং ১৯১৯ অব্দের ৩১শে জানুয়ারী হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন ছয়মাস কোয়ালপাড়ায় জগদম্বা আশ্রমে বাস করেন। এই সময়ে, এবং তাহার পরেও, মায়ের জন্য শরৎ মহারাজ যে কিরূপ চিন্তিত থাকিতেন, এবং কলিকাতায় থাকিয়াও কত দায় তাঁহাকে বহন করিতে হইত, মাতাঠাকুরাণীকে লিখিত পত্রসমূহ হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। সেইসকল পত্রের কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি লিখিয়াছেন: 'মা, আমার ও এখানকার সকলের অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন। কেদারের পত্রে আপনাদিগের সংবাদ প্রায়ই পাইতেছি, সেজন্য আপনাকে এতদিন পত্র লিখি নাই। রাধু পূর্বের মত আছে জানিয়া সকলে বিশেষ চিন্তিত আছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা যেন সে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে। পাতি-লেবু, বেদানা ইতিপূর্বে পাঠাইয়াছি। গতকল্য মহানারায়ণ তৈল পাঠান হইয়াছে। আপনি কোয়ালপাড়ায় কিছুকাল অবস্থান করিবেন জানিয়া খরচপত্রের জন্য কেদারকে ইতিপূর্বে ২৫৲ টাকা পাঠাইয়াছি। অদ্য আবার ২৫৲ টাকা পাঠাইলাম। আপনার হাতখরচার জন্য কিছু পাঠাইব কিনা লিখিবেন। কিশোরের পত্রে জানিলাম আপনি জয়রামবাটীতে পাইখানা নির্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। উহা করিতে কত ব্যয়

হইবে তাহার একটা আন্দাজ করিয়া লিখিবার জন্য তাহাকে ও কেদারকে আজ লিখিলাম ও উহা যত শীঘ্র হয় করিয়া দিতে বলিলাম।

"আপনার আশীর্বাদে এখানে সকলে সেইরূপই আছে। কৃষ্ণময়ীর [রামলালদাদার কন্যা কান প্রায় ভাল হইয়া আসিয়াছে। পাঁচসাত দিন বাদেই সে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিবে। নলিনী আজকাল কিছু ভাল আছে ও ভাতরুটি খাইতে পারিতেছে। কিছু বলও পাইয়াছে। এরূপ থাকিলে বোধ হয় ৮।১০ দিন বাদে দেশে যাইতে পারিবে। মনে করিয়াছি, তাহার যাইবার সময় বিভূতিকে আনাইয়া তাহার সহিত পাঠাইয়া দিব। স্যাড়ার ও আপনার সর্দি কেমন আছে লিখিতে বলিবেন।

"হরি মহারাজ কাশী গিয়াছেন। রাখাল মহারাজ পূর্বের ন্যায় আছেন—সম্প্রতি ৩।৪ দিনের জন্য আঁটপুর গিয়াছেন।...আমার পায়ের বাতটা প্রায় সারিয়াছে।...মাকুকে আশীর্বাদ। আশা করি সে এখন সম্পূর্ণরূপে সারিয়াছে।"

২৫শে ফেব্রুয়ারী লিখিয়াছেন: "আপনার ১১ই [ফাল্গুন] তারিখের অশীর্বাদী পত্র পাইয়া সুখী ও কৃতার্থ হইয়াছি। নলিনীকে কল্য সুরেশ ভট্টাচার্য ডাক্তার দেখিয়া, এবং পূর্বে যেসকল ঔষধের ব্যবস্থা বিপিন ডাক্তার ও দুর্গাপদ করিয়াছিল তাহাতে স্থায়ী ফল হয় নাই শুনিয়া, একজন মেম-ডাক্তারকে আনাইয়া পরীক্ষা করাইবার কথা বলিয়া যান। মেম-ডাক্তার আজ আসিয়া পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন এবং এখন বাড়ী না যাইয়া ২।৩ সপ্তাহ থাকিয়া যাইতে বলিয়াছেন।...

"দুইসের বেদানা ও ৫০টা পাতিলেবু কাল পার্শেলে পাঠাইব। পরে নলিনী যখন যাইবে তখন আবার পাঠাইব। স্যাড়ার ঢোলক ঐসময় পাঠাইব।

"স্যাড়ার মিন্‌মিনে সারিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। রাধু প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ সারিবে কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তাহার বায়ুরোগটা যেন কমিয়া যায় ইহাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

"কৃষ্ণময়ীর কান অনেকটা সারিয়াছে। এখন সে আপনিই ঔষধ (মলম) লাগায়। কাল তাহার দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার কথা আছে।...রামের মা ও পরিবারবর্গকে লইয়া রাম [বলরামবাবুর পুত্র] কাল কাশী গিয়াছে। সেখান হইতে বৃন্দাবনে যাইবার কথাও আছে। রামের মার শরীর বদহজমে বিশেষ দুর্বল হওয়ায় বায়ুপরিবর্তন করিতে যাইতে হইয়াছে।"

২৭শে ফেব্রুয়ারীর পত্র: "...গতকল্য পার্শেলে ৫০টা লেবু (কাগজী) ১৬টা বেদানা পাঠাইয়াছি। উহার মূল্য ছয়টাকা নয় আনা (৬।৶০) ও পাঠাইবার খরচ তিনটাকা

সাত আনা (৩।৶০)—মোট দশ টাকা পড়িয়াছে। পার্শেলে জিনিস পাঠাইতে অত্যন্ত খরচ পড়ে বলিয়া এতদিন পাঠাই নাই। যাহা হউক, ফুরাইলেই সংবাদ দিবেন, আবার পাঠাইয়া দিব।

"নলিনী পূর্বের ন্যায়ই আছে। কয়েকদিন ভাল, আবার কয়েকদিন পেটে কোমরে ব্যথা, প্রস্রাবের যন্ত্রণাদি হয়। এখন উহারই মধ্যে ভাল আছে।...কৃষ্ণময়ীর কান কাটবার পরে বেশ ছিল। আজ দুইদিন হইল আবার যেন একটু খারাপ বোধ হইতেছে। ললিতের ছেলেটির জ্বর একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই, কখন কখন বৃদ্ধিও হয়। ডাক্তারেরা বলিতেছে পীড়া কঠিন।...

"কেদারকে ও কিশোরকে বলিয়া জয়রামবাটীতে পাইখানাটি বর্ষার পূর্বেই যাহাতে হয় তাহা করাইয়া লইবেন।

"এদিকে দেশের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। অন্যান্য বারের ন্যায় এবার হাতে টাকাও আসিতেছে না যে এই দু:সময়ে লোককে সাহায্য করি। বাঁকুড়ায় ইন্দপুরে ও মানভূমে মঠ হইতে লোক পাঠাইয়া অল্প স্বল্প সাহায্য করা হইতেছে। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত চালাইতে পারিলে হয়।

"অদ্য কেদারের পত্রে রাধুর জ্বর হইয়াছে, জানিয়া উদ্বিগ্ন রহিলাম। সে কেমন থাকে লিখিতে বলিবেন। আপনার শরীর ভাল থাকিলে তবে আমাদিগের বল বুদ্ধি ভরসা থাকিবে ও রাধুর সেবাযত্ন চলিবে—সেজন্য আপনার শরীরটার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিবেন। অধিক আর কি লিখিব।..."

২১শে মার্চের পত্র : "মা,...যোগীন-মা আপনাকে লিখিতে বলিলেন যে, রাধুর মাথা-গরমের জন্য এখন হইতে আর ঠাণ্ডা ঔষধ, তেল, বরফ ইত্যাদি অধিক ব্যবহার করাইবেন না। প্রসব হইবার পরেই ঐ মাথা-গরম আপনি ভাল হইয়া যাইবে। ঠাণ্ডা তৈলাদি অধিক ব্যবহার করিলে প্রসবের পরে সান্নিপাতিক আদি অন্য অসুখ হইবার সম্ভাবনা আছে।...

"বাঁকুড়ার বৈকুণ্ঠ ডাক্তারকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন কি? তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছি, চৈত্রমাসের যে তারিখ হইতে আপনি তাহাকে কোয়ালপাড়ায় আসিয়া থাকিতে বলিবেন সেই তারিখ হইতেই সে আসিয়া থাকিবে।

"কাল (শনিবার) প্রাতে নলিনী সুরেশ্বর সেনের পুত্র কালোর সহিত এখান হইতে রওনা হইবে। এইমাত্র কাঞ্জিলাল আসিয়া তাহাকে দেখিয়া বলিয়া যাইল, নলিনী

এখন দেশে যাইতে পারে। ...নলিনীর সহিত ডালিম, বেদানা, আর পটল, মিষ্টান্ন, লেবু (কাগজী) ইত্যাদি পাঠাইতেছি।"

৩রা এপ্রিলের পত্র: "পরমারাধ্যা মা, আগামী শনিবার প্রাতের গাড়ীতে শ্রীমতী সরলাকে পাঠান স্থির হইয়াছে। তাহার সহিত একটী পাহাড়ী স্ত্রীলোক, নাম রুমাদেবী, যাইবে। মতিলাল ডাক্তার...উহাদের দুইজনকে লইয়া যাইবে।...রুমাদেবীর বাটী মায়াবতী হইতে কৈলাসে যাইবার পথে। সে ভদ্রবংশীয়া এবং বিশেষ ধর্ম-পরায়ণা। আপনার ও ঠাকুরের কথা অনেকদিন হইতে শুনিয়া বিশেষ অনুরাগিণী হইয়া উঠে, এবং আপনাকে দর্শন করিবার এবং আপনার নিকটে দীক্ষিত হইবার জন্য প্রায় মাসাবধি হইল এখানে আসিয়া সুধীরাদের সহিত রহিয়াছে। ঠাণ্ডা দেশের লোক, এখানে গরমে বড় কষ্ট হইতেছে দেখিয়া তাহাকে আপনার নিকটে পাঠাইলাম। উহাকে কৃপা করিয়া আপনি দীক্ষা দিবার পরেই সে মতিলাল ডাক্তারের সহিত মায়াবতী হইয়া বাটী যাইবে।

"শ্রীযুত নারায়ণ আয়াঙ্গার ছুটি লইয়া বাঙ্গালোর হইতে এখানে আসিয়াছেন।... আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া যাইতে চাহেন। সেজন্য ইনিও শনিবার আপনার নিকটে যাইতেছেন।...

"কাঞ্জিলাল নলিনীর জন্য ঔষধ পাঠাইয়াছে। বোধ হয় এতদিনে পৌছিয়াছে। নলিনী বলিয়াছিল জয়রামবাটী যাইবে, কিন্তু যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় তাহার রথও কোয়ালপাড়ায় আটকাইয়া গেল। তাহার এখানে থাকাই ছিল ভাল, যাইতে নিষেধও করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিল না। মাকুর প্রসব হওয়াও বোধ হয় কোয়ালপাড়ায় স্থির হইয়াছে? ন্যাড়ার ঢোলটি ভাল করিয়া ছাওয়াইয়া সরলার সহিত পাঠাইতেছি। সে ভাল আছে বোধ হয়।...

"সময়ে স্নানাহার করিয়া আপনার শরীর ভাল রাখিবেন। নতুবা এই হাঙ্গামায় আপনার শরীর অসুস্থ হইলে সব দিকে গোল হইবে। মধ্যে আপনার দুইদিন বেদনা ধরিয়াছিল, এখন কেমন আছেন?

"কাশীতে রামের মার অত্যন্ত পেটের অসুখ হইয়া শয্যাগত হইয়াছেন।...

"আপনার ভক্ত মেমের কন্যার দুইমাস পরে বিবাহ। আপনার কৃপায় সৎপাত্র জুটিয়াছে। সে আপনাকে প্রণাম দিয়া ঐ কথা জানাইতে বলিয়াছে। সরলার নিকটে মেম সাহেবের সকল কথা শুনিবেন।..."

১৭ই এপ্রিলের পত্র : "মা, আমাদিগের অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনার শরীর এখনও খুব দুর্বল আছে শুনিলাম। শরীরের ঐরূপ অবস্থায় অধিক পরিশ্রম, অথবা আহারাদির অল্প অনিয়মেই পুনরায় অসুখ হইবার সম্ভাবনা। অতএব একটু সাবধানে থাকিবেন। আমেরিকা হইতে দেবমাতার একখানি পত্র আসিয়াছিল। উহা আপনাকে পাঠাইয়াছি। ঐ পত্র আসিবার পরে পরমানন্দ (বসন্ত) মণিঅর্ডার ডাকে আপনাকে ৪৬।/০ মাত্র ছচল্লিশ টাকা পাঁচ আনা পাঠাইয়াছে। উহা আপনাকে এখনই পাঠাইব কিনা লিখিবেন। আপনার আশীর্বাদে সম্প্রতি এখানকার কুশল। কেবল কাশীতে রামের মা খুব ভুগিতেছেন।...মাকু ও নলিনী কেমন আছে—পুনরায় কোয়ালপাড়ায় শীঘ্র আসিবে কি? রাধু পূর্বের অপেক্ষা একটু সুস্থ হইতে পারিয়াছে কি? সরলার জ্বর হইয়াছিল, কেমন আছে?"

২৯শে এপ্রিলের পত্র : "মা, শ্রীচরণাশ্রিত সন্তানের এবং এখানকার সকলের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। যে শোচনীয় সংবাদ (ন্যাড়ার মৃত্যু) জয়রামবাটী হইতে সহসা আসিয়া আমাদিগকে অস্থির করিয়াছে তাহাতে না জানি আপনি কতই কাতর হইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের খেলা তিনি জানেন, আমরা উহার কি বুঝিব! উহা না বুঝিতে পারার জন্য যে কষ্ট তাহা ভোগ করিতেই হইবে—সেটাও তাঁহারই ইচ্ছায়!

"কালী-মামাকে লইয়া গণ্ডগোলের কথা জানিলাম। বিশ্বাসদিগের অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্য আপনার আদেশ কেদারের চিঠিতে পাইয়াছি। ঐ বিষয়ে আমার মতামত কেদারকে পত্রোত্তরে সবিস্তার লিখিয়াছি এবং আপনাকে উহা জানাইতে বলিয়াছি। শুনিয়া ঐরূপ করিতে বলেন ত করিব। ললিত এখন এখানে উপস্থিত আছে।...সে বলিল, 'নালিশ করিবার পূর্বে, শ্রীশ্রীমার নিকটে আমি যে দুইখানি চিঠি রাখিয়া দিয়াছি সেই চিঠি দুইখানির মধ্যে একখানি শম্ভু রায়কে এবং অপরখানি শিরোমণিপুরের দারগাকে দেওয়া হউক। তাহা হইলে হয়ত সহজেই কাজ পাওয়া যাইবে। নালিশ ইত্যাদি করিতে হইবেনা। আমারও তাহাই মত।...

"আজ জয়রামবাটী হইতে কিশোরীর একখানি পত্র পাইলাম। সে লিখিয়াছে, নলিনী ও মাকুর সহিত থাকিবার জন্য একজন স্ত্রীলোককে আপনি তথায় পাঠাইয়াছেন। উহাদের তিনজনের জন্য যে খরচপত্র হইতেছে তাহার অধিকাংশ তাহাকে দিতে হইতেছে। তাহা ছাড়া, আরও দুই এক জন উপরি লোক আপনার বাড়ীতে প্রায়ই থাকে। তাহাদের জন্যও খরচা তাহাকে চালাইতে হয়।...তাহার কিছু টাকার

প্রয়োজন ।...আমার বোধ হয় আমাকে ঐ বিষয় না জানাইয়া কিশোরীর আপনার নিকট হইতে ঐ টাকা লইয়া যাওয়া ভাল। আপনার কোয়ালপাড়ায় সংসার-খরচের জন্য আমি কেদারকে প্রতিমাসে প্রায় দেড়শত টাকা করিয়া পাঠাইতেছি। এই মাসে (এপ্রিল মাসে) দুইশত টাকা পাঠাইয়াছি। আপনি জয়রামবাটীর খরচের জন্য যখন যত টাকা আবশ্যক হইবে কেদারের নিকট হইতে লইয়া কিশোরীকে দিবেন।...

"সরলাকে আশীর্বাদ। কাঞ্জিলাল তাহাকে বলিতে বলিয়াছে যে, সে (সরলা) যেন রাধুর ছটফটানি বা আপনার কাতরতা দেখিয়া প্রসব-বেদনার সময় মাথা গুলাইয়া না ফেলে—হাসপাতালে ঐরূপস্থলে রোগীর প্রতি যেরূপে কর্তব্য পালন করিয়া থাকে সেইভাবে সে যেন...নিজ কর্তব্য করিয়া যায়।"

৭ই সেপ্টেম্বরের পত্র: "মা....আপনার ৩রা ভাদ্রের পত্র পাইবার কিছুদিন পরে নলিনীকে পাঁচটাকা পাঠাইয়াছিলাম। রামলালদাদাকেও পাঁচটাকা দিয়া নলিনীর যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয় তাহা দেখিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। বরদার ১৯শে ভাদ্রের পত্রে জানিলাম আশ্বিনের গোড়াতেই নলিনীকে জয়রামবাটী পাঠাইয়া দেওয়া আপনার অভিপ্রায়। তাহাই করিব। বিভূতিকে অদ্য ঐজন্য পত্র লিখিব।

"আগামী কল্য আপনাকে ৫০৲ টাকা পাঠাইব। পরে যখন যেমন আবশ্যক হইবে লিখিলেই পাঠাইয়া দিব। আপনার কোয়ালপাড়ায় থাকিবার কালে কেদার টাকার অভাব হইলে যত টাকা পাঠাইতে লিখিত তত পাঠাইয়া দিতাম। কোয়ালপাড়ায় আপনি ছয়মাস ছিলেন। ঐকালে আপনার ২২৯।৷৹ করিয়া মাসে খরচ পড়িয়াছে ও পাঠাইয়াছি। এখন আপনার তহবিলে পাঁচশত টাকা মাত্র মজুত আছে জানিবেন।

"মন্মথকে [রাধুর স্বামী] চিকিৎসা করিবার কথা দুর্গাপদকে বলিয়া পাঠাইয়াছি।..রাধু একদিন মাত্র দাঁড়াইয়াছিল, পরে আর দাঁড়ায় নাই জানিয়া দুঃখিত হইলাম।...

"আপনার এখন কলিকাতায় আসা অসম্ভব। এদিকে দারুণ জ্বরের সময় উপস্থিত। একটু সাবধানে থাকিবেন ও সময়ে আহারাদি করিবেন। অধিক আর কি লিখিব।..."

১৯শে সেপ্টেম্বরের পত্র: "...রাধুর খোকার অন্নপ্রাশনের দিন দেখাইয়াছি। যদি ছয়মাসে অন্নপ্রাশন দেন তাহা হইলে একমাত্র দিন আগামী ৯ই কার্তিক। ঐ দিনে না হইলে আটমাসে অন্নপ্রাশন দিতে হইবে জানিবেন। সুতরাং ৯ই কার্তিক যাহাতে নিশ্চয় অন্নগ্রহণ হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আগামী কল্য প্রাতের গাড়ীতে নলিনীর জয়রামবাটী যাইবার কথা। কালো সঙ্গে যাইবে।

"মঠে প্রতিমা আনিয়া পূজা হইতেছে—আশীর্বাদ করিবেন, সুসম্পন্ন হয়।

"ডাক্তার দুর্গাপদ রাধুর পায়ে দিবার জন্য একশিশি মালিস পাঠাইয়াছে। রাধুকে বুঝাইয়া বলিবেন উহা লাগাইলে শীঘ্র হাঁটিতে পারিবে।...ম্যালেরিয়ার সময় আপনি সাবধানে থাকিবেন।"

শ্রীশ্রীমাকে শরৎ মহারাজ যেসকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ১৯৩০ অব্দে বহু অনুসন্ধান করিয়া কোয়ালপাড়ায় খামে লিখিত মোট এগারখানি ও জয়রামবাটীতে কার্ডে লিখিত মাত্র একখানি পত্র পাইয়াছিলাম।

কোয়ালপাড়ায় জগদম্বা আশ্রমে শ্রীশ্রীমার অবস্থানকালে স্থানীয় আশ্রমের অধিবাসীরা তাঁহার যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ করিতেন। মা জয়রামবাটীতে থাকিলে, কোতুলপুরের হাটে তরীতরকারী কিনিয়া সপ্তাহে দুইদিন তাঁহারা মাথায় করিয়া উহা মাকে দিয়া আসিতেন। এইসকল কারণে শরৎ মহারাজ কোয়ালপাড়ার মত গ্রাম্য আশ্রমের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন ও আশ্রমবাসীদের সর্ববিধ কল্যাণ যাহাতে হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। বিবাহিত-জীবন সত্ত্বেও নিজেদের ভূসম্পত্তি দান করিয়া কেহ কেহ ঐ আশ্রমে যোগদান করিয়াছিলেন। কালে বৈষয়িক স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া অন্তর্বিবাদের সূত্রপাত হয় ও আশ্রমকর্মীরা একে একে সরিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৯১৯ অব্দের ৪ঠা এপ্রিল আশ্রমাধ্যক্ষকে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছিলেন: "আমি তোমাদের যথার্থ মঙ্গলকামনা করিয়া আসিয়াছি ও করিয়া থাকি—সেইজন্যই যাহাতে তোমাদের কোনরূপে আয়বৃদ্ধি হইয়া অঋণী অবস্থায় থাকিয়া মোটা ভাতকাপড় পাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে সর্বান্তঃকরণে ডাকিতে পার তাহার চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু দিনদিন তোমাদের পরস্পরের ভিতর যেরূপ মনোমালিন্য আসিয়া উপস্থিত হইতেছে দেখিতেছি তাহাতে আমার চেষ্টা বৃথা হইতেছে বলিয়া আশঙ্কা

হইয়াছে। আমার বোধ হয়, স্বার্থ, বিষয়বাসনা, প্রভুত্বের ভাব, অহঙ্কার ইত্যাদি তোমাদের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তোমাদের একযোগে কার্য করিবার ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দিতেছে এবং এখনও যেটুকু আছে তাহাও ভবিষ্যতে নষ্ট করিয়া দিবে—যদি এখন হইতে তোমরা, বিশেষতঃ তুমি সাবধান না হও। তোমাকে ঐকথা বিশেষ করিয়া বলিতেছি, কারণ, যে অধ্যক্ষ তাহার ভিতরে ঐসকল ভাব ঢুকিলেই কার্য একেবারে পণ্ড হইবে এবং বোধ হয় কিছু কিছু ঢুকিয়াছে, নতুবা ক— প্রভৃতির সহিত তোমার এত মতের গরমিল হয় কেন, যাহাতে তাহারা চিরকালের মত পলাইতে চাহে—সরলহৃদয় বালকেরাই বা কেন মঠ ছাড়িতে চাহে ?"

অশেষ ধৈর্য্য ও সহানুভূতি লইয়া স্বামী সারদানন্দ বৎসরের পর বৎসর যেভাবে উক্ত আশ্রমের কল্যাণচেষ্টা করিয়াছেন ইহা তাঁহার মত মহাপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। ১৯২৫ অব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ক্ষুদ্র এই আশ্রমটির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে যত পত্র রামকৃষ্ণ মিশনের অবসরহীন সম্পাদককে লিখিতে হইয়াছে তাহার সংখ্যা অন্যূন দুইশত হইবে। আশ্রমাধ্যক্ষের কোনও অপরাধই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, বরং অনুকম্পার উদ্রেক করিয়াছে, এবং তাঁহার দেহত্যাগে তিনি বন্ধুবিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করিয়াছেন। দোষত্রুটি সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি যে বহুগুণে গুণী ছিলেন, এবং সাধ্যানুযায়ী মায়ের সেবা করিয়াছেন, এই কথাটা কখনও তিনি বিস্মৃত হন নাই।

* * *

১৯১৯ অব্দে ঠাকুরের জন্মমহোৎসবের দুইদিন পূর্বে, ৭ই মার্চ সকালের দিকে বাঙ্গলার লাট লর্ড রোণাল্ডসে বেলুড় মঠে আসিলেন ও দর্শনীয় যাবতীয় বস্তুই দেখিতে চাহিলেন। স্বামী সারদানন্দ সর্বপ্রথম তাঁহাকে ঠাকুরঘরে লইয়া যান। ঠাকুরঘরে জুতা-পায়ে প্রবেশ করা চলে না;

লাটসাহেব তাহাতে বিব্রত বোধ করিতেছেন দেখিয়া নিরভিমান সারদানন্দ তৎক্ষণাৎ নত হইয়া তাঁহার জুতার ফিতা খুলিয়া দেন। উৎসবের রন্ধনশালায় তখন বোঁদে হইতেছিল, অভ্যাগত ব্যক্তি ভিয়ানের কাজ দেখিয়া সাগ্রহে উহার খুঁটিনাটি জানিয়া লইয়াছিলেন।

চন্দ্রমোহন দত্ত গরীব লোক ও উদ্বোধন কার্যালয়ের বেতনভুক কর্মচারী। ১৬ই এপ্রিল শরৎ মহারাজ তাহাকে একখানা গাড়ী লইয়া আসিতে বলিলেন। তিনি কোথায় যাইবেন জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, 'তোমার বাবাকে দেখতে যাব।' একথায় চন্দ্র প্রমাদ গণিল। কারণ, গাড়ীভাড়া দিবার মত সংস্থান তাহার নাই, আর যে সরু গলি দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হইবে তাহা এতই অপ্রশস্ত যে শরৎ মহারাজের মত মোটা মানুষ সোজা হইয়া চলিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। সে উভয় সঙ্কটের কথা নিবেদন করিলে মহারাজ কহিলেন, 'গাড়ী নিয়ে তো এস, তারপর দেখা যাবে।'

চন্দ্রমোহনকে সঙ্গে লইয়া শরৎ মহারাজ গাড়ীতে উঠিলেন ও যথা-সময়ে গাড়ী সেই সরু গলির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সোজা হইয়া চলা তাঁহার পক্ষে সত্যেই অসম্ভব দেখিয়া তিনি পাশে হাঁটিয়া কোন-রূপে সেই বাড়ীর দরজায় আসিলেন ও গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে চন্দ্রমোহনের পিতার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিলে তিনি চন্দ্রমোহনকে কহিলেন, 'আমার পায়ের ধূলা নিয়ে তোমার বাবার মাথায় দাও।' তারপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কাশীতে যাবার ইচ্ছা আছে?—কাশীতে যাবেন?' বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি মায়ের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পর আটদিন গত হইল। ২৫শে এপ্রিল মধ্যাহ্নভোজন সারিয়া চন্দ্র পুস্তকের পার্শেল লইয়া শিয়ালদহ রওনা হইবে এমন সময়

শরৎ মহারাজ কহিলেন, 'আগে বাড়ী গিয়ে তোমার বাবা কেমন আছেন দেখে এস, তারপর ষ্টেশনে যেয়ো।' আহারান্তে তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, হঠাৎ পাশ ফিরিয়া দেখিলেন চন্দ্র দরজার ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া। সে কহিল, 'বাবার শেষ সময় উপস্থিত।' শরৎ মহারাজ উঠিলেন ও দেরাজ খুলিয়া পনরটি টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, 'তোমার বাবার ক্ষত রয়েচে, প্রায়শ্চিত্ত করাওগে। বাকি যা থাকে তা দিয়ে ঘাটের কাজ কোরো।' তাঁহার দিনলিপিতে চন্দ্র-মোহনের পিতার মৃত্যুসময় উল্লিখিত আছে দেখা যায়।[৩]

১৯১৯ অব্দ দেশের পক্ষে সত্যই দুর্বৎসর। ফেব্রুয়ারীর শেষাংশে শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে লিখিয়াছিলেন, 'দেশের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।' মিশনের পক্ষ হইতে তখন পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়ায় ও মানভূমে সেবাকার্য চলিয়াছিল। বৎসরের মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরায় সেবাকেন্দ্র খোলা হয়। ৺পূজার প্রাক্কালে ভীষণ ঘূর্ণীঝঞ্ঝা পূর্ববঙ্গ ছারখার করিয়া দেয় ও সাহায্য পাঠাইবার জন্য নানাস্থান হইতে মঠে আবেদন আসিতে থাকে। তখন বিক্রমপুরে সাহায্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া মিশনের কর্মীরা সেবাকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

৩১শে অক্টোবর স্বামী ব্রহ্মানন্দ নবনির্মিত ভুবনেশ্বর মঠের প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন করিলেন। উড়িষ্যাতে ঐসময়ে দুর্ভিক্ষের করালরূপ প্রকট হইয়াছে; নিরন্নগণের কঙ্কালসার মূর্তিসমূহ একমুষ্টি অন্নের প্রত্যাশায় হৃদয়বিদারক আর্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে। সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিবার ভয়ে শরৎ মহারাজ প্রতিষ্ঠাকার্যে যোগ দিতে পারিলেন না। তাঁহার দিনলিপিতে লেখা আছে: Decided not to go to Bhubaneswar after hearing about the miserable sight of famished people due to famine.

---

৩ Chandra's father died at 5-30 P. M.

বহুলোকের অন্নকষ্ট নিবারণ যখন সামর্থ্যের অতীত বিষয় হইয়া উঠিত ও বুভুক্ষুর হাহাকার মর্মস্থল আলোড়িত করিত সারদানন্দ তখন সকল কথা শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করিয়া সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিতেন। ঠিক কোন্ সময়ে বলিতে পারি না, লোকের অপরিসীম দুঃখকষ্টের বর্ণনা দিয়া ও যাহাতে তাহা দূরীভূত হয় তজ্জন্য প্রার্থনা জানাইয়া তিনি মাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি শুনিতে শুনিতে করুণাময়ী মার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুপূর্ণলোচনে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'লোকের দুঃখকষ্ট আর দেখতে পারি না, ঠাকুর, তাদের সকল দুঃখজ্বালার অবসান কর।' তারপরে নিকটস্থ ভক্তদিগকে কহিলেন, 'শরতের দিল দেখলে ? নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে না। ব্রহ্মজ্ঞ হয়তো অনেকে আছেন, শরতের মত এমন হৃদয়বান দিলদরিয়া লোক ভারতবর্ষে নাই, সমস্ত পৃথিবীতে নাই। জীবের দুঃখে প্রাণ কাঁদা !—যেন পালনকর্তা, সকলকে অন্নদান করচে।' যাঁহার মহাপ্রাণতার কথায় স্বয়ং মা এইরূপে শতমুখ হইয়া উঠিতেন, আমরা স্বার্থান্ধ মানব তাঁহার মহত্ত্বের কতটুকুই বা ধারণা করিতে পারি। আর একবার মা বলিয়াছিলেন, 'শরতের সমান কেউ নাই, শরতের যত বড় বুকখানি, তত বড় হৃদয়খানি।' [প্র]

২৫শে নভেম্বর সান্যাল মহাশয়, যোগীন-মা ও স্বামী ভূমানন্দকে সঙ্গে লইয়া শরৎ মহারাজ ৺কাশীতে আসেন ও প্রায় দুইমাস শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে বাস করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান কাশীর সেবাশ্রমের অভ্যন্তরে তখন ভীষণ গোলযোগ চলিতেছিল ও সেই গোলযোগ দূর করিবার জন্য তিনি আহূত হইয়াছিলেন। দুই আশ্রমে মিলিয়া কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সাধুসংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না ; মিশনের সম্পাদক স্বয়ং আগমন করায় বিবিধ জল্পনা মুখর হইয়া উঠিল।

পূজনীয় হরি মহারাজ তখন সেবাশ্রমে স্থায়িভাবে বাস করিতেছেন।

তাঁহার সহিত কথা কহিয়া শরৎ মহারাজ সকলকে জানাইয়া দিলেন: তিনি কাহারও বিচার করিতে আসেন নাই; সেবাশ্রমের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, তিনি এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহেন যাহাতে ভবিষ্যৎ কাজকর্ম পূর্ববৎ শৃঙ্খলার সহিত চলে অথচ সেবার ভাবটিও অব্যাহত থাকে; এই সম্বন্ধে প্রত্যেক সাধু বা কর্মী মৌখিক অথবা লিখিত মতামত দিতে পারিবেন এবং কাহারও কিছু গোপনে বলিবার থাকিলে সেই সুযোগও তিনি পাইবেন।

যথা সময়ে সেবাশ্রমের জন্য নূতন বিধি শরৎ মহারাজ রচনা করিলেন। এই বিধি অনুসারে, সেবাশ্রমের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণকে ও অদ্বৈত আশ্রমের দুইজন সাধুকে লইয়া এক কার্যকরী সমিতি গঠিত হইবে এবং সভ্যগণের অধিকাংশের মতানুসারে সকল কাজ চলিবে; রুগ্ন স্ত্রীলোকদের পরিচর্যা কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরাই করিবেন, পুরুষের সংশ্রব তাহাতে থাকিবে না; মেয়েদের হাসপাতালটিও কিঞ্চিৎ ব্যবধানে সংস্থাপিত হইবে।

নূতন ব্যবস্থা, বিশেষতঃ ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তে সমিতির কর্তৃত্ব প্রবর্তন করিতে শরৎ মহারাজকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের নাম করিয়া কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ যদি বলেন তবেই আমরা একথা মেনে নিতে সম্মত আছি।' নিরভিমান শরৎ মহারাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'ঠিক কথা বলেচ। আমরা সকলেই যখন মহারাজকে মানি তখন তিনি যা বলবেন তাই হবে।' মহারাজকে পত্রদ্বারা সকল কথা নিবেদন করা হইল; উত্তরে তিনি লিখিয়া জানাইলেন, 'শরৎ যাহা করিতেছে তাহা আমার ব্যবস্থা বলিয়া জানিবে।'

একদিন শরৎ মহারাজ ও হরি মহারাজের সমক্ষে জনৈক ব্যক্তি অপরের দোষ উদ্‌ঘোষণে তৎপর হইলে আর একজন বলিয়া উঠিল,

'প্রমাণ কি?' হরি মহারাজ বলিলেন, 'আমার কিন্তু একথা বিশ্বাস হয়।' চিরমধুরস্বরে শরৎ মহারাজ কহিলেন, 'হরি মহারাজ, আমি একথা বিশ্বাস করতে পারি না।' তখন হরি মহারাজ বলিতে লাগিলেন, 'আমাদের কেমন স্বভাব, লোকের দোষের কথা শুনলেই বিশ্বাস করে থাকি, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখচি তুমি তা কর না।' আত্মপ্রশংসা শুনিলে শরৎ মহারাজ বিব্রত বোধ করিতেন; তিনি কহিলেন, 'আমি সাধ্যানুযায়ী স্বামিজীর আদেশ পালন করে থাকি মাত্র—তিনি আমাকে বলেছিলেন, এক কানে কথা শুনবে, অপর কান দিয়ে তা বের করে দেবে; বিশেষভাবে না জেনে শুনে কাউকে দোষী ঠাউরাবে না।'

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ। পয়লা জানুয়ারী সকালে শরৎ মহারাজ অনেকক্ষণ জপধ্যান করিলেন। তারপরে তক্তাপোষে বসিয়া চা-পান শেষ করিয়াছেন মাত্র এমন সময় বুড়োবাবা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। তারপরে অদ্বৈতাশ্রমের চন্দ্র মহারাজ ও স্বামী মহিমানন্দ এবং সেবাশ্রমের কেদারবাবা, চারুবাবু ও কালীবাবু অগ্রপশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুড়োবাবা মহারাজের পাশেই তক্তাপোষের উপর বসিয়াছেন। চন্দ্র মহারাজ আতুর মানুষ—তাঁহাকে বসিবার জন্য কেদারা দেওয়া হইয়াছে, আর সকলেই মেজেতে উপবেশন করিয়াছেন।

তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে শরৎ মহারাজ হঠাৎ কি ভাবিয়া তক্তাপোষ হইতে নামিয়া আসিলেন এবং যুক্তকরে মিনতির সুরে শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে বলিতে লাগিলেন, 'গত কথা সব ভুলে যাও। ঠাকুর-স্বামিজীর কাজ করতে এসে সামান্য কারণে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি কোরো না। আমি হাত জোড় করে বলচি, তোমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে, ভালবাসতে থাক, সব গোলযোগ আপনা হতে চলে যাবে।' তিনি আর বলিতে পারিলেন না, হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার ভাবে সকলে অভিভূত

হইলেন। কেদারবাবা, চারুবাবু ও কালীবাবু নীরবে একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তারপরে মহারাজ তাঁহাদের সকলের সহিত চন্দ্র মহারাজের মিলন করাইয়া দিলেন। দুই আশ্রমের মধ্যে দীর্ঘকাল মন-কষাকষির ফলে যে মালিন্য সঞ্চিত হইয়াছিল, নববর্ষের প্রথমদিনে চোখের জলে তাহা ধুইয়া মুছিয়া গেল।

উভয় আশ্রমের সকলের আগ্রহে স্বামিজীর জন্মোৎসব পর্যন্ত কাশীতে থাকিয়া শরৎ মহারাজ ২০শে জানুয়ারী কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। কলিকাতা হইতে সান্যাল মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি ভুবনেশ্বর যাত্রা করেন এবং দশদিন ভুবনেশ্বর মঠে শ্রীমহারাজের সহিত আনন্দে অতিবাহিত করিয়া ১৭ই সকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়াই জয়রামবাটীর পত্রে তিনি অবগত হইলেন যে, মাতাঠাকুরাণী জ্বরে ভুগিয়া ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন।

শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী। ১৩ই ডিসেম্বর জন্ম-তিথির দিন হইতে তাঁহার শরীরে অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল, এবং মাঝে মাঝে জ্বরের বিরাম ঘটিলেও ইহা একেবারে বন্ধ হয় নাই। শরৎ মহারাজ মাকে কলিকাতায় রাখিয়া চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন ও তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য স্বামী ভূমানন্দ, আত্মপ্রকাশানন্দ ও বশীশ্বর সেনকে জয়রামবাটীতে পাঠাইলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী জয়রাম-বাটী হইতে যাত্রা করিয়া মা ২৭শে কলিকাতায় আসিলেন।

হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, এলোপ্যাথি একে একে সকলপ্রকার বিধান অনুসারেই চিকিৎসা করানো হইল, ঔষধপথ্য ও সেবার সুবন্দোবস্ত করা হইল, কিন্তু কিছুতেই স্থায়ী ফল ফলিল না। জীবের অসহ্য পাপজ্বালার ভোগ জ্বরজ্বালারূপে স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়া করুণা-ময়ী জননী স্থূলে লীলা সম্বরণের উদ্যোগ করিয়াছেন—ভাগীরথী সাগর

সঙ্গমে চলিয়াছেন, একথা অপরে বুঝিতে না পারিলেও সারদানন্দ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন। তথাপি ব্যাধির প্রতিকারে তিনি কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করিলেন না; কেবলমাত্র মানবীয় চিকিৎসায় ফল হইতেছে না দেখিয়া সেই সঙ্গে দৈবপ্রতিকারও আরম্ভ করাইলেন—১৪ই মে হইতে কিছুদিন ধরিয়া শান্তিস্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে তিনি মার দেহের অবস্থা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে দৈনন্দিন বিবরণ লিখিয়া রাখিতেছিলেন, মনোভঙ্গ হওয়ায় পয়লা জুনের পরে আর লিখিতে সমর্থ হন নাই।

ইতোমধ্যে শোকাবহ ব্যাপার আরও ঘটিয়া গিয়াছে। ২৪শে এপ্রিল শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরের সেবক স্বামী অদ্ভুতানন্দ কাশীধামে মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন, ১৪ই মে বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসু কলিকাতায় ও ২০শে মে মায়ের চতুর্থ সহোদর বরদাপ্রসাদ জয়রামবাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ বসুর অন্তিম সময়ে অন্যান্য সাধুগণের সঙ্গে শরৎ মহারাজও বলরাম-ভবনে উপস্থিত ছিলেন।

রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শ্রীশ্রীমা যেন ছোট বালিকাটি হইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরলা তাঁহাকে আহার করাইতেন, তিনি লিখিয়াছেন: "একদিন মা আবদার ধরিলেন, 'আমি খাবনা।' অনেক বুঝাইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেও যখন রাজী হইলেন না, তখন কি করি ভাবনা হইল। ভাবিলাম [শরৎ] মহারাজকে তবে সংবাদ দিই। কিন্তু মাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কি করিয়াই বা সংবাদ দিব, সেইজন্য বলিলাম, 'তবে কি মা মহারাজকে ডাকব?'—ভরসা, তিনি যদি খাওয়াইতে পারেন। মা বলিলেন, 'ডাক্ তাকে।' মহারাজকে সকল কথা জানাইলাম। তখন রাত্রি আন্দাজ বারটা। তিনি ঐকথা শুনিবামাত্র ব্যস্ততার সহিত ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মা বলিলেন, 'বাবা, আমার কাছে বস।' তিনি বসিয়া মার মাথায় হাত বুলাইতে

লাগিলেন। মা বলিলেন, 'দেখ না বাবা, এরা আমাকে খাবার জন্যে জ্বালাতন করচে, আমি কিছুতেই খাব না।' মহারাজ কহিলেন, 'হ্যাঁ মা, ওরা বড় বিরক্ত করে আপনাকে।' এইরূপে নানা কথা মার সঙ্গে কহিতে লাগিলেন, যেন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন বা ভুলাইতেছেন। সাতপাঁচ কথার পর যেন মার বায়নাটা কিছু কমিয়াছে। তখন মহারাজ বলিলেন, 'মা, এবারে কি একটু খাবেন?' মা বলিলেন, 'হ্যাঁ খাব, দাও।' 'দাও সরলা মার খাবার'—বলিয়া মহারাজ আমাকে আদেশ করিতেই মা বলিয়া উঠিলেন, 'না তুমি আমাকে খাইয়ে দাও, তবে আমি খাব—আমি তোমার হাতে খাব।' ফিডিং কাপে দুধ ঢালিয়া মহারাজের হাতে দিলাম। কিন্তু মহারাজ তখন এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, খাওয়াইতে গিয়া হাত কাঁপিতেছে। দুইএক ঢোক খাওয়াইয়াই তিনি বলিলেন, 'মা, এখন একটু জিরিয়ে নিন।' মা কহিলেন, 'হ্যাঁ বাবা। দেখ তো কি সুন্দর কথা যে মা একটু জিরিয়ে খান। এই কথাটা আর এরা বলতে জানে না। এদের কেবল এক কথা—মা খাও, আর কাঠি [থার্মোমিটার] লাগাও।' খাওয়ানো শেষ হইলে 'বাছার কত কষ্ট হল, যাও বাবা, শোও গিয়ে'—এই বলিয়া মা তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন।" [প্র]

দুঃখের দিন ফুরাইতে চাহে না। তথাপি দিনে দিনে দিন গত হইয়া শ্রীশ্রীমার কলিকাতায় আগমনের দিন হইতে সাড়ে চারি মাস কাটিয়া গেল। লীলাসম্বরণের প্রায় এক সপ্তাহ বাকি। সকালবেলা আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় মা শরৎ মহারাজকে ডাকাইলেন। শরৎ মহারাজ আসিলেন; আসিয়াই মার পায়ের তলায় বাঁদিকে হাঁটু গাড়িয়া বুক নীচু করিয়া বসিয়া যেমন মার হাতের উপরে নিজের হাত বুলাইতে যাইবেন, মা অমনি শরৎ মহারাজের ডান হাতটি নিজের বাঁ হাতের নীচে রাখিয়া বলিলেন, 'শরৎ, এরা সব রইল।' সেই সময়ে

[ফটো—শ্রীগোকুলদাস দে

বড়দিন, ১৯১৬]

মায়ের মুখ খুব কাতর দেখা গেল। মা হাত সরাইয়া নিলেন, মহারাজ আস্তে আস্তে দাঁড়াইয়া পেছন দিকে হাঁটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীমা তাঁহার অবশিষ্ট দায় এবং তাঁহার অদর্শনে যাহারা নিরাশ্রয় বোধ করিবে তাহাদের সকল ভার তাঁহার 'সৃষ্টিধর' সন্তানের উপর ন্যস্ত করিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং ২০শে জুলাই মঙ্গলের মহানিশায়, রাত্রি ১টা ৩০ মিনিট সময়ে, মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যলীলায় অনুপ্রবেশ করিলেন।[৪] সেই মহাগৌরবের অনুস্মরণে, পয়লা আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর পক্ষ হইতে বেলুড় মঠে ও শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে বিশেষ পুজাদি অনুষ্ঠিত হইল।

৪ স্বামী সারদানন্দের দিনলিপিতে লেখা আছে:

July 20, Tuesday—Holy Mother in peace and glory of Mahasamadhi at 1—30 A. M. (night)

July 21, Wednesday—Procession to Belur Math via Baranagore at about 10—30 A. M. and the Jajna (oblation in fire) at about 3 P. M. A heavy shower ended the ceremony at about dusk.

১৪

আচার্য

শ্রীশ্রীমায়ের তিরোভাবে স্বামী সারদানন্দ যে কিরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার অতুলন গাম্ভীর্যের আবরণ ভেদ করিয়া বুঝিতে পারা সাধারণ মানুষের সাধ্য ছিল না। এই ঘটনার পরে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত স্বহস্তে একখানি পত্রও তিনি লিখিতে পারেন নাই।

শ্রীশ্রীসারদামাতাকে কেন্দ্র করিয়া, যাহা কিছু সব তাঁহারই জন্য—এইরূপ একটা ভাবে ভরপুর হইয়া সারদানন্দ সকল কার্য করিতেন। মায়ের অদর্শনে তাঁহার বহুমুখ কর্ম-জীবনের মূল প্রেরণাশক্তি তিরোহিত হইয়া গেল। মায়ের জন্য কলিকাতায় বাটী নির্মাণ-প্রসঙ্গে নিজমুখে তিনি বলিয়াছিলেন, 'মা চলে গেলেন, আর সব উৎসাহ একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। শরীরটা তো খুব ভালই ছিল, কিন্তু মার দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও পড়ে গেল।'

ঠাকুর যেমন শ্রীশ্রীমাকে জীবোদ্ধার-দায় অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, যাহার জন্য দীর্ঘ ৩৪ বৎসরকাল ঠাকুরের অদর্শনের পরেও তাঁহাকে ইহ-সংসারে থাকিতে হইয়াছিল, মাতাঠাকুরাণীও তেমনি তাঁহাকে কতকগুলি দায় অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সারদানন্দের অবশিষ্ট জীবন মুখ্যতঃ সেই দায়-বহন। কিন্তু ঐ দায়-বহনকে নিমিত্ত করিয়াই সকলের অলক্ষিতে, সম্ভবতঃ তাঁহার নিজেরও অলক্ষিতে, যে আর এক মহাশক্তি তাঁহার মধ্যে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, আচার্য-পদবীতে উহাই তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বিচ্ছেদভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঠাকুর ও মায়ের অনুধ্যানে যতই তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেছিলেন, ততই তাঁহার মধ্যে তাঁহাদের গুরুশক্তিটিও প্রকট হইয়া উঠিতেছিল।

সময়ে সময়ে মাতাঠাকুরাণীর শিষ্যগণও যে তাঁহাকে দেখিয়া মায়ের অভাব বিস্মৃত হইতেন, মা-হারা হইয়াও মাকে পাইয়াছেন মনে করিতেন, ইহার মূলেও মাতৃরূপে প্রকট ঐ মহাশক্তির সাযুজ্য বিদ্যমান।

* * *

কথায় বলে, বিপদ একা আসে না। শ্রীশ্রীমার অদর্শনের পরে দুই বৎসরকালের মধ্যে পরপর অনেকগুলি আঘাত শরৎ মহারাজকে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

হরিদ্বারাদি তীর্থ দর্শন করিয়া প্রয়াগ হইতে কাশীধামে আসিবার পথে চলন্ত রেলগাড়ী হইতে পড়িয়া নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পরিচালিকা শ্রীমতী সুধীরা সংজ্ঞাহারা হন, এবং পরদিন ২৩শে নভেম্বর অপরাহ্ণে তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি ঘটে। সুধীরা স্বামী প্রজ্ঞানন্দের ভগিনী এবং শ্রীশ্রীসারদামন্দির-ছাত্রীনিবাসের প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রাণস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে শরৎ মহারাজ স্বামী কেশবানন্দকে লিখিয়াছিলেন: "শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনকালে পরমভক্ত অধর সেন ঘোড়া হইতে পড়িয়া মারা যায়। তাহার সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, সহসা ইষ্টদর্শন হওয়ায় সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান দুঃসংবাদে ঐকথা স্মরণ করিলে কতকটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।"

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে, ৯ই জানুয়ারী রাত্রে, শরৎ মহারাজের দ্বিতীয়ানুজ ডাক্তার সতীশচন্দ্র রক্তের চাপ অসুখে ভুগিয়া অকালে দেহরক্ষা করেন। শরৎ মহারাজ একদিন সান্যাল মহাশয়কে এবং আর একদিন যোগীন-মা ও গোলাপ-মাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

কাশী সেবাশ্রমের সুপরিচালনার জন্য যেসব ব্যবস্থা শরৎ মহারাজ মাত্র এক বৎসর পূর্বে করিয়া আসিয়াছিলেন, খবর আসিল, তদনুযায়ী কাজ না হওয়ায় সেবাশ্রমের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দূরীভূত হইতেছে

না। তিনি ভুবনেশ্বর মঠে যাইয়া সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত মিলিত হইলেন এবং উভয়ে একযোগে কাশী যাইবেন স্থির করিয়া অনতিবিলম্বে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১৯শে জানুয়ারী কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীমহারাজ, শরৎ মহারাজ এবং আরও অনেক সাধুভক্ত পরদিন সকালে কাশীধামে পৌছিলেন।

আনন্দনগরী কাশীতে আনন্দময়বিগ্রহ শ্রীমহারাজের আগমনে এবং শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ ও বহু সাধুভক্তের একত্র সম্মিলনে এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্ট হইল। সেই পরিবেশের ও মহারাজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পড়িয়া সমস্ত গোলযোগ অতর্কিতে শান্ত হইয়া গেল। গোলযোগের কারণীভূত ব্যক্তিগণ নিজ হইতে সরিয়া পড়িলেন এবং শরৎ মহারাজের কৃত ব্যবস্থাবলীও সম্পূর্ণরূপে প্রবর্তিত হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে ঠাকুরের নূতন প্রতিকৃতি স্থাপন উপলক্ষে সাধুরা ভজন গাহিতেছেন, 'এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে', আর মহারাজ ভাবাবিষ্ট হইয়া গানের তালে তালে নৃত্য করিতেছেন। সেই উল্লাসময় নৃত্যে রুগ্নদেহ ধ্যানপরায়ণ হরি মহারাজ ও স্থুলবপু গম্ভীরাত্মা শরৎ মহারাজও যোগ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।

৩০শে জানুয়ারী স্বামিজীর জন্মতিথি-পূজার দিন রাত্রে মোট ৩৫ জনের ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস হইল। সেই অনুষ্ঠানে শরৎ মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। মস্তবড় এক ভাণ্ডারা দিয়া বুড়োবাবা নূতন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। স্বামিজীর পুতচরিত আলোচনার জন্য ৬ই ফেব্রুয়ারী যে সভা আহূত হইল, শরৎ মহারাজ তাহাতে পৌরহিত্য করিলেন, এবং ইংরাজীতে সংক্ষিপ্তসুন্দর ভাষণ দিয়া কর্মযোগের নিগূঢ় রহস্য বুঝাইয়া দিলেন।

দেড় মাসেরও অধিক কাল কাশীবাস করিয়া শিবরাত্রির পরে ও ঠাকুরের তিথিপূজার পূর্বে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

আগষ্ট মাসের শেষভাগে সংবাদ আসিল, হরি মহারাজের বুকে ভীষণ ফোড়া (কার্বাঙ্কল্) হইয়াছে। সংবাদ পাইবার তিনদিনের মধ্যেই ডাক্তার কাঞ্জিলালকে সঙ্গে লইয়া শরৎ মহারাজ পুনরায় কাশী গমন করিলেন। হরি মহারাজের বুকে অস্ত্রোপচার করা হইল। তাঁহাকে বিপন্মুক্ত দেখিয়া সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শরৎ মহারাজ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই পেটের বেদনা ও জ্বর হইয়া স্বয়ং শয্যাগ্রহণ করিলেন। প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া জানা গেল, অসুখ খুব কঠিনাকার ধারণ করিতে পারে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন দাক্ষিণাত্যে ব্যাঙ্গালোরে ছিলেন, এই সংবাদে তিনিও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, ঠাকুরের কৃপায় অল্পদিনেই বেদনা ও জ্বর ছাড়িয়া গেল, কিন্তু পায়ে বাত বাড়িয়া কষ্ট দিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে শ্রীশ্রীমার একান্ত অনুগত ও প্রিয়শিষ্য ললিত চট্টোপাধ্যায় মারাত্মক ব্যাধির কবলে পড়িলেন। শরৎ মহারাজ তাঁহার পরিচর্যার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং বাতে ভুগিতে থাকিলেও একদিন বৈকালে যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিলেন। ইহার পরদিন, ১৯শে অক্টোবর সকালে, ললিতবাবু দেহরক্ষা করেন। ললিতবাবু শরৎ মহারাজের স্নেহপাত্র ছিলেন; শরৎ মহারাজ তাঁহার অর্থের ও তাঁহার পরিবারের সকল রকম সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে শ্রীশ্রীমার জন্মমহোৎসবের দিন বেলুড় মঠে তাঁহার স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। ছোট মন্দিরটি আলো করিয়া মা বসিয়া আছেন—তাঁহার মুখমণ্ডলে বিশ্বমাতৃত্বের অমানব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে, নয়নযুগলে অশেষকল্যাণবর্ষিণী স্নিগ্ধপ্রসন্ন দৃষ্টি।

শরৎ মহারাজ সেইদিন মঠে উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং সকল কার্যের তত্ত্বাবধান করিলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ। পয়লা জানুয়ারী সন্ধ্যারতির পরে শরৎ মহারাজ নীচেকার ছোট ঘরটিতে আসিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় জনৈক ভদ্রলোক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ, ঠাকুর যে ঈশ্বরাবতার তা তাঁর দিব্যভাব দেখে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী সেকথা মনে আনতে পারি না কেন?' শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'ঠাকুরকে ভগবান বলে যদি বিশ্বাস করতে পেরে থাক তবে এ সন্দেহ তোমার আসে কেন?' ভক্তটি কহিলেন, 'আমার এ সন্দেহ কিছুতেই দূর হচ্ছে না।' 'তা হলে বল ঠাকুরকে অবতার বলে তোমার ঠিক ধারণা হয় নি।' 'না না মহারাজ, ঠাকুরে সে বিশ্বাস আমার আছে।' শরৎ মহারাজ তখন দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, 'তোমার তা হলে বিশ্বাস, ভগবান একটি ঘুঁটেকুড়ানীর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন?' 'আমার সংশয় দূর হয়েচে, আমার সংশয় দূর হয়েচে' বলিয়া ভক্তটি তাঁহাকে পুনরায় প্রণাম করিলেন। উপস্থিত সকলে দেখিল, গম্ভীরোজ্জ্বল মুখে শরৎ মহারাজ বসিয়া আছেন, আর ভক্তটির চক্ষু আনন্দে নিমীলিতপ্রায় হইয়াছে।

১২ই জানুয়ারী সকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভুবনেশ্বর মঠ হইতে বেলুড় মঠে আগমন করেন; তাঁহাকে দর্শন করিতে শরৎ মহারাজ ঐদিন অপরাহ্ণে মঠে গিয়াছিলেন। ১৫ই তিনি ঠাকুরের ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের জন্মোৎসবে ইটালী শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ে যান, এবং ফিরিবার পথে নিজের কনিষ্ঠভ্রাতা চারুবাবুর কন্যাকে দেখিয়া আসেন। কন্যাটি ইহার পরদিনই মারা যায়।

১৯শে জানুয়ারী মঠে স্বামিজীর জন্মতিথি-পূজা। শরৎ মহারাজ মঠে আসিলেন, কিন্তু অন্যান্য বারের ন্যায় গান গাহিতে পারিলেন না;

গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 'ইচ্ছা যে আমারও হয় না তা নয়, কিন্তু পারি কই, গলা যে একেবারেই বসে গেচে।' হৃষ্টান্তঃকরণে তিনি দরিদ্রনারায়ণ-সেবা দর্শন করিলেন এবং নারায়ণের প্রসাদকণিকা মুখে দিয়া মস্তকে হস্তস্পর্শ করিলেন। উৎসবান্তে যখন কলিকাতায় ফিরিবেন তখন শ্রীমহারাজ বলিলেন, 'একদিন উদ্বোধনে ঠাকুর ও মাকে মাদ্রাজী রান্না ভোগ দিতে হবে।' শরৎ মহারাজ সানন্দে কহিলেন, 'তুমি যেদিন বলবে সেদিনই হবে, তোমায় কিন্তু উপস্থিত থাকতে হবে।'

২৯শে মহারাজ সদলবলে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে শুভাগমন করিলেন। আনন্দের হাটবাজার বসিল। সেবকেরা মাদ্রাজী খাদ্যসমূহ প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেলেন। ভোগ নিবেদনের পর দুই গুরুভ্রাতা একত্র বসিয়া প্রসাদ পাইলেন।

পরদিন মঠে মহারাজের জন্মোৎসব। শরৎ মহারাজ মঠে আসিলেন ও ঠাকুরঘরে যাইয়া প্রায় অর্ধঘণ্টা নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। ভক্তেরা মহারাজকে ফুলের মালা ও মুকুটে সাজাইয়াছেন, তিনি বালকের ন্যায় মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছেন, শরৎ মহারাজ আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রি। পূর্বে এইদিনে শরৎ মহারাজ সমস্ত রাত্রি পূজা ও গানে অতিবাহিত করিতেন। পুনঃপুনঃ বাতে আক্রান্ত হওয়ায় এই বৎসর অল্প সময়ের জন্য দুইবার মাত্র ঠাকুরঘরে যাইয়া বসিয়াছিলেন।

২৮শে ঠাকুরের জন্মতিথি-পূজা। এই বিশেষ দিন উপলক্ষ্য করিয়া পোর্ট কমিশনার বেলুড়ে ফেরী-ষ্টীমার ঘাট খুলিলেন। শরৎ মহারাজ ষ্টীমারযোগে মঠে আসিলেন, কিন্তু ষ্টীমার হইতে নামিবার সময়, জেটি নীচু থাকায়, পায়ে চোট পাইয়াছিলেন। ৫ই মার্চ মহোৎসবের দিন

বারটার পর তিনি মঠে আসিলেন এবং ঠাকুরকে ও মহারাজকে প্রণাম করিয়া পশ্চিমের বারান্দায় চায়ের টেবিলের নিকট বসিয়া রহিলেন। প্রায় তিনটার সময় সমগ্র মঠভূমি বেড়াইয়া দেখিলেন এবং যেখানে বসিয়া সকলে প্রসাদ পাইতেছিল সেখানে যাইয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিয়া স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিল।

২০শে মার্চ মঠ হইতে আসিয়া মহারাজ কলিকাতায় বলরাম-ভবনে আছেন; পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে আসিলেন। অভ্যর্থনা করিয়া শরৎ মহারাজ তাঁহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেলেন।

২৪শে মহারাজ কলেরায় আক্রান্ত হন। চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও তাঁহার দেহের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল এবং আশা ও নিরাশার ভিতর দিয়া দিন কাটিতে লাগিল। শরৎ মহারাজ নিত্যই দেখিতে আসিতেন ও অনেকক্ষণ ধরিয়া কাছে বসিয়া থাকিতেন। ৭ই এপ্রিল প্রায় সমস্ত দিন তিনি মহারাজের নিকটে বসিয়া রহিলেন। পরদিন যখন তিনি মহারাজের শয্যার পাশে আসিয়া বসিয়াছেন, একথা সেকথার পর মহারাজ কহিলেন, 'শরৎ, তুমি থাকতে আমায় যেতে হল?' শরৎ মহারাজ হতবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কেন যে মহারাজ এই কথাটি বলিয়াছিলেন তাহা অনেক দিন পরেও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ঐদিন রাত্রি ১১টার সময় খবর আসিল, মহারাজ তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ বলরাম-ভবনে যাইয়া তিনি মহারাজের শয্যার পাশে উপবেশন করিলেন। মহারাজ তখন ভাবাবেশে নানা কথা বলিয়া যাইতেছেন ও সেবকগণকে আশীর্বাদ করিতেছেন। 'ভাই শরৎ, তুমি তো ব্রহ্মবিদ্যা জান' ইত্যাদি কথা তিনি এই সময়ে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজের গণ্ড বাহিয়া তখন অশ্রু ঝরিতেছে। সকলকে কাঁদাইয়া

ব্রজের রাখাল ১০ই এপ্রিল রাত্রি ৮ টা ৪৫ মিনিট সময়ে স্বধামে প্রয়াণ করিলেন।

মাতাঠাকুরাণীর তিরোভাবে সারদানন্দ সকল কাজে উৎসাহহারা হইয়াছিলেন, নিজে বলিয়াছেন। কিন্তু যতদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ সশরীরে বিদ্যমান ছিলেন ততদিন কাজে কর্মে কোনরূপ শৈথিল্য তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয় নাই। পূর্ববৎ তিনি উৎসবাদিতে যোগ দিয়াছেন, সভায় ভাষণ দিয়াছেন, আর্তসেবা-কার্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মঠ-মিশন-পরিচালনা ব্যাপারে মহারাজকে নিশ্চিন্ত রাখিবার জন্যই অশেষ ধৈর্যে অন্তরের নির্বেদ তিনি এইরূপে চাপিয়া রাখিতেন। মহারাজের শরীর যাইতেই কথায় কথায় বলিতে লাগিলেন, 'মা গেলেন, মহারাজও গেলেন, এখন থেকে তোমরা দেখে শুনে কাজকর্ম করগে ; আমি বাপু, আর কিছু করতে পারব বলে তো মনে হয় না।'

সঙ্ঘগুরুর তিরোভাবে নূতন অধ্যক্ষ নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দিল। ট্রাষ্টীগণের সভায় স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রস্তাব করিলেন, সঙ্ঘভুক্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের সকলের অভিমত গ্রহণ করা হউক—সকলের ভোটে অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইবেন। স্বামী সারদানন্দ ইহাতে আপত্তি জানাইলেন, কিন্তু অন্যান্য ট্রাষ্টীরা সকলেই সমর্থন করায় প্রস্তাব গৃহীত হইল। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতামত লিখিয়া জানাইবার জন্য মঠ ও মিশনের কেন্দ্রসমূহে পত্র প্রেরিত হইল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন কাশীতে ছিলেন ; তথাকার সাধুরা তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি কহিলেন, 'আমি কেবল আমার নিজের কথাই বলতে পারি। ভোট দিতে যদি হয় আমি শরৎকে দেব। স্বামিজীর পরে শরতের মত এত পরিশ্রম—সারাটি জীবন মুখ বুজে এমন রক্তক্ষয়ী পরিশ্রম আর কেউ করে নি, এত হাঙ্গামা কেউ পোয়ায় নি—এমন কি তোমাদের মহারাজও নয়।'

২রা মে তারিখে আহূত ট্রাষ্টীগণের সভায় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের অভিমত পঠিত হইল। স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ) কহিলেন, 'প্রায় সকলেই যখন শরৎকে চায় তখন শরৎই প্রেসিডেণ্ট হোক।' শরৎ মহারাজ তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন, 'স্বামিজী আমাকে মঠের সেক্রেটারী করে গেচেন, আমি সে পদ ত্যাগ করব না।' নিজে তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে ভোট দিয়াছিলেন, সভাতেও তাঁহাকেই প্রেসিডেণ্ট করার প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। মহাতপা মহাপুরুষ জীবিত ট্রাষ্টীগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; কাজের ঝঞ্ঝাটে তিনি বিব্রত বোধ করিবেন বলিয়া জানাইলে শরৎ মহারাজ কহিলেন, 'তার জন্যে তো দাসই রয়েচে।' তাঁহার একান্ত আগ্রহে মহাপুরুষ মহারাজ অধ্যক্ষপদে বৃত হইলেন। অধ্যক্ষের প্রতি নিজের আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য সর্বজনসমক্ষে শরৎ মহারাজ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

জুন মাসের শেষভাগে খবর আসিল, হরি মহারাজ পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার পিঠজোড়া ফোড়া ও জ্বর হইয়াছে। শরৎ মহারাজ ডাক্তার কাঞ্জিলালকে কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু নিজে গেলেন না বা যাইবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন না। হরি মহারাজ যে এ যাত্রা সারিয়া উঠিবেন না একথা তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ২১শে জুলাই অপরাহ্ন ৬টা ৪৫ মিনিট সময়ে তুরীয়ানন্দ তুরীয় ব্রহ্মে মিলিত ও একীভূত হইলেন।

শরৎ মহারাজ ও হরি মহারাজ পরস্পর প্রগাঢ় ভালবাসায় আবদ্ধ ছিলেন। মহারাজের দেহত্যাগে উভয়েই বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। হরি মহারাজ চলিয়া গেলেন, সুতরাং শরৎ মহারাজও আর অধিক দিন থাকিবেন না মনে করিয়া অনেকেই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীমার দুই সঙ্গিনী-সেবিকা যোগীন-মা ও গোলাপ-মা বয়োবৃদ্ধা হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখাশোনা করিবার ভার তিনি শরৎ

মহারাজকে দিয়া গিয়াছিলেন। 'আমার কি হবে' ইত্যাদি কথা বলিয়া যোগীন-মা একদিন ভবিষ্যতের ভাবনা প্রকাশ করিতে থাকিলে শরৎ মহারাজ কহিলেন, 'আমি তো বলেচি, আগে তোমাদের পার করব, তারপর নিজে যাব।'

১১ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীমার প্রিয়শিষ্য ও শরৎ মহারাজের গভীর প্রীতিপাত্র ডাক্তার কাঞ্জিলাল দেহত্যাগ করিয়া মাতৃসন্নিধানে গমন করেন। ইহার পরদিন কাঞ্জিলালের জামাতা শরৎ মহারাজকে লইয়া যাইতে আসিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'কি করে এই অবস্থায় যাই। আচ্ছা, বিকালে এসো, দেখা যাবে।' বিকালে কাঞ্জিলাল-ভবনে যাইয়া ও পরিবারস্থ সকলকে সান্ত্বনা দিয়া ফিরিবার সময় কহিলেন, 'আমি বলে আজ এ বাড়ীতে এসেচি। আজ যদি মহারাজ থাকতেন, তিনি পারতেন না।

* * *

অপ্রকট হওয়ার পূর্বে, জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে, শ্রীশ্রীমা কাহাকেও কাহাকেও বলিয়াছিলেন, 'এর পর যখন তাঁর (ঠাকুরের) ছেলেরা এখানে আসবে, দুটি অন্নের জন্যে হেথাসেথা ঘুরে বেড়াবে, সে আমি সইতে পারব না।' জয়রামবাটীতে বিদেশাগত ভক্তগণের খাওয়া-থাকার একটি স্থান হয় ইহাই মায়ের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সারদানন্দ কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যে স্থানটিতে মা ভূমিষ্ঠ হন সে ভূমিখণ্ড পূর্বেই ক্রয় করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাঁহার তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই তথায় শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির ও সেবকগণের বাসগৃহ নির্মাণের এক পরিকল্পনা গৃহীত হইল।

মন্দির নির্মাণে বহু অর্থের প্রয়োজন, এত টাকা কোথা হইতে আসিবে? শরৎ মহারাজ তাঁহার ব্যক্তিগত তহবিল দান করিলেন, মায়ের ভক্ত সন্তানেরাও সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিতে লাগিলেন।

১৯২২ অব্দের মাঝামাঝি সময় হইতে নির্মাণ-কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

১৯২১ অব্দে রথযাত্রার দিন শরৎ মহারাজ নূতন করিয়া দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। 'নূতন করিয়া' এইজন্য যে, বহুবৎসর পূর্বে আমেরিকায় থাকিতে, এবং আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিবার পরেও, অল্পসংখ্যক মুমুক্ষু ব্যক্তিকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন। ঠাকুরের সময়কার ভক্ত ও সুসাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসু এবং মঠের পুরাতন ট্রাষ্টীগণের অন্যতম স্বামী মহিমানন্দ তাঁহার মন্ত্রশিষ্য। প্রথিতযশা নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তাঁহার কাছে পূর্ণাভিষিক্ত হন।

ঠাকুরের ভক্তপরিবারসমূহের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দীক্ষার কথা উঠিলে শ্রীশ্রীমা প্রায়ই বলিতেন, 'এখনো নেহাৎ ছোট, পরে শরতের কাছে দীক্ষা হবে।' মায়ের ইচ্ছায়, মায়ের আদেশ পালন করিবার জন্যই তিনি দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী সরলা লিখিয়াছেন: "শ্রীশ্রীমার শরীর যাওয়ার পর [শরৎ] মহারাজ উদ্বোধন হইতে কোথাও যাইতে সহজে ইচ্ছুক হইতেন না। কত ভক্ত মার আসিত, তাহাদের যত্নাদি মায়ের মতই করিতেন। একদিন বলিলেন, 'মা আমাকে এই সব ভার দিয়ে গেচেন, তাঁর কাজ করচি, তাঁরই সব।' দেখিয়াছি, পরে যখন দীক্ষাদি দিতেন, কেহ গুরুসেবার জন্য জিনিষপত্র লইয়া আসিলে বলিতেন, 'এই যে সব জিনিষ, এ সমস্ত মার।' দীক্ষাপ্রার্থী কেহ দীক্ষায় কি কি জিনিষ লাগিবে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'কি আর আনবে, সাধ্যমত মার পুজো দিয়ো।' দীক্ষাকালীন প্রণামী টাকা যাহা পাইতেন, মার একটি বাক্স ছিল তাহাতে রাখিতেন ও পরে মার সেবায় ব্যয় করিতেন। কাপড় যাহা পাইতেন তাহা মামাদিগকে ও সাধুদিগকে

দিতেন—যেমন মা করিতেন। কোন ভক্ত যদি মহারাজের সেবার জন্য টাকা দিতেন তাহা হইলে ঐ টাকা তিনভাগ হইত—ঠাকুর, মা ও তিনি। ঐরূপ করার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, 'যারা দেয় তাদের কল্যাণের জন্যে এরূপ করি।'

"কোনদিন দুইতিন জনকে দীক্ষা দিতে হইলে সেদিন মহারাজের আর ঠিক সময়ে খাওয়া হইত না। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার দীক্ষা দিতে অত দেরী হয় কেন? মার তো দেখেচি অত দেরী হত না।' খানিক চুপ থাকিয়া উত্তর দিলেন, 'দেখ, মা কাকেও ছুঁয়ে দিলেই তার সব হয়ে যেত, কিন্তু আমি তা পারি না। আমাকে অনেক আহ্বান করতে হয়। তিনি গ্রহণ করলেন বা ভার নিলেন যতক্ষণ না দেখতে পাই ততক্ষণ আমার ছুটি নাই।

"একদিন বিকালবেলা গিয়া দেখি, মহারাজ চুপচাপ বসিয়া আছেন অথচ জপধ্যানও করিতেছেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি অমন করে বসে আছেন কেন? শরীর খারাপ হয়েচে নাকি? উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, ঐরকম আর কি। আজ একজনকে দীক্ষা দেবার পর থেকেই দেখি শরীরটা অসোয়াস্তি বোধ করচে। একটা জ্বালাপোড়ার মত বোধ হচ্চে। মা যে বলতেন, একএক জনকে দীক্ষা দিলে শরীরটা জ্বলে যায়, সেটা আজ বেশ অনুভব করচি।' " [প্র]

দেহে জ্বালাবোধ যে শিষ্যগণের পাপতাপ গ্রহণের ফল, ইহা আর বলিতে হইবে না। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি, কোন কোন শিষ্যের মুখ দিয়া নিজেই তিনি বলাইয়াছিলেন, 'আমার জন্মজন্মার্জিত পাপ-কর্মের ফল আপনাকে দিলাম।' একজনকে বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমার ইহজন্মের ও পূর্ব পূর্ব জন্মের পাপপুণ্যের ভার নিলাম।'

কাহাকেও দীক্ষা দিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবার পূর্বে স্বামী সারদানন্দ তাহাকে দীক্ষালাভের উপযোগী করিয়া তুলিতেন; ক্ষেত্র প্রস্তুত ও

উর্বর করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিতেন ; এবং কিরূপ ক্ষেত্রে কিরূপ বীজ আবশ্যক হইবে অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে অনায়াসে তাহা বুঝিয়া লইতেন।

এক বালক স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষিত হইতে অভিলাষী হইয়া উহার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য পূজনীয় শরৎ মহারাজকে ধরিয়া বসে। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমিই তোকে দীক্ষা দেব।' দিব বলিয়াও কিন্তু তখনই দিলেন না বা দিতে চাহিলেন না, বালকের ব্যগ্রতা প্রকাশের উত্তরে শুধু কহিলেন, 'সময় হলেই দেব।' কিছুদিন পরে নিজেই তাহাকে পত্র লিখিয়া বাড়ী হইতে আনাইয়া শ্রীমহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেন, এবং পুনরায় সে দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে ন্যাস ও ষট্‌চক্রসম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রক্রিয়ামাত্র শিখাইয়া দিলেন। এইভাবে দুইতিন বৎসর কাটিয়া যাওয়ার পর তিনি উহাকে মন্ত্রদীক্ষা দানে কৃতকৃত্য করিয়াছিলেন।

জনৈক শিষ্য[১] লিখিয়াছেন: "১৩২৯ সালের ৺পূজা আগতপ্রায়। বিধু[২] বলিল, 'এখন তো আর হরি মহারাজ নাই, স্বামী সারদানন্দ কলকাতায় আছেন। তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়া ভাল।' সে একদিন মহারাজের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিল। দুইএক দিন পরেই নিভৃতে, এতকাল যাহা করিয়া আসিতেছি তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি কিছু উপদেশ দিয়া আর একদিন দেখা করিতে বলিলেন।

"একদিন বেলা ১১টার সময় উদ্বোধনের আপিস ঘরে বসিয়া আছি, মহারাজ সংবাদ পাইয়া নামিয়া আসিলেন এবং একখানি বেঞ্চে বসিয়া আমাকে তাঁহার পার্শ্বে বসিতে আদেশ করিলেন। ইতস্ততঃ করিয়া

---

১ শ্রীগুরুদাস গুপ্ত। ২ ৺বিধুভূষণ রায়। ইনি স্বামী সারদানন্দের মন্ত্রশিষ্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার 'খয়রা অধ্যাপক' ছিলেন।

বসিলাম, এবং নিজের কথা নিবেদন করিলাম : 'স্বামিজীর ধ্যান করি, ধ্যান জমবার আগে শ্বাসকষ্ট হয়—দম বন্ধ হওয়ার মত।' মহারাজ বলিলেন, 'তোমার শরীরটা তেমন সবল নয়, সেজন্যে এরূপ হয়। এটা থাকবে না। ঠাকুরকে ধ্যান করবে। ঠাকুরের মধ্যে সব পাবে, স্বামিজীরও তিনি গুরু। সহস্রারে ঠাকুর কেন্দ্রস্থলে বসে, আর তাঁর শিষ্যেরা চারধারে ঘিরে বসে আছেন, এভাবে ধ্যান করবে।' পরদিন আবার কহিলেন, 'দুর্গাপূজার এ কয়দিন তুমি নিষ্ঠা করে দুর্গানাম জপ করবে। পরে যেমন বোঝ আমাকে বলবে।' তারপরে অন্য একদিন দীক্ষাপ্রার্থী হইলাম ও লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন আমার দীক্ষা হইল। আমাকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইষ্ট ও জীবাত্মা একই জ্যোতির দুই মূর্তি। যে জ্যোতীরাশি থেকে ইষ্টের মূর্তি কল্পিত হয়েচে তা থেকেই জীবাত্মার মূর্তিও গঠিত হয়, অর্থাৎ আমি আমার ইষ্টেরই উপাদানে গঠিত।'

"মাস কয়েক পরে মহারাজ আমাকে কিভাবে গুরুর ধ্যান করি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, 'এখন অন্যান্য মহারাজদের বা স্বামিজীর মূর্তি চিন্তায় আসে না, আপনারই মূর্তি চিন্তা করি।' তিনি ঐবিষয়ে আর কোন কথা বলিলেন না। 'ঠাকুরের মূর্তি চিন্তার চেয়ে গুরুর মূর্তি চিন্তা করতে ভাল লাগে এবং গুরুর মূর্তিই অধিক সময় সহজভাবে আসে'—একথা শুনিয়া বলিলেন, 'বেশ তো।' [প্র]

দীক্ষার প্রস্তুতি বা পূর্বকৃত্যস্বরূপ শ্রীসারদানন্দ মহারাজ কাহাকেও ঠাকুরের নাম প্রত্যহ হাজারবার জপ করিতে, কাহাকেও বা নিজের অভিমত দেবতার নামচিন্তা সাধ্যানুযায়ী করিতে উপদেশ দিতেন, আর প্রার্থী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলে, সেই সঙ্গে অধিকসংখ্যায় গায়ত্রী জপ করিতেও বলিতেন। একজনকে লিখিয়াছিলেন : "কেবল সদ্‌গুরুর অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া যথাসাধ্য ঈশ্বরচিন্তা, সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করিবার চেষ্টা করিও। জমি প্রস্তুত হইলে বীজ বপন করিলে

সুফল ফলে ; এবং ইহা একটি প্রকৃতির রহস্য যে জমি প্রস্তুত হইলেই বীজ আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। অভাববোধ হইলেই তাহার পুরণ হয়। প্রকৃত অভাববোধ হইলেই বস্তু লাভের উপায় হয়—ইহা সাধু ও শাস্ত্রসঙ্গত সত্য এবং ইহার যাথার্থ্য আমাদের নিজ জীবনে অল্পবিস্তর অনুভব করিয়াছি।"

তাঁহার এক শিষ্য[৩] মন্ত্রশক্তির উপরে তেমন আস্থাবান ছিলেন না ; মন্ত্রগ্রহণের প্রায় এক বৎসর পুর্বে গুরুদেবকে তিনি একথা নিবেদনও করিয়াছিলেন। মহারাজ কোনই জবাব দেন নাই। গুরুমুখে মন্ত্র-শ্রবণের সঙ্গেই তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, আপনা হইতে ভিতরে জপ চলিতেছে। চেষ্টা করিয়াও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই জপের প্রবাহ তিনি রোধ করিতে পারেন নাই ; এমন কি আহারের সময়েও জপের বিরাম ঘটে নাই।

যাহাদিগকে তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন বা গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনোনীত করিতেন, আন্তরিক যত্নে তাহাদের জীবন গড়িয়া তুলিতেন, কিন্তু প্রয়োজন বোধ করিলে শাসন করিতেও ছাড়িতেন না। সেই শাসনে শ্রীগুরুর কল্যাণরূপটিই সমধিক পরিব্যক্ত হইত, এবং শিষ্যের ভক্তিবিশ্বাস বর্ধিত করিয়া উহা তাহাকে পরিপুর্ণ আত্মসমর্পণের অভিমুখে লইয়া যাইত।

এক দীক্ষাপ্রার্থী ছেলেকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'কিছুদিন পরে হবে, এখন আমার সময় নাই।' ছেলেটি নাছোড়বান্দা। দুইএক দিন পরে পরেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'তোমাকে যখন বলেচি কিছুদিন পরে হবে, তখন কেন এত জিদ করচ ? আমার কথা যদি না শোন তা হলে তোমার এক বৎসরের মধ্যে কিন্তু হবে না।' সেই ভক্তটি তারপর এমন অবস্থায়

৩ শ্রীশশিভূষণ রায়।

পড়িয়াছিল যে, ইহার মধ্যে একবার আসিয়া দেখা পর্যন্ত করিতে পারে নাই। ঠিক একবৎসর পুর্ণ হইতেই দেখা গেল, সে আবার দীক্ষার জন্য উপস্থিত। ‘এতদিন পরে এলে যে?’—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সে নানা অসুবিধার কথা জানাইল। তিনি কহিলেন, ‘দেখ কি ব্যাপার, কিএক কথা মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, তাই হয়ে গেল!’ [প্র]

সারদানন্দ মহারাজ তাঁহার এক পাগলাটে শিষ্যকে তাহার মায়ের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ বিষয়ে কথা কহিতে অনিচ্ছার ভাব দেখাইয়া সে শুধু বলিল, ‘অবিদ্যা’। জননীর প্রসঙ্গে ‘অবিদ্যা’ শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র চপেটাঘাত করিয়া মহারাজ তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সারাদিন সে কলিকাতার পথে পথে ঘুরিল, কিন্তু কেহই তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল না, বা তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিল না। গভীর রাত্রে যখন সে এক হোটেলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে, হোটেলের পরিচারিকা তাহাকে দেখিতে পাইল। ‘এত রাত্রে এখানে দাড়িয়ে কেন বাবা?’—মেয়েটি স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এবং তাহার অনাহারক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়াই ‘এস তোমায় খেতে দিচ্চি’ বলিয়া নিজের জন্য রক্ষিত অন্নথালাটি তাহাকে ধরিয়া দিল। অতঃপর তাহার রাত্রিবাসের জায়গা নাই জানিতে পারিয়া মেয়েটি তাহার নিজের ঘরটিতে তাহাকে শুইতে বলিয়া, নিজে শুইবার জন্য অন্যত্র চলিয়া গেল। পরদিন সকালে যখন শিষ্যটি আবার গুরুর নিকট উপস্থিত হইল, তিনি স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কাল সারাদিন ছিলে কোথা? কে খাওয়ালে? কে শুতে দিলে?’

সমভাবে তিনি শিষ্যদের ঐহিক ও আত্মিক মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। দূরদেশবাসী বলিয়া যেসকল শিষ্য সর্বদা গুরুদর্শনে আসিতে পারে না তাহাদিগকে সকল খবর লিখিয়া জানাইতে বলিতেন। তাঁহার ঐরূপ এক শিষ্যের কথা জানি, যে সংসারের

অভাব অভিযোগ ও অন্যান্য তুচ্ছ বিষয়ও তাঁহার জ্ঞানগোচর করিতে ছাড়িত না। তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'এত সব আজে বাজে কথা তাঁকে লেখ কেন—যত রাজ্যের খবর?' সে উত্তর করিল, 'তিনি যে আমাকে সব খবরই দিতে বলেচেন।'

গুরু যেখানে এত দয়াবান, শিষ্য সেখানে ভক্তিমান না হইয়া পারে না। কেবলমাত্র গুরুদেবকে দর্শন করিবার জন্য ঐ শিষ্যটি[৪] প্রাণের টানে বৎসরে দুইবার করিয়া সুদূর শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় ছুটিয়া আসিত। একবার যখন সে মঠে যাইয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে, তিনি তাহার কলিকাতা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, এবং গুরুদর্শন ব্যতীত আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই শুনিয়া পুনঃপুনঃ বলিতে থাকেন, 'তোমার কোন কষ্ট হবে না, তুমি কোন কষ্ট পাবে না।' মহাপুরুষজী তখন সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, ঐরূপে আশীর্বাদ করিবার পর তিনি উহার কাঁধে হাত রাখিয়া কথা কহিতে কহিতে খানিক পাদচারণ করিয়াছিলেন। গুরুর অপ্রকট হওয়ার পুর্বে শেষবার যখন সে ভূলিষ্ঠিত হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করে, তিনি পদযুগল প্রসারিত করিয়া তাহার মস্তকোপরি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিধুভূষণ রায় যখন প্রথমবার য়ুরোপ হইতে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, শরৎ মহারাজ লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে নিজের কাছে শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে লইয়া যান। কারণ, তিনি জানিতেন যে, কলিকাতায় পৌছিয়াই খাওয়াথাকার সুবন্দোবস্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। অধিক রাত্রে শয়ন করিতে হইত বলিয়া বিধুবাবুর ঘুম ভাঙ্গিতে কিছু বেলা হইয়া পড়িত। ঘুম হইতে উঠিয়াই তিনি লক্ষ্য করিতেন, তাহার শরীরে যাহাতে রৌদ্র না লাগে এমনভাবে পুর্বদিকের জানালাটি

---

৪ ৺অশ্বিনীকুমার দাস

কেহ ভেজাইয়া রাখিয়াছে। ক্রমাগত তিনদিন এইরূপ হওয়ার পর অনুসন্ধানে তিনি জানিতে পারিলেন যে, ইহা তাঁহার শ্রীগুরুদেবেরই কর্ম। সকালে ছাতে পায়চারি করিয়া নামিয়া যাইবার সময় তিনি জানালা ভেজাইয়া দিয়া যাইতেন।

মেদিনীপুর জেলার মফঃস্বল হইতে রওনা হইয়া শরৎ মহারাজের এক বালক শিষ্য যখন হাওড়ায় পৌঁছিল তখন রাত্রি প্রায় এগারটা হইবে। ট্রাম চলাচল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এবং গাড়ী বা ট্যাক্সি করিবার মত পয়সা হাতে না থাকায় ছেলেটি বিছানার মোট মাথায় বহিয়া হাঁটিয়া চলিল ও গভীর নিশীথে মায়ের বাড়ীর দরজায় পৌঁছিয়া মৃদু-ভাবে কড়া নাড়িল। 'কেরে, অমুক এলি নাকি?'—বলিয়াই মহারাজ নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিলেন এবং ঢেকে রাখা ভাত ও শয়নের স্থান দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, 'খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় ঐখানটায়।' বাড়ীর অপর সকলেই তখন সুপ্তিমগ্ন।

মহারাজের ঐ বালক শিষ্য একসময়ে বরাহনগর হইতে তাঁহার কাছে যাওয়াআসা করিত। উদ্বোধন কার্যালয়ের দুইএক জন প্রবীণ ব্যক্তি বালকটিকে ও তাহার যখন তখন মহারাজের কাছে চলিয়া যাওয়াটা পছন্দ করিতেন না। তাহাদের কাছে সে বাধা পাইয়া থাকে বুঝিতে পারিয়া মহারাজ বলিয়া দিলেন, 'গ্যালিফ লেনের কলে হাত পা ধুয়ে, আপিস ঘরের ভিতর দিয়ে সোজা উপরে চলে আসবি।' বালকটি অতঃপর তাহাই করিতে থাকে। একদিন তাহার হাতে প্রসাদ দিয়া মহারাজ বলিলেন, 'পু—র সামনে এটা মুখে ফেলে তাকে প্রণাম করে চলে যাস।' সে ঐরূপ করিবামাত্র পু— ভীষণ চটিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মহারাজের রগড় বুঝিতে পারিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন। এই ঘটনার পরে বালকটিকে আর কখনও পূর্ববৎ প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

একদিন রাত্রে মহারাজকে প্রণাম করিয়া যখন সে বিদায় লইতেছিল, তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'দুর্গা দুর্গা, আবার সময় পেলেই আসবি।' বরাহনগর হইতে ফেরী ষ্টীমারে প্রায়ই রাত্রে সে যাতায়াত করে, কিন্তু অপর কোনদিন তাহাকে ঐরূপ বলিতে শোনে নাই। রাত্রির শেষ ফেরী ষ্টীমারে চাপিয়া সে বরাহনগর কুটিঘাটে আসিল এবং সম্মুখে বহু লোক ভীড় করিয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টীমারের পেছন দিক দিয়া নামিতে গেল। পশ্চাদ্ভাগ যে তখনও জেটিতে লাগে নাই, ক্ষীণালোকে তাহা সে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ সে অনুভব করিল, ষ্টীমার ও জেটির মধ্যে সে গঙ্গায় পড়িয়া যাইতেছে, আত্মরক্ষার আর উপায় নাই। এমন সময় পেছন দিক হইতে সজোরে ধাক্কা দিয়া কেহ তাহাকে জেটি পর্যন্ত ছুঁড়িয়া দিল ও সঙ্গে সঙ্গে খালাসীর মত অপর কেহ তাহার হাত ধরিয়া জেটির উপরে টানিয়া তুলিল। ঘটনার আকস্মিকতায়, ও আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া, শিষ্যটি এতই অভিভূত হইয়াছিল যে, ঐ দুই ব্যক্তি যে কাহারা তাহা সে ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করে নাই, তাহারাও কোন কথা বলে নাই। শিষ্যটির কানে তখন বাজিতেছিল শ্রীগুরুর শ্রীমুখোচ্চারিত দুর্গা-দুর্গা ধ্বনি।

শ্রীমতী সরলা লিখিয়াছেন: "রোজ বৈকালে মায়ের বাড়ীতে যাই। একদিন মহারাজের কাছে শুনিলাম, শচীনের বউ শতদলের অসুখ হইয়াছে। শচীন ও শতদল তাঁহার শিষ্য। একদিন সন্ধ্যার সময় শচীন আসিয়া কহিল, 'অসুখ ক্রমেই বাড়চে, আপনাকে একবার দেখতে চায়।' মহারাজ সমস্ত খবর লইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা যাব।' শচীন বসিয়া রহিল, তখন ঠাকুরের আরতি হইতেছে। আরতির পরে মহারাজ ঠাকুরঘরে গেলেন এবং শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া ও কিছু নির্মাল্য লইয়া শচীনের সঙ্গে মোটরে উঠিলেন। পরদিন মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'দেখ, শতদল এবার ভাল হয়ে যাবে।' জিজ্ঞাসা

করিলাম, 'কি করে বুঝলেন ভাল হয়ে যাবে?' তিনি কহিলেন, 'আমি দেখলুম, মা মহাভাবিত হয়ে শতদলের মাথাটা কোলে নিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছেন। সেইজন্যেই বলচি যে, সে ভাল হবে—মা যখন কোলে নিয়েচেন তখন নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে।'

"এদিকে শতদলের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। শেষে ডাক্তার নীলরতন সরকার জবাব দিয়া গেলেন। মহারাজ ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া স্নানঘরে যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় শচীন আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'মহারাজ, ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল, এখন উপায় কি?' মহারাজ চিন্তিতভাবে কহিলেন, 'তাইতো গো, আমি যে দেখলুম মা কোলে নিয়ে বসে আছেন!' শচীন বলিল, 'মহারাজ, আপনাকে একবার যেতে হবে।' 'আমি আর গিয়ে কি করব বাপু, তুমি ঠাকুরের চরণামৃত নিয়ে যাও আর শ্যামাদাস কবিরাজ মশাইকে দেখাও।' এই বলিয়া মহারাজ স্নানাদি সারিয়া নিত্য যেমন জপধ্যানে বসেন তেমনই বসিলেন। বসিবার পুর্বে কহিলেন, 'আমি যতক্ষণ না উঠি ততক্ষণ কেউ যেন আমাকে ডাকিস নি।' কিছুক্ষণ পরেই খবর পাওয়া গেল, অবস্থা একটু ভালর দিকে। তিনচারি ঘণ্টা বাদে ধ্যান হইতে উঠিলে তাঁহাকে সেই খবর জানানো হইল। অল্পদিনের মধ্যে শতদল আরোগ্য লাভ করিল। মহারাজ কহিলেন, 'আমাদের এমন অবিশ্বাসী মন যে, আমি স্পষ্ট দেখলুম মা শতদলকে কোলে নিয়ে রয়েচেন, তবুও মনে হল আমি কি ভুল দেখলুম? শচীন যখন এসে কেঁদে পড়ল তখন মনে হল, আমি ভুল দেখলুম কি?' " [প্র]

এক শিষ্যার[৫] একমাত্র কন্যা মারা যায়। অত্যন্ত কাতর হইয়া গুরুদেবকে সে কহিল, 'মহারাজ, আমার এখনো ঐসব মনে আসে

৫ ৺গোলাপবাসিনী গুহ

কেন?’ শরৎ মহারাজ কহিলেন, ‘সে তো অনেকদিন হয়েচে, ঠাকুরের আশ্রয় পেয়েচ, আর কেন ভাবনা? হ্যাঁ হবেই তো, যোগীন-মা বলতেন, নাড়ীছেঁড়া—সহজে যায় না। মনে কর, জগদম্বা তোমার কন্যারূপে এসেছিলেন, কিছুদিন তোমার সেবা নিয়ে চলে গেচেন।’ ইহার পর পুরীতে যাইয়া শিষ্যা আবার তাঁহাকে বলিল, ‘আজ তিনদিন ধরে চোখ বুজলেই মেয়েকে দেখি, কিছুতেই ঘুম হয় না—কি করি?’ মহারাজ শিষ্যাকে বিমলাদেবীর পূজা সে দিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পূজা দেয় নাই জানিয়া কহিলেন, ‘কিছু নিয়ে এস, আমি পূজা পাঠাব।’ শিষ্যা একটি টাকা দিলে মহারাজ একজন সাধুকে দিয়া পূজা পাঠাইলেন। সেই রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইল। মহারাজ কহিলেন, ‘এখানে এসে বিমলাদেবীর পূজা দাও নি, সেই জন্যেই তিনি তোমার কন্যা হয়ে তোমার কাছে খেতে চাচ্ছিলেন। আর কিছু হবে না।’ [প্র]

সম্পদে বিপদে এইরূপে গুরুর অহেতুক স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে, স্বামী সারদানন্দের এমন আরও অনেক শিষ্যের সঙ্গলাভের সুযোগ লেখকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

ইচ্ছা করিলে তিনি যে লোকের অন্তরবাহির অনায়াসে বা অল্পায়াসেই দেখিয়া লইতে পারিতেন তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যাহারা তাঁহার শিষ্য বা শিষ্যস্থানীয় স্নেহপাত্র তাহাদের ভূতভবিষ্যৎ যে অনেকদূর পর্যন্ত দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন তাহা মনে করিবার সঙ্গত হেতুও তাহাদের অনেকে দেখিতে পাইয়াছে।

এক কৌমারবৈরাগ্যবান শিষ্য যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহারাজ, এজন্মেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কি?’ তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, ‘কেন হবে না?…চেষ্টা করলে অবশ্যই হবে।’ আবার আর এক শিষ্য যে রাজসংসার হইতে বিষয়ভোগের সংস্কার লইয়া

আসিয়াছে ও সেই সমস্ত সংস্কার কাটাইয়া এই জন্মেই সর্ববন্ধবিনির্মুক্ত হইবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করিতেছে, তাহাকে ভিন্নরূপ কথা শুনাইলেন। একদিন যখন সে কাছে বসিয়া আছে, পূজনীয় শরৎ মহারাজ যোগীন-মাকে কহিলেন, 'তুমি ওকে কিছু উপদেশ দাও।' যোগীন-মা গুরু-সন্নিধানে শিষ্যকে উপদেশ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে পুনরায় কহিলেন, 'আমি বলচি তুমি ওকে কিছু বল।' তখন যোগীন-মা বলিলেন, 'ঠাকুর আমাদের বলতেন, একএকটা সংস্কার কাটাতে তিন তিন জনম লাগে।'

এই জন্মই যাহাতে শেষজন্ম হয় তজ্জন্য ঐ শিষ্যটি মাঝে মাঝে তাহার গুরুদেবকে বিরক্ত করিত। তাহাতে একদিন তিনি কহিলেন, 'তুমি শেষ করতে চাও? বেশ। আমার কি? তোমার খুব কষ্ট হবে, সহ্য করতে পারবে? আমার দিতে কি?' আর একদিন তিনি অন্তর বুঝিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি কখনো মনে করবে না যে, তুমি ঠাকুরকে দেখেচ। তবে তিনি তোমায় দেখে থাকতে পারেন।'

অপর এক শিষ্যের[৬] সঙ্গে তাঁহার নিম্নোক্তরূপ আলাপ হয়ঃ 'ডাক্তার মহারাজ আমাকে বলেচেন, গুরুকে জীবনের সব কথা খুলে বলতে হয়। আমাকেও তো তা হলে বলতে হয়, বলি?' 'হয়েচে! তোর নিজের কথা তুই কি জানিস? আমি তোর সব জানি, কেন এসেচিস, কি হবে—তাও জানি। তোর কথা তুই আর কি বলবি?' 'আমার আর আসতে ইচ্ছা করে না, মুক্তি দিন।' 'মুক্তি হবে না। ঠাকুর যদি বলেন, আমি যাচ্চি তুই চল্, তুই কি তখন বলবি, আমি যাব না?'

বারান্তরে ঐ শিষ্যেরই সঙ্গে এইরূপ কথাবার্তা হয়ঃ 'কি চাস?' 'আমার সন্ন্যাস চাই।' 'একি তোর কথা, না কেউ শিখিয়ে দিয়েচে?'

---

৬ শ্রীকেশবলাল চক্রবর্তী।

'হ্যাঁ, আমার কথা।' 'কখনই না। তোর সঙ্গে আমার এ ভাব নয়। আমি চলে যাব টের পেয়েচ, তাই এখন সব আদায় করে নিচ্চ, না? যখন যা করবার আমি করে দেব—তোমার কিছু ভাবতে হবে না।'

শৈশবে বিধবা এক পিসীমা আমাকে (লেখককে) মানুষ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার নয় বৎসর বয়সেই তাঁহার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসরের বিচ্ছেদেও তাঁহার বাৎসল্যের ইতরবিশেষ হইল না; মৃত্যুর পূর্বে স্নেহপাত্রটিকে একটিবার দেখিবার জন্য আমার মাতাপিতার সঙ্গে তিনি কলিকাতায় আসিলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গেই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীগুরুর পরমাশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। সেদিন মায়ের বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে শরৎ মহারাজের ঘরে আমরা যখন তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছি, তিনি বৃদ্ধার দিকে প্রসন্নমুখে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যেন ছোট বালিকার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, 'কিরে, তোর মন্ত্র মনে আছে?' তারপরে নিজেই বলিতে লাগিলেন, 'জপ করতে হবে না, দশবার জপ করলেই ঢের হবে—দশবার জপ করলেই ঢের হবে।' আমরা অবাক হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছি, কারণ তিনি সাধারণতঃ অধিকসংখ্যায় জপ করিতেই বলিতেন জানিতাম। তখন মনে হইয়াছিল, পিসীমার অনেক বয়স হইয়াছে। বেশী জপতপ তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিবে না বলিয়াই ঐরূপ বলিতেছেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে, পিসীমার নিজমুখের কথা শুনিয়া সেই ধারণা পালটাইয়া গেল। নিজের ভাষায় এই মর্মে তিনি বলিয়াছিলেন: 'বাবা, আমি গঙ্গাস্নান করিতে যাই নাই, গুরুলাভ করিতেও যাই নাই। শুধু একটিবার তোমাকে চোখের দেখা দেখিতে গিয়াছিলাম। তোমাকে যে দিন কয়েক কোলে করিয়াছিলাম তাহা সার্থক হইয়াছে—কাচ কুড়াইতে গিয়া কাঞ্চন পাইয়াছি। গুরুদেবকে সেই যে একবারমাত্র দেখিয়াছি আর ভুলিতে

পারিতেছি না; তাঁহার মূর্তি আমার মানসপটে আঁকা হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রও বিস্মরণ হইতেছে না। তবে শাদা চোখে আর তাঁহাকে দেখিব না—আমার সময় নিকট হইয়াছে।' তাঁহার কথাই সত্য হইল, সম্বৎসরের মধ্যেই তাঁহার আবাল্য সেবাপরায়ণ জীবনের অবসান ঘটিল। তাঁহার দেহত্যাগের কথায় মহারাজ আমাকে পত্রোত্তরে লিখিয়াছিলেন, 'তিনি পুণ্যলোকে গিয়াছেন, সন্দেহ নাই।'

একদা জনৈক শিষ্য[৭] তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আমার কি আলাদা এসে পরের জন্মে সিদ্ধ ফিদ্ধ হতে হবে নাকি? না আপনাদের সঙ্গেই আসতে হবে?' তাহাতে তিনি উত্তর দেন, 'আর আলাদা ফালাদা নয়। এবার যাদের যাদের না হবে, তারা ফের যে যেমনটি ভাবে এসেচে তেমনটি আসবে।' এই জন্মই যাহাতে শেষ জন্ম হয় তজ্জন্য ঐ শিষ্য একদিন বিশেষ করিয়া ধরাতে উত্তেজিতভাবে তিনি বলিয়াছিলেন, 'বেশ। তুমি আর নাও আসতে পার, কিন্তু আমার আবার আসতে হবে।' বারান্তরে বলিয়াছিলন, 'আবার আসতে ভয় কিরে? যা, সব একসঙ্গে আসা যাবে। তাতে তোর ভয় কি?'

গুরু-শিষ্য উভয়ের জন্মান্তরীণ গতির কথা শিষ্যকে জানাইয়া দিয়াই গুরু ক্ষান্ত হন নাই, স্বীয় নিত্যা গতির কথাও তাঁহাকে শোনাইয়া রাখিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে একদিন নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হয়: 'তুমি যে আমাকে এত ধরেচ, এর পরে তুমি আমায় পাবে কোথায়? আমি তো তাঁতে মিশে থাকব।' 'একেবারে মিশলে আমাদের ডাক শুনতে পাবেন কি?' 'তুমি যদি তেমন উচু করে ডাকতে পার, তিনি শুনবেন বৈকি।' 'আপনার এ দেহ থাকতে যে সুবিদে পাওয়া যাচ্চে তা তো পাওয়া যাবে না।' 'দেহের advantage

৭ শ্রীনিখিলেশ্বর সান্যাল

(সুবিধা) আছে বৈকি।' 'আপনারা—ঠাকুরের সন্তানেরা—সকলেই কি, যা বল্লেন, মিশে থাকবেন?' 'সকলেই জেনো। তবে যদি কেউ কেউ একদম না মিশে থাকেন, এত সামান্য তফাৎ, মিশাই জেনো।'

এই মিশে থাকাই কি শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরসাযুজ্য?

* * *

শ্রীমতী সরলা লিখিয়াছেনঃ "শ্রীশ্রীমার শরীর যাওয়ার পর স্ত্রীভক্তেরা পূর্ব্ববৎ তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া প্রণাম করিয়া যাইতেন। মহারাজের সহিত দেখা করিলে তিনি যথাসম্ভব মায়ের মত যত্ন করিতেন। যেসকল স্ত্রীলোক মহারাজের সঙ্গে কোন সময়ই কথা বলেন না, বা বলিতে সাহস পান না, ভিতরে কথা বলিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা প্রণামমাত্র করিয়া চলিয়া যাইতেন। কেহ কেহ যোগীন-মার ভিতর দিয়া দুইএকটি কথা কহিতেন। এইভাবে তাঁহারা মহারাজের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। পরবর্তী কালে তাঁহাদের অনেকেই আমাকে বলিয়াছেন, 'দেখ ভাই, মহারাজকে আমরা কতই না গম্ভীর মনে করতুম, কিন্তু কি আশ্চর্য, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় মনে হয়েচে ঠিক যেন মার সঙ্গে আলাপ করচি। পুরুষমানুষের সঙ্গে কথা কইচি বলে মনেই হত না, তাই যেকোন কথা বলতে সঙ্কোচও হত না।' সত্যই মহারাজের কাছে আমরা মায়ের ভালবাসা পাইয়াছি। কত কথা মনে হইতেছে। রাধু একবার চিঠিতে লিখিয়াছিল, 'মহারাজদাদা, মা আমাদের নাই বলে কি আমরা মায়ের বাড়ীতে যেতে পাব না?' তাহা পড়িয়া মহারাজ কি করিয়া যে তাহাকে ভুলাইবেন, ভাবিয়া পান নাই। এ যে মায়ের পালিতা মেয়ে। কিরূপ যত্ন তাহার করা উচিত তাহা তিনি ব্যবহারে দেখাইয়াছিলেন—নিজের কাছে আনিয়া মায়ের স্নেহে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। দ্রষ্টা ভিন্ন কে অনুভব করিবে!

তাই রাধু বলিয়াছিল, 'মহারাজদাদার জন্যে আমরা মায়ের অভাব বুঝতে পারি নি।' প্রত্যেক ভক্ত স্ত্রীলোক এই একই কথা বলিতেন, 'আমরা মা-হারা হয়ে মা পেয়েচি।'[৮] তাঁহারই স্নেহে বর্ধিত একজন তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আপনি যে এত মেয়েদের ভালবাসেন, লোকে কি বলবে ?' প্রশ্ন শুনিয়া তিনি কোন উত্তর করিলেন না। কয়েকদিন পরে ঐ মেয়েটি যখন আসিয়াছে তখন বলিয়াছিলেন, 'দেখ গা, সেদিন মঠে গিয়েছিলুম। ঠাকুরঘরে ঠাকুরকে প্রণাম করে বলচি,—ঠাকুর, তবে কি মেয়েদের ভালবাসায় [মোহে] আমি বদ্ধ হলুম নাকি ? পরে দেখি, ঠাকুর দেখা দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে বলচেন,—না, তুই আমাকেই ভালবাসিস। তখন আশ্বস্ত হলুম। দেখ বাবু, ঠাকুর তো আমায় এইরূপ বল্লেন।'

জগতের যাবতীয় নারীমূর্তির ভিতর জগদম্বার বিশেষ প্রকাশ যিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন ও সর্বভূতে যিনি ঈশ্বরদর্শন করিতেন তাঁহার মোহ-সম্ভাবনা কোথায় ? আর এই যে মেয়ে-ভক্তদের তত্ত্ব-তালাস—সুখদুঃখের কাহিনী নিয়ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে শান্তি দান ও ধর্মপথে উন্নয়নের চেষ্টা—ইহাও তিনি শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে

---

৮ এই জাতীয় পুরুষভক্তের সংখ্যাও বড় কম নহে। সারদানন্দ-শিষ্যা মিসেস্ ই. বি কুক লিখিয়াছেন : "I always call Sri Guru Maharaj 'মা'—it seems to be my natural cry. I always addressed my Swami as that too. He has signed himself that. I know who he was and is. He could not hide from me." [আমার গুরু মহারাজকে আমি সর্বদাই 'মা' বলে থাকি। সেই বলা আমার প্রাণের বলা। আমি তাঁকে সর্বদাই মা নামে সম্বোধনও করি। নিজেও তিনি 'মা' স্বাক্ষর করেচেন। তিনি কে, আমি জানি। আমার কাছে তিনি নিজেকে লুকোতে পারেন নি।] আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, দীক্ষাগ্রহণকালে শ্রীমতী কুক গুরুমূর্তির স্থানে শ্রীশ্রীমাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে এক প্রস্থ লীলাপ্রসঙ্গ উপহার দিয়া 'মা' দস্তখত করিয়াছিলেন।

দায়স্বরূপে পাইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার তিরোভাবের পর তাঁহাদের জুড়াইবার স্থান আর ছিল না।

যাহাদের কেহ দেখিবার নাই এমন কত অনাথা বিধবা শরৎ মহারাজের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন; সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া মাসে মাসে স্থদ আদায় করিয়া তাঁহাদিগকে পাঠাইতে হইত। কাহাকেও বা কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় করিয়া দিতে হইত। একবার শরৎ মহারাজের কাশী যাওয়ার সময় হিসাবপত্র বুঝিয়া লইতে গিয়া স্বামী পূর্ণানন্দ দেখিলেন, অনেকের গয়না, কোম্পানির কাগজ ইত্যাদি তাঁহার আলমারিতে জমা রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীমা তাঁহার পালিতা কন্যা রাধারাণীর ভবিষ্যতের কথায় একদিন বলিয়াছিলেন, 'রাধুর ভাবনা কি, শরৎ আছে। শরৎ সবাইকে পালন করবে। শরৎ আমার বিষ্ণুর অংশে জন্মেচে।'

* * *

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ। ২৯শে জানুয়ারী কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া পুজনীয় শরৎ মহারাজ পরদিন কাশীধামে পৌছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন সান্যাল মহাশয়, যোগীন-মা, মহামায়া মিত্র, ও দুইতিন জন ব্রহ্মচারী। মহাপুরুষ মহারাজ পুর্বেই কাশীতে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে বাস করিতেছিলেন, মাঘী পূর্ণিমায় পুজনীয় লাটু মহারাজের স্মৃতিগৃহ প্রতিষ্ঠার পর কনখলে চলিয়া যান।

শরৎ মহারাজের শরীর ক্রমশই যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। বাতব্যাধি পুর্ব হইতেই তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়াছিল, ইদানীং বহুমূত্রও দেখা দিয়াছে। কিন্তু শারীরিক অপটুতা অগ্রাহ্য করিয়াই যেন দিনদিন তিনি জপধ্যানে অধিকতর অভিনিবিষ্ট হইতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষাদানাদি কার্যও সমভাবেই চলিয়াছিল। কাশীতে

3/439

আসিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিতে থাকায় স্নানদর্শনাদিও মাঝে মাঝে করিতে লাগিলেন।

এখানে সেবাশ্রমের কর্মীদের মধ্যে কেহ কেহ, এবং দুইজন পাশ্চাত্য মহিলা—'ফক্স ভগিনীদ্বয়' তাঁহার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কাশীতে শ্রীশ্রীমা দীক্ষা দিতেন না। সেই কথা স্মরণ করিয়া শরৎ মহারাজ নৌকাযোগে গঙ্গার অর্ধাংশ অতিক্রম করিয়া গঙ্গার উপরেই ফক্স ভগিনীদ্বয়কে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের জন্মতিথি আগতপ্রায় হইল এবং অনেকে তাঁহার কাছে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস-প্রার্থী হইলেন। তাঁহার নিকট হইতে তিথিপূজার রাত্রে, ৺কালীপূজার পর ব্রাহ্মমুহূর্তে, চারিজন ব্রহ্মচর্যব্রত ও এগারজন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।[৯]

এই সময়ে স্বামী প্রকাশানন্দ আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কাশীধামে আগমন করেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ছাত্র ও অধ্যাপকগণ উদ্যোগী হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলে আমেরিকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া তিনি এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।[১০] শরৎ মহারাজ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং

---

৯ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের নামকরণের জন্য প্রায় ৬০টি নামের তালিকা তাঁহার হাতে দেওয়া হইয়াছিল। 'তিন অক্ষরের নামগুলিই ভাল'—এই কথা বলিয়া তাঁহার নিজের পছন্দমত নাম তিনি প্রত্যেককে দিয়াছিলেন। সংস্কার দৃঢ় করিবার জন্য সাধারণতঃ নূতন সন্ন্যাসীরাই তিনদিন মাধুকরী করিয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মচারীদিগকেও তিনদিন মাধুকরী করিয়া খাইতে বলিয়াছিলেন।

১০ কাশী সেবাশ্রমে লেখকের তৎকালীন সহকর্মী অদ্ভুতচৈতন্য (মাণিক) এই অভিনন্দন-ব্যাপারের একজন পাণ্ডা। আমরা একই ঘরে থাকিতাম। সে ধরিয়া বসিল, 'একটা গান লিখে দাও প্রকাশানন্দ সম্বন্ধে—হিন্দু য়ুনিভার্সিটির ছেলেরা গাইবে।' লেখায় তখন মোটেই অভ্যস্ত ছিলাম না, তথাপি তাহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া চেষ্টাচরিত্র করিয়া একটা দাঁড় করাইলাম। সরল নির্ভীক অদ্ভুতচৈতন্যের অনেক কাজই

ফিরিবার পথে পুঁটিয়ারাজ-ভবনে সকলের সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। এখানে শরৎ মহারাজের যে স্নেহমধুর মূর্তি দেখিয়াছিলাম সুদীর্ঘকালের ব্যবধানেও তাহা চিত্তে জাগরূক আছে। মহারাজ ও সান্যাল মহাশয় পাশাপাশি দুই চেয়ারে বসিয়াছেন, আর নিকটেই নীচে বসিয়া আমরা গল্প সুরু করিয়া দিয়াছি, এমন সময় একটি কচি মেয়ে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বাৎসল্যভরে মুখচুম্বন করিয়া মেয়েটিকে মহারাজ কোলে তুলিয়া লইলেন।

এই যাত্রায় শরৎ মহারাজ দুই মাসকাল কাশীবাস করেন। সকালবেলা নিজ নিজ অবসরসময়ে যাইয়া কেহ কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিতেন এবং সন্ধ্যার পর জপধ্যান সারিয়া প্রায় সকলেই তাঁহার কাছে যাইয়া বসিতেন। ঐ সময়টায় 'লক্ষ্মীনিবাসে'র দোতলার বারান্দায় প্রায় একমাস ধরিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (গুরুভাব পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ) পঠিত হইয়াছিল। স্বামী শুভানন্দ পাঠ করিতেন ও সকলে একচিত্ত হইয়া শুনিতেন। পাঠান্তে প্রশ্নোত্তরও চলিত; কোনদিন বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মহারাজ নিজেই পঠিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করিতেন।

এই আসরে একদিন জনৈক সাধু[১১] একজনের কোন গর্হিত

অদ্ভুত ধরণের ছিল; সে লেখাটি লইয়া সোজা শরৎ মহারাজের কাছে চলিয়া গেল এবং উহা কেমন হইয়াছে ও গাওয়া চলিবে কিনা এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিল। মহারাজ সবেমাত্র বিশ্রাম করিয়া উঠিয়াছেন, এবং কবিতাটিও তাঁহার শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে লেখা, তথাপি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সমদর্শী মহাপুরুষ মনোযোগের সহিত পড়িয়া দেখিলেন, এবং 'বেশ হয়েচে' মন্তব্য করিয়া 'ধন্য তুমি হে প্রকাশানন্দ, বিবেকানন্দ-সঙ্গী মহান' এই পংক্তির 'সঙ্গী' শব্দের স্থানে 'শিষ্য' বা 'পুত্র' লিখিতে বলিয়া দিলেন।

১১ স্বামী গঙ্গানন্দ।

আচরণের কথা বলেন, এবং শ্রীশ্রীমার বিশেষ কৃপা পাওয়া সত্ত্বেও অমন কাজ সে কিরূপে করিতে পারিল জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্ন শুনিয়া মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ও তারপরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন: 'যে ভাবের চিন্তায় নিজের ক্ষুদ্র বিশ্বাসভক্তির হানি হয় তা কখনো মনে স্থান দিয়ো না। তাকে তোমরা আজ এমন দেখচ, দশ বছর পরে সে যে একজন মহাপুরুষ হয়ে দাঁড়াবে না, কি করে জানলে? তখন তোমরাই বলবে, 'তা হবে না? সে যে মার কত কৃপা পেয়েছিল!' মার মহিমা, মার শক্তি কতটুকু, আমাদের কি সাধ্য বুঝি। এমন আসক্তিও দেখি নি, এমন বিরাগও দেখি নি। এদিকে তো রাধু রাধু করে অস্থির, কিন্তু শেষকালে বল্লেন, 'একে পাঠিয়ে দাও।' তাঁকে বল্লুম, 'মা, আপনি রাধুকে পাঠিয়ে দিতে বলচেন, পরে যখন আবার দেখতে চাইবেন তখন কি হবে?' মা বল্লেন, 'না, আর আমার ওর উপর কিছুমাত্র মন নাই।' এইভাবে মায়ের কথা বলিতে বলিতে তিনি যেন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন ও আপন মনে গান ধরিলেন:

তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি।
হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি॥
বিচিত্র ভবের মেলা
ভাঙ্গ গড় দুটি বেলা;
ঠিক যেন ছেলেখেলা বুঝতে পেরেছি।
এতকাল রইলাম কাছে
বেড়াইলাম পাছে পাছে,
চিনিতে না পেরে এখন হার মেনেছি॥

ইহা একটি ব্রাহ্মসঙ্গীত; কিন্তু গীতোক্ত ভাবে ও ভাষায় শরৎ মহারাজের জীবনালেখ্য, তাঁহার মর্মবাণী কি সুন্দরই না ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৩০শে মার্চ শরৎ মহারাজ সদলে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরের নির্মাণকার্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, অক্ষয়তৃতীয়ায় প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব হইবে, তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃত হইবেন। কাশীতে একটি ছেলেকে বলিয়াছিলেন, 'জয়রাম-বাটীতে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে শুনেচিস তো? কলকাতায় গিয়ে সেই চিন্তায় একেবারে ডুবে যাব—অন্য কোন কথা মনে থাকবে না।'

* * *

১৫ই এপ্রিল কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া স্বামী সারদানন্দ পরদিন সন্ধ্যায় জয়রামবাটীতে পৌছিলেন। বিষ্ণুপুরে স্বরেশ্বর সেন মহাশয়ের বাটীতে রাত্রিবাস করিয়া কোয়ালপাড়া পর্যন্ত তিনি মোটর গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার দেহ তেমন সুস্থ ছিল না। তাঁহার সঙ্গে আগত শতার্ধসংখ্যক সাধু ও গৃহী ভক্তেরা বিষ্ণুপুর হইতে গোযানে আসিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির ইষ্টকনির্মিত ও প্রায় ৪৫ ফুট উচ্চ; উহার চারিদিকে সুপরিসর বারান্দা, উপরে একটি গম্বুজ ও গম্বুজের শীর্ষদেশে মা-নামাঙ্কিত নিশান। এতদঞ্চলে এত বৃহৎ ও উচ্চমন্দির আর একটিও নাই। মন্দিরের মধ্যস্থলে কৃষ্ণপ্রস্তরের বেদী যেখানে মা পূর্বমুখী হইয়া বসিবেন। বেদীর পশ্চাদ্ভাগে মার বিশ্রামগৃহ ও সম্মুখে ভক্ত-সন্তান-গণের বসিবার স্থান। ভিতরে ও বাহিরে দাঁড়াইয়া ও বসিয়া বহুলোক একসঙ্গে দর্শনাদি করিতে পারে। সারদানন্দ মন্দির দেখিয়া সুখী হইলেন।[১২]

---

১২ শ্রীশ্রীমার শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে সুদৃশ্য নাটমন্দির নির্মিত হইয়া মন্দিরের পরিসর বাড়িয়া গিয়াছে এবং বেদীর উপরে মায়ের তৈলচিত্রের পরিবর্তে মর্মরমূর্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।

মহোৎসবের কাজে সাহায্য করিয়া ধন্য হইবার মানসে কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে সাধুরা কিছুদিন পূর্ব হইতেই আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িয়া প্রায় একশতে দাঁড়াইল। ইতঃপূর্বে মঠের অপর কোন অনুষ্ঠানেই এত অধিকসংখ্যক সাধু একত্র সমবেত হন নাই। দূরাগত গৃহস্থ ভক্তগণের সংখ্যাও অন্যূন তিনশত হইবে। জয়রামবাটী আসিতে তৎকালে যে পথকষ্ট ভোগ করিতে হইত তাহা মনে রাখিলে এই সংখ্যা খুব বেশী বলিয়াই বিবেচিত হইবে। আয়োজনের তুলনায় লোক-সমাগম অনেক অধিক হইয়াছে দেখিয়া যোগীন-মা চিন্তার ভাব দেখাইলে শরৎ মহারাজ কহিলেন, 'মায়ের ইচ্ছায় সব হচ্চে।'

১৯শে এপ্রিল, ৬ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন। পূর্বদিনে ঘটস্থাপনা করিয়া শ্রীশ্রীগণপতি ও শিবাদি পঞ্চদেবতার ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া গিয়াছে। আজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার বিশেষ পূজা হইল, আনুষঙ্গিক অনেক দেবতার পূজাও হইল—সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা চলিল। সিদ্ধপূজক শ্বেতশ্মশ্রু স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ একাই যাবতীয় পূজাকার্য নিষ্পন্ন করিলেন, একটিবারের জন্যও তন্ত্রধারকের প্রয়োজন হইল না।

শ্রীশ্রীসারদা-মাতার অনুধ্যানে তন্ময় হইয়া সারদানন্দ মহারাজ মন্দির-মধ্যে সুখাসনে বসিয়া আছেন। পূজনীয়া যোগীন-মা হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, দিব্যজ্যোতিতে মন্দির আলোকিত করিয়া মা বেদীর উপরে আসীনা। এই দর্শন এতই জীবন্ত হইয়াছিল যে, যোগীন-মার ভয় হইয়াছিল মা বুঝি কলিকাতা ছাড়িয়া চিরতরে জয়রামবাটীতে চলিয়া আসিয়াছেন। তাই জয়রামবাটী হইতে চলিয়া যাইবার সময় মাকে প্রণাম করিয়া তিনি কাতরভাবে বলিয়াছিলেন, 'মা, কলকাতায় ফিরে চল।'

সন্নিহিত ও দূরবর্তী গ্রামসমূহ হইতে অগণিত নরনারীর সমাগম হইয়াছে। সন্তানকোলে বহু জননীও আসিয়াছেন পাঁচক্রোশ রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া। বিস্ময়বিস্ফারিতচক্ষে তাঁহারা মাকে দেখিতেছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও মুখের স্বগতোক্তি শোনা যাইতেছে, 'সতী লক্ষ্মী!'

দিন বারটা হইতে রাত্রি বারটা পর্যন্ত প্রসাদান্ন বিতরণের কাজ চলিল। পঁচিশ জন পাচক অবিরাম রন্ধনকার্য চালাইয়া চল্লিশ মণ চাউলের অন্ন ও আনুষঙ্গিক ব্যঞ্জনাদি—তন্মধ্যে প্রচুরপরিমাণে মাছের কালিয়াও আছে—প্রস্তুত করিয়াছে। সকল আহার্যই অতি উপাদেয় হইয়াছে। প্রায় আট হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পাইল। কেহই অভুক্ত ফিরিয়া যায় নাই।

প্রথম পংক্তির ভোজনারম্ভে কিঞ্চিৎ গোলযোগের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল—ব্রাহ্মণদের অগ্রাধিকারের দাবী উঠিয়াছিল। সেইকথা কেহ পুজনীয় শরৎ মহারাজের গোচরীভূত করিলে তিনি শুধু বলিয়াছিলেন, 'কাউকে অসন্তুষ্ট করা চলবে না।' সেবকেরা ও মায়ের ভক্ত-সন্তানেরা অশেষ ধৈর্যের পরিচয় দিলেন, কোন অবাঞ্ছিত ব্যাপারই ঘটিতে পারিল না। তারপরে এমন হইল যে, বর্ণবিচার বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই আর রহিল না—ব্রাহ্মণাদি সর্বশ্রেণীর লোক যে যেখানে পারিল বসিয়া পড়িয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। সামাজিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পল্লীগ্রামে এই স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনার দৃশ্য সুকঠিন মনকেও দ্রবীভূত করিল, মেজমামা কালীকুমার মুখোপাধ্যায় মন্দিরে শ্রীশ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, 'দিদি, তোমারই মহিমা!'

রাত্রি অনেক হইয়াছে। মন্দিরের চারিপাশের বারান্দা ধূলায় ধূলিময় হইয়াছিল, ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া আমরা—স্বামী জগদানন্দ, সারদেশানন্দ ও লেখক—

শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গ করিতেছিলাম, এমন সময় দূরাগত কতিপয় নারী আবেদন জানাইলেন তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ মন্দিরের ধূলা সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। এই দ্রব্যটি কিছুক্ষণ আগেও অতি সুলভ ছিল, এখন দুর্লভ হইয়াছে; কাজেই আমাদিগকে উহা সংগ্রহ করিতে কিছুটা বেগ পাইতে হইল। অভিলষিত বস্তুটি পাইবামাত্র অতিশয় ভক্তির সহিত তাঁহারা উহা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন। এইরূপ কত করুণ দৃশ্যের অবতারণাই যে আজিকার পুণ্য দিনটিতে হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সব কিছু দেখিবার শুনিবার সমান সুযোগ কাহারই ঘটিয়া উঠে নাই।

শ্রীশ্রীমায়ের সত্তা জয়রামবাটীর আকাশে বাতাসে যেন আজ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। শান্তি ও আনন্দরূপে প্রত্যেক ভক্তহৃদয়েই তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন—যে যেমন আধার সে তেমনটি অনুভব করিয়াছে। তাই তাঁহার ভক্তছেলেরা সমস্তদিন অশেষ পরিশ্রমের কাজ করিয়াও কষ্ট অনুভব করে নাই। দারুণ গ্রীষ্মে 'ডাক বসাইয়া' দূরের জলাশয় হইতে বালতি ও মাটির কলসীযোগে জল আনিয়া তাহারা সহস্র সহস্র লোকের তৃষ্ণানিবারণ করিয়াছে, রন্ধনের উপায় করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেকটি কার্যই তাহারা এইরূপে যোগ্যতার সহিত সুনিষ্পন্ন করিয়াছে।

সানাই, ভজনকীর্তন, বহুঢাকের বাদ্যঘটা, লাঠিচালনার চাতুর্য—দ্রষ্টার মত থাকিয়া শরৎ মহারাজ সব কিছুই দেখিয়া ও শুনিয়া যাইতেছিলেন। শ্রীশ্রীমার অপরাপর সন্তানগণের মতই তিনিও যেন মহোৎসব দেখিতেই আসিয়াছেন ও মহোৎসবের অঙ্গীভূত ব্যাপারসমূহ দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, মনে হইতেছিল। মায়ের ইচ্ছায় মায়ের কাজ হইতেছে। মা যদি তাঁহার মত অক্ষম সন্তানকে নিমিত্তমাত্র করিয়া থাকেন তাহা মায়েরই মহিমা।

এই মাতৃভাবময় শিশুর দেহমনকে আশ্রয় করিয়া জগন্মাতা তাঁহার গুরুভাবের এক অপূর্ব খেলা দেখাইলেন। দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস, পূর্ণাভিষেক—যে যাহা চাহিল সে তাহাই পাইয়া গেল। শ্রীশ্রীমা কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। সেইজন্য কেহই বিমুখ হইল না।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পরদিন বাইশ জনের ও তাহার পরের দিন সাত জনের দীক্ষা হইল। শ্রীশ্রীমার দীক্ষা দিতে অধিক সময় লাগিত না, কিন্তু শরৎ মহারাজের লাগিত। জয়রামবাটীতে দেখা গেল, অল্প-সময়ের মধ্যেই একএক জনের দীক্ষা হইয়া যাইতেছে। দীক্ষার্থী ব্যক্তিগণের মধ্যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্ফীতোদর কঙ্কালসার ব্যক্তিরাও আছে এবং নির্বিচারে মহারাজ সকলকেই দীক্ষা দিতেছেন দেখিয়া যোগীন-মা বিচলিত হইলেন, কিন্তু মহারাজকে কোন কথা বলিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না।

একএক জন করিয়া দীক্ষা দিতে অনেক বেলা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সেবক মহারাজের জন্য এক গ্লাস সরবৎ লইয়া আসিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যোগীন-মার নাম করিয়া দিলে মহারাজ উহা গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না। কারণ, যোগীন-মাকে তিনি মান্য করিতেন। কিন্তু ইহাতে ফল হইল ঠিক উল্টা। 'কে তোর যোগীন-মা ?'—বলিয়া সেবককে তিনি এক ধমকে বিদায় করিলেন। দীক্ষাদানকালে যিনি দ্বাররক্ষকের কার্য করিতেছিলেন তিনি অল্পবয়সের দুইটি বালককে একসঙ্গে ভিতরে যাইতে দিতে চাহিল তাহাতেও অমত প্রকাশ করিলেন।

শুক্রবার শেষরাত্রে ব্রাহ্মমুহূর্তে আচার্যদেবের নিকট হইতে আটজন ব্রহ্মচর্যব্রত ও এগারজন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মচর্যব্রতিগণের মধ্যে দুইজন ছিলেন সংসার-সম্পর্কে পিতা ও পুত্র। শনিবার দ্বিপ্রহরে ঘটে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীদেবীর অর্চনা হইল; এবং রাত্রে মহানিশায়

মা-কালীর পূজা হইয়া যাইবার পর চারিজন তন্ত্রোক্ত মতে পূর্ণাভিষিক্ত হইলেন।

শক্তি-মহাপীঠের প্রতিষ্ঠা সাঙ্গ করিয়া আচার্য ২৩শে এপ্রিল সোমবার সদলে কামারপুকুরে আসিলেন এবং তথায় একদিন মাত্র তীর্থবাস করিয়া কোয়ালপাড়া মঠে শুভাগমন করিলেন। কোয়ালপাড়ায় দুইতিন দিন থাকিয়া তিনি বিষ্ণুপুরে আসেন ও বিষ্ণুপুর হইতে বাঁকুড়ায় যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে চারিপাঁচ দিন বাস করেন। জয়রামবাটীতে জগন্মাতার আবেশে গুরুভাবের যে অপূর্ব বিকাশ তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা সমভাবেই আপন কাজ করিয়া যাইতেছিল। কোয়ালপাড়ায় কুড়িজন, বিষ্ণুপুরে দশজন ও বাঁকুড়ায় তেত্রিশ জন তাঁহার কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া নবজীবন লাভ করিল।

২রা মে বাঁকুড়া হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন সকালে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। সমস্ত মিলিয়া যে অভাবনীয় ব্যাপার জয়রামবাটীতে ঘটিয়া গেল, অথচ দীর্ঘকালের চেষ্টায়ও কামারপুকুরে কিছুই হইয়া উঠিল না, ইহা অনুধাবন করিয়া পূজনীয়া যোগীন-মা বলিয়াছিলেন, 'শক্তির শক্তি বেশী।' সে কথায় যোগীন-মার দিকে তাকাইয়া শরৎ মহারাজ মুখের ভাবে মৌন সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।[১৩]

১৩ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র দত্ত জয়রামবাটীতে ইহা প্রত্যক্ষ করেন।

১৫

দরদী দেবতা

কলিকাতায় একদিন গোলাপ-মা কিংবা যোগীন-মা বলিলেন, 'ও শরৎ, এই শোন, অক্ষয়-মাষ্টার [পুঁথিতে] তোমাদের দেবতা বলেচে।' শরৎ মহারাজ অমনি উত্তর দিলেন, 'দেবতা বৈকি। আমরা যে তাঁকে দেখেচি!'

ভগবদ্দর্শনের ফলে মানুষ দেবতা হইয়া যায়। স্বয়ং দেবতা না হইয়া দেবতাকে কেহই ঠিক ঠিক জানিতে বুঝিতে পারে না, কিন্তু মানববিগ্রহ দেবতার মানবোচিত গুণরাশিকে অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এ পর্যন্ত সারদানন্দ-চরিত্র যেটুকু বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে পাঠকের যদি এই ধারণাটুকুও না জন্মিয়া থাকে যে, স্বামী সারদানন্দ কেবল মানবোচিত বহু সদ্‌গুণেরই অধিকারী ছিলেন না, পরন্তু কোন কোন গুণে সত্যই অতুলনীয় ছিলেন, তাহা হইলে লেখকের অক্ষমতাই তজ্জন্য দায়ী। তাঁহার মানবদরদী রূপটিকে আমরা নানা অবস্থার মধ্যে দেখিয়া আসিয়াছি, এই অধ্যায়ে উহাকেই আর একটু কাছে টানিয়া লইয়া দেখিতে প্রয়াস পাইব।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যোগীন-মার তিনটি অনাথ দৌহিত্রকে তিনি নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। সর্বপ্রযত্নে, নিজে বহু অসুবিধা ভোগ করিয়াও, তিনি তাঁহাদিগকে মানুষ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই একজন বলিয়াছেন: "আমাদের মা মারা যাবার পর থেকে আমাদের অতি নিকট আত্মীয়ভাবে তিনি আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আমরা কিছু বুঝি না, সেভাবে তাঁকে কোনদিন বুঝবার চেষ্টাও করি নি; এবিষয়ে মেজদা ঠিকই

বলেছিল, 'তাঁকে আমরা সাধু হিসাবে দেখি নি, মায়ের মতন দেখতুম।' শীতকালে একদিন রাত্রে তিনি বলেন, 'বড্ড বাতাস আসচে, ভুলু, জানালাটা বন্ধ করে দিবি নাকি?' ভুলু বল্লে, 'আপনিই দিন না, মহারাজ।' তিনি উঠে জানালা বন্ধ করে দিলেন।

"দুটি কথা তাঁর সম্বন্ধে খুব মনে পড়ে। কাশীতে মা মারা যাবার পর আমরা কেদারঘাটের কাছে একখানা বাড়ীতে থাকতুম। একদিন বৈকালে কেউই বাড়ী ছিলেন না, আমার শরীর ভাল ছিল না বলে আমি বেরুই নি। ইতিমধ্যে যে স্ত্রীলোকটি আমাদের রান্না করতেন তিনি এলেন। অন্যদিন মেজদি রুটি বেলে দিত, সেদিন মেজদি না থাকায় আমি চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু একএকখানা একএক আকারের হতে লাগল। শরৎ মহারাজ বাড়ী ফিরে রান্নাঘরে এসে বল্লেন, 'কি রে মণ্টি, কি কচ্চিস?' আমি বল্লুম, 'মহারাজ, রুটি বেলচি।' তিনি, বল্লেন, 'ওরে বাঁদর, ওই বুঝি তোমার রুটি বেলা হচ্চে? সর্, আমি বেলে দি।' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি রুটি বেলতে পারেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তুই বুঝি মনে করিস আমি বরাবর এইরকম শরৎ মহারাজ হয়ে বসে আছি? আমরা একসময় ৪০।৫০ জন লোককে রেঁধে খাওয়াতুম।' এই বলে সেই প্রকাণ্ড ভুঁড়ি নিয়ে চেপ্‌সে বসে সব রুটি বেলে দিতে লাগলেন, আমি হাঁ করে দেখতে লাগলুম। তখন আমার বয়স ১৩।১৪ বছর।

"আমার শিবপুর কলেজে পড়ার সময় যেবারে এসে বল্লুম, 'মহারাজ আমি ১৫৲ টাকা স্কলারশিপ পেয়েচি।' তিনি বল্লেন, 'যা বিশ্রাম করগে যা। ওরে সাতু, মণ্টিকে দুখানা বিস্কুট দে, চা দে, আর মিষ্টি-টিষ্টি থাকে তো দে।' আর পুনঃপুন ফেল হয়েও যখন এসে বলেচি, 'মহারাজ. ফেল হয়ে গেচি, তখনও

তাঁর সেই একই কথা, 'যা ঠাণ্ডা হয়ে বসগে যা, ওরে সাতু, মন্টিকে চা বিস্কুট দে।' কোন তফাৎ নেই, অথচ এর সমস্ত দায়িত্ব তাঁরই ছিল। উপর থেকে দিদিমা চীৎকার করে উঠলেন, 'ও শরৎ, শুনচ, মণ্টে আবার ফেল হয়ে এসেচে?' তিনি নির্বিকারভাবে বল্লেন, 'হ্যাঁ শুনেচি।'

আর একজন [১] লিখিয়াছেন: "স্বামী প্রেমানন্দের পুর্বাশ্রমীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বগ্রাম আঁটপুরে রাখাল মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সকলকে নিয়ে একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করেচেন। আমি সটান বায়না ধরলাম—আপনার [শরৎ মহারাজের] আঁটপুর যাওয়া হতে পারে না। আপনি চলে গেলে কাকে পেন্নাম করে আমি রোজ একজামিন দিতে যাব?' তিনিও আমার মতে মত দিলেন। দেখ বাপু, ও ছেলেমানুষ, আমি চলে গেলে ও একজামিন দিতে যেতে পারবে না। কোনো বার এমন হয় না, এবার বড় ঘাবড়ে গেচে। কি করে যাই?...তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তাঁরই গুণে কোনদিনই পাতানো সম্বন্ধ ছিল না।...

"উনি কাশী যাচ্চেন মাস দুইতিনের জন্যে। হাওড়া ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে তুলে দিতে গিয়েচি, বিদায়বেলায় কাঁদচি। মাথায় হাত বুলিয়ে বলচেন—ওরে পাগল, আমি আর কদিনের জন্যে যাচ্চি? দেখতে দেখতে দিন কেটে যাবে, আবার আমি এসে পড়ব। তোর যে কলেজ, নইলে সঙ্গে নিয়ে যেতুম।...ইদানীং তাঁর থপ্‌থপে চেহারা হয়েছিল। মা বলেও বোধ হত সময়ে সময়ে।...ছোটবেলা থেকে তাঁরই মানুষকরা অপর এক অনাথ বালক এম্‌-এ পাশ করে হাজারিবাগে অধ্যাপনা করতে গেল ১৯১৮-১৯। তার সেখানে মন টিকছিল না। খবর পেয়ে একজনকে বলচেন শুনলাম—আহা, তা

১ স্বামী নির্লেপানন্দ।

হবে বৈকি। ওরা ছেলেবেলা থেকে আমার কাছে কাছে রয়েচে, আমাকে ছেড়ে থাকবে কেমন করে ?”

পূর্বাশ্রম-সম্পর্কে স্বামিজীর ভাগিনেয় ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য নাড়ু (হরেন্দ্রনাথ) কর্তব্যনিষ্ঠা ও অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। বৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গড়িয়া তুলিতে তিনি আপ্রাণ পরিশ্রম করেন, কিন্তু অবস্থাচক্রে পড়িয়া অবশেষে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়া নাড়ু যখন শরৎ মহারাজকে প্রণাম করেন, মহারাজ তাঁহাকে পূর্ববৎ সস্নেহে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে টাকা ও কাপড় দিয়া যত্নপূর্বক ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়াইলেন। কিছুকাল পরে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া নাড়ু চিকিৎসার জন্য বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় মায়ের বাড়ীতে আসেন। নীচের ঘরে তিনি বিছানায় শুইয়াছিলেন, শরৎ মহারাজ কাছে আসিতেই অবিরল ধারায় কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় বুকে ও মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, ‘ভয় কি বাবা, মহারাজ তোমায় কত কৃপা করেচেন, তিনি তোমার পেছনে আছেন।’ নাড়ুকে তিনি এই সময় হইতে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করিতে থাকেন। তারপরে বৃন্দাবনে ফিরিয়া নাড়ু দেহ-ত্যাগ করিলে শরৎ মহারাজ তাঁহার স্ত্রীকে ও তৎকর্তৃক পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত একটি শিশুকে কলিকাতায় নিবেদিতা বিদ্যালয়ে আনিয়া রাখেন। ছেলেটি দুরন্ত, সেইজন্য দুপুরবেলা বিদ্যালয়ের দারোয়ান উহাকে শরৎ মহারাজের কাছে রাখিয়া যাইত ; আহারান্তে বিশ্রাম ভুলিয়া তিনি ছেলেটিকে লইয়া খেলা করিতেন। একদিন দুপুরে তাঁহার আহার যখন প্রায় শেষ হইয়াছে সেই সময় ছেলেটি আসিতেই তিনি একটা বাটিতে করিয়া কিছু দুধভাত উহাকে খাইতে দিলেন। দুধভাত দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সে কহিল, ‘কতদিন দুধ খাই নি!’ নাড়ুর

গরু ছিল ও ছেলেটি প্রচুরপরিমাণে দুধ খাইতে পাইত। পরদিন হইতেই শরৎ মহারাজ তাহার জন্য দুধ রোজ করিয়া দিলেন এবং সুন্দর জামাকাপড় দিয়া তাহাকে সাজাইলেন। কিছুদিন নিবেদিতা বিদ্যালয়ে থাকিয়া নাছুর স্ত্রী যখন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে চলিয়া গেল, শরৎ মহারাজ তখনও তাহাকে অর্থসাহায্য করিতেন ও তাহার ছেলেটির দুধের খরচ জোগাইতেন।

চুনি নামে এক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীমার পালিতা কন্যা রাধুর বিবাহে জয়রামবাটীতে যাইয়া শ্রমসাধ্য অনেক কাজ করেন। সেকথা শরৎ মহারাজ চিরদিন মনে রাখিয়াছেন এবং পরবর্তী কালে রুগ্ন ও অভাবগ্রস্ত চুনিবাবুকে টাকা দিয়া পুনঃপুনঃ সাহায্যও করিয়াছেন। কর্ম দ্বারা যেকেহ এইরূপে একদিনও তাঁহার স্নেহ অর্জন করিয়াছে, কখনও তিনি তাহাকে বিস্মৃত হন নাই। শ্রীমতী সরলা আসন্নপ্রসবা রাধুর পরিচর্যার জন্য কোয়ালপাড়ায় গিয়াছিলেন, মা, যোগীন-মা ও গোলাপ-মার সেবা করিয়াছিলেন, আবার শরৎ মহারাজেরই কথায় ধাত্রীবৃত্তিও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেইজন্য শরৎ মহারাজ তাঁহার ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান করিয়া রাখেন। নিজস্ব সাতহাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিয়া তিনি বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়া যান—এই সর্তে যে, যতদিন সরলা জীবিত থাকিবেন ততদিন তিনি এই টাকা হইতে লব্ধ সুদটি পাইবেন। ইতঃপূর্বে ঐ টাকার সুদটি তিনি বরাবর গোপনে দান করিতেন।

সিন্ধুনাথ পাণ্ডা শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য ; অবস্থাবৈগুণ্যে পড়িয়া স্বীয় বন্ধু ডাক্তার কাঞ্জিলালের নিকট হইতে কয়েকশত টাকা ধার করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে কাঞ্জিলালের সম্পাদিত উইল অনুসারে সেই টাকা বেলুড় মঠের প্রাপ্য হয়। ইহার ফলে সিন্ধুনাথ নিজেকে বিপন্ন মনে করিতেছেন জানিয়া শরৎ মহারাজ তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়া দেন।[২]

সিন্ধুনাথ জীবনে বহুবার তাঁহার অনুকম্পা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। আর একবারের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন: "প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া মায়ের বাড়ীর দরজার সামনে রকে বসিয়া আছি। খানিক পরে কপাট খোলা হইল, শরৎ মহারাজ উঠিয়া হাত মুখ ধুইলেন ও আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'কি গো, এত ভোরে কেন?' আমি বলিলাম, 'আজ আটটার সময় বাড়ী চলে যাব, মাকে প্রণাম করতে এসেচি।' তিনি এক ধমক দিয়া কহিলেন, 'এই কাল প্রণাম করে গেলে, ভোরবেলা তিনি এখনো উঠেন নি, তাঁকে তুলতে হবে? এতো বড় বিষম আব্দার দেখচি!' তখন পৃথিবী যেন আমার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে মনে হইল, দেয়ালের কাছে মুখ রাখিয়া দেয়াল খুঁড়িতে লাগিলাম। 'বস এই ঘরে, যদি হয়তো দেখা হবে'—এই বলিয়া তিনি সিঁড়ির নীচ হইতে বলিলেন, 'আমি যাচ্চি গো' এবং একটু পরেই উপর হইতে ডাকিলেন, 'সিন্ধু, এস।' খাটের উপর মা পা ঝুলাইয়া বসিয়াছেন, আর শরৎ মহারাজ একপাশে দাঁড়াইয়া আছেন হাত জোড় করিয়া। মাকে বলিলেন, 'এ আজ বাড়ী যাবে, তাই প্রণাম করতে এসেচে।' "

শ্রীশ্রীমার আর এক মন্ত্রশিষ্য শ্রীশচন্দ্র ঘটক বলিয়াছেন: "বহুদিন পরে মঠে গিয়াছি। স্বামী অভেদানন্দ সেইবার আমেরিকা হইতে ফিরিয়াছেন ও মঠে আছেন। পরিচিত প্রাচীন সাধুরা কেহই না থাকায় প্রাণটা যেন খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। শরৎ মহারাজ মঠে আসিবেন শুনিয়া আনন্দ বোধ হইল। কিন্তু তিনি আসিয়াই দুইঘণ্টা

---

২ ডাক্তার কাঞ্জিলাল নিজের সঞ্চিত সমুদয় অর্থই বেলুড় মঠকে দিয়া গিয়াছিলেন। সেই অর্থের উপস্বত্ব হইতে তাঁহার স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া দিবার একটি সর্ত ছিল। মঠের ট্রাষ্টীদের সভায় আলোচনা করিয়া শরৎ মহারাজ সেই মাসিক বরাদ্দ বাড়াইয়া ৪০৲ টাকা করিয়া দেন।

অভেদানন্দ মহারাজের সঙ্গে একান্ত আলাপে নিযুক্ত রহিলেন। উদাস মনে সময় কাটিতেছে। শরৎ মহারাজ নীচে নামিয়া আসিলে সকলের সঙ্গে আমিও প্রণাম করিলাম, কিন্তু কোনও কথা হইল না। তিনি মঠবাড়ীর পশ্চিম দিকের বারান্দায় বসিয়াছেন, চারিদিকে সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তেরা ঘেরিয়া রহিয়াছেন, অদূরে আমিও দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া। হঠাৎ তিনি আমার দিকে চাহিয়া হস্তসঙ্কেতে আহ্বান করিলেন, এবং আমি নিকটে যাইতেই খপ্ করিয়া ধরিয়া টানিয়া কোলে বসাইলেন। আমার ভার বহিতে তিনি কষ্ট পাইবেন মনে করিয়া যতই উঠিতে চেষ্টা করিলাম ততই তিনি ধরিয়া বসাইলেন, অগত্যা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিলাম। আমেরিকা হইতে প্রকাশিত একখানি ছবির এলবাম টেবিলে ছিল ; ছবিগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবের অভিব্যঞ্জক। ঐ ছবির বই খুলিয়া যেমন ছোট ছেলেকে শিখায় সেইভাবে প্রশ্ন করিয়া করিয়া তিনি নিজেই উত্তর দিতে লাগিলেন। আমি কোন উত্তরই দিই নাই। আমার তখন চোখে জল, গলা ধরা।

"আরও দুইএক দিনের ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। মঠে দুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীমা আছেন পাশের বাগানবাড়ীতে। রাত্রে ঈশানকোণের ঘরে বাবুরাম মহারাজ সহ ধূমকীর্তন চলিয়াছে—'আমায় দে মা পাগল করে।' হঠাৎ বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, 'যা, শরৎ মহারাজকে নিয়ে আয়।' শরৎ মহারাজ কহিলেন, 'আমার ওসব হবে না। মুটিয়ে গেচি, নাচতে পারব না। বাবুরাম পাগল।' বাবুরাম মহারাজ সেকথা শুনিয়া বলিলেন, 'তোরা না বাঙ্গাল? যা না, ধরে নিয়ে আয়। নয়তো কোলাপাজা করে নিয়ে আয়।' শরৎ মহারাজকে বলিলাম, 'চলুন, নয়তো কোলাপাজা করে নিয়ে যাব।' তখন ঐ গম্ভীরপ্রকৃতি মানুষটির প্রতি একটুও ভয় ছিল না। 'নিতে পারবি?' বলিয়া

আমাদের টানাটানিতে তিনি উঠিয়া চলিলেন, কিন্তু তিনি আসিবার পর গান আর তেমন জমিল না।

"মায়ের বাড়ীতে নীচের ঘরে বসিয়া শরৎ মহারাজ লীলাপ্রসঙ্গ লিখিতেছিলেন, শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই বলিলেন, 'মাকে প্রণাম করে আসচ, আবার আমাকে এত বড় একটা প্রণাম কেন? আমার কি বৈশিষ্ট্য আছে?' আমি বলিলাম, 'আপনার নামটি বড় সুন্দর।' তিনি ইহাতে প্রসন্ন হইলেন মনে হইল।"

শরৎ মহারাজ অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতি লোক ছিলেন বলিয়া আজও অনেকের মনে একটা ধারণা আছে। এই ধারণা সর্বাংশে সত্য নহে। রসিকশেখর শ্রীরামকৃষ্ণের অপরাপর তনয়গণের ন্যায় তিনিও রঙ্গপ্রিয় ছিলেন। একএক সময়ে তাঁহাকে বালকের সঙ্গে বালক হইয়া খেলা করিতে ও হাসিতে ফাটিয়া পড়িতে দেখা যাইত। বালকদের সঙ্গে তিনি শব্দরচনা-প্রতিযোগিতা (word-making, word-taking) খেলিতেন, ক্যারামবোর্ড খেলিতেন। কাশীতে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময় নিজের অপেক্ষা দ্বিগুণ মোটা একটি লোককে দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, 'তোরা না আমাকে মোটা বলিস, ঐ এক নমুনা দেখ্।' মায়ের বাড়ীতে একসময়ে নৃসিংহবাবু-প্রদর্শিত ব্যঙ্গকৌতুক দেখিয়া হাসিয়া কুটিকুটি হইতেন; অপরাহ্নে নৃসিংহবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেই বালকের ন্যায় বলিয়া বসিতেন, 'একটু হোক।' একদিন স্বামী পূর্ণানন্দের মুখে 'কই, কিছুই তো হল না!' এই আক্ষেপসূচক কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'কি হবে বাবা, চতুর্ভুজ হবে নাকি? তা হলে শোবে কি করে!'

ঘনিষ্ঠ পরিজনেরা, বা সর্বদা যাঁহারা তাঁহার কাছে থাকিতেন তাঁহারা তাঁহাকে অতি সহজ মানুষ বলিয়াই জানিতেন এবং তাঁহার

মাতৃবৎ স্নেহকোমল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া উহার সুবিধা গ্রহণ করিতেও ছাড়িতেন না। তাঁহার এক শিষ্য লিখিয়াছেন: কাশীতে তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতেছি। দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে ফিরিবার সময় চীনাবাদাম ভাজিতেছে দেখিয়া বলিলেন, 'চীনাবাদাম খাবে? চীনাবাদাম ভাল জিনিষ, কেনো না।' আমি চীনাবাদাম লইলাম। তিনি তখন একহাত আমার কাঁধের উপর রাখিয়া অন্যহাতে আমার কাপড়ের কোঁচড় হইতে বাদাম তুলিয়া খাইতে লাগিলেন। সেই হইতে তিনি আমার বন্ধুর মত হইয়া গেলেন। তাঁহার বিশাল গাম্ভীর্য অতঃপর আমাকে পূর্ববৎ ভীতত্রস্ত করে নাই। ঐ সময় হইতে এমন সব আলাপ করিয়াছি যাহা একমাত্র বন্ধুর সঙ্গেই সম্ভব হয়।

* * *

যৌবনারম্ভে শরৎ মহারাজ গুরুভ্রাতৃগণের হাতের কাজ ছিনাইয়া লইয়া করিতেন। পরবর্তী কালে কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী নির্মিত হওয়ার পূর্বে যখন তিনি বলরাম-ভবনে থাকিতেন তখন ঘর ঝাঁট দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের যাবতীয় কাজ তো করিতেনই, অধিকন্তু শিষ্যস্থানীয় সহকর্মী ব্যক্তির পরিত্যক্ত কাপড়খানিও ধুইয়া শুকাইয়া তুলিয়া রাখিতেন। পরিণত বয়সেও সকালে গঙ্গায় বা বাড়ীতে স্নান করিয়া এবং বিকালে বাড়ীতে গা ধুইয়া নিজের কাপড়-গামছা নিজেই কাচিতেন। মধ্যাহ্নে এক পংক্তিতে বসিয়া সকলের সঙ্গে একই আহার্য গ্রহণ করিতেন। বেলুড় মঠে একবার দেখিয়াছি, তাঁহার পাতের কাছে কিছু ফলমিষ্টি-প্রসাদ রাখা হইয়াছে; প্রসাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি উহা হইতে কণিকামাত্র গ্রহণ করিলেন, বাকি সমস্তই যেমন ছিল তেমনই পড়িয়া রহিল—কারণ, তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে উহা সকলের পাতে পরিবেষিত হয় নাই। যখন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ মঠ পরিচালনা করিতেন তখন শরৎ মহারাজ

কার্যানুরোধে মঠে আসিলেই তাঁহাকে মাছ-ভাত খাওয়াইতে চাহিতেন। অবশ্য আমিষাহারী সকলের জন্যই সেইদিন মাছের বন্দোবস্ত থাকিত। তথাপি দেখা গিয়াছে, নিজের বাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে মাছ দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া শরৎ মহারাজ উহা হইতে কিছুটা তুলিয়া লইয়া অলক্ষিতে বাবুরাম মহারাজের পাতে রাখিয়া দিতেন। একবার একটি মাছের মুড়ার কিঞ্চিন্মাত্র নিজে খাইয়াই মুড়াটি বাবুরাম মহারাজের পাতে ফেলিয়া দিয়া প্রীতির আধার গুরুভ্রাতাকে রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'খাও বাবুরামদা, ঠাকুরের প্রসাদ, খেলে বৈষ্ণববংশ উদ্ধার হবে।' 'তুমি ভাই, ভালবাস তাই অমন কর, কিন্তু আমি যে মাছ বেশী খেতে পারি না!'—এই বলিয়া বাবুরাম মহারাজও মুড়ার কিয়দংশমাত্র নিজে গ্রহণ করিয়া উহা অপর কাহারও পাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন।

স্বামী ধীরানন্দ নিজে মাছ খাইতেন না এবং নূতন সাধুদের মাছ খাওয়াও পছন্দ করিতেন না। একবার শ্রীশ্রীমার উৎসবে তাঁহার ভয়ে অনেকে মাছ খাইতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'ভয় কি, এই আমি দাঁড়িয়ে আছি, তোরা খা।' তিনি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সকলকে তৃপ্তিপুর্বক আহার করাইলেন।

স্বামী বাসুদেবানন্দ লিখিয়াছেন: একবার আমি ও বলাই (স্বামী গোবিন্দানন্দ) উদ্বোধনে কিছুদিনের জন্যে থাকি। আমি ঠাকুরপুজো করি, বলাই হাটবাজার রান্নাবান্না দেখে।...তখন মা-ঠাকরুণ উদ্বোধনে। আমি একাদশী করি, গোলাপ-মার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েচে, তাই শ্রীশ্রীমা নিজেই নানান রকম ফলটল আমার জন্যে রেখে দেন। বলাই দেখাদেখি একাদশী আরম্ভ করলে, কিন্তু সেইদিনই গোলাপ-মা সেরে উঠে কাজ আরম্ভ করলেন, কাজে কাজেই দ্বিপ্রহরের ব্যবস্থা খুব সামান্য রকমেরই হল। সন্ধ্যায় বলাইয়ের খুব ক্ষিধে,

গোপীনাথ ঠাকুরকে খুব শাসাতে লাগল, 'তুমি রোজই বড় দেরী কর আমি কিছু বলি না বলে।' শরৎ মহারাজ দূর থেকে শুনে বল্লেন, 'কিরে, বলাই কি বলে?' আমি হাসতে হাসতে সব বল্লুম। শুনে বল্লেন, 'বেশী চেঁচাতে মানা কর, গোলাপ-মা শুনলে এক্ষুণি দেখিয়ে দেবে। কিছু কিনে খেতে বল না।'

মাতৃজাতির উপর তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পরিচয় পদে পদে পাওয়া যাইত। মায়ের বাড়ীতে কোন উৎসব উপলক্ষে সমাগত স্ত্রীলোকদের আহার শেষ না হইলে নিজে আহার করিতে বসিতেন না। তাঁহার নিজের শরীর সুস্থ নয়, বেলাও বাড়িয়া যাইতেছে, সে কথা কেহ স্মরণ করাইয়া দিলে বলিতেন, 'তুই বাঁদর (তাঁহার আদরের তিরস্কার) আর কি! দেখচিস নি এখনো মেয়েদের খাওয়া হয় নি?' নিজব্যয়ে মিষ্টান্নাদি আনাইয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেন। বলিতেন, 'ওরা পতিপুত্রদের খাইয়ে নিজেরা ভাল করে খেতে পায় না। ওদের বেশ করে খেতে দে।' প্রতিবৎসর অম্বুবাচীর সময়ে তিনদিন তিনি বিধবাদের প্রসাদান্ন ভোজনের ব্যবস্থা করিতেন, বিশেষতঃ ঐ সময়ে তাঁহাদিগকে প্রচুরপরিমাণে লেংড়া আম খাওয়াইতেন।

অসুস্থ স্বামিজীর সেবাপ্রয়োজনে শরৎ মহারাজ এক সময়ে শিমুলতলায় ছিলেন। তথায় দরিদ্র সাঁওতালদের অন্নাভাব দর্শনে অতিমাত্রায় বিচলিত হন, এবং নিজের আহার্য অন্নগুলি তাহাদিগকে বিলাইয়া দিয়া স্বয়ং ভাতের ফেন খাইতে আরম্ভ করেন। মাসাধিক কাল এইরূপে তিনি ভাত না খাইয়া ভাতের ফেনমাত্র আহার করিয়াছিলেন।[৩]

* * *

৩ 'দারিদ্র্য ও অর্থাগম' শীর্ষক প্রবন্ধে শিমুলতলার সাঁওতালদের কথা উল্লিখিত আছে। বণিগ্‌বৃত্ত বৈদেশিক রাজের অতিমাত্রায় শোষণই যে ভারতবাসীর আর্থিক দুর্গতির মুখ্য কারণ তাহা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহারে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন:

রেলগাড়ীতে চলিবার সময় শরৎ মহারাজ সকলের সঙ্গে সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতেন। ভীড়ের জন্য তৃতীয় শ্রেণীতে চলা বিশেষ কষ্টকর হইবে বুঝিলে বড় জোর মধ্যম শ্রেণীর টিকেট কিনিতেন। ১৯২১ অব্দে শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজ যখন সদলে কাশী যাইতেছিলেন তখন স্বামী শর্বানন্দ শরৎ মহারাজকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'On principle (নীতিগতভাবে) আমি মধ্যম শ্রেণীতে যাতায়াত করে থাকি।'

একবার ইটালি শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ে আমন্ত্রিত হইয়া তিনি মধ্যাহ্ন সময়ে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে তথায় উপস্থিত হন। কেহ কেহ ইহাতে ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিল, 'বাগবাজার থেকে এতটা পথ একখানা থার্ডক্লাশ গাড়ীতে এলেন, ট্যাক্সি করে এলেন না কেন?' শরৎ মহারাজ কহিলেন, 'মওলালি পর্যন্ত ট্রামে এসেচি। সেখানে এই গাড়ীখানা নিতে হল, চলতে কষ্ট হয়। নইলে তোমাদের এত বাজে খরচ করানো উচিত নয়, তোমাদের পয়সা কত কষ্টের।'

শরৎ মহারাজ পায়ের অসুখে বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া উদ্বোধনের কার্যাধ্যক্ষ গণেন্দ্রনাথ তাঁহাকে একজোড়া মূল্যবান মোলায়েম জুতা কিনিয়া দেন। উহা দেখিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, 'তুমি এ জুতা ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমি এত টাকা দিতে পারব না।' গণেন্দ্র-

---

"প্রজাতেই যে অনন্ত শক্তি বর্তমান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই প্রজাশক্তি যে জাগরিত হইলে অনন্ত বিঘ্নবাধা অতিক্রমে সমর্থ এবিষয়েও জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। অতএব সমগ্র প্রজার এককালীন উদ্যমে যে ভারতে দারিদ্র্যবিস্তার রোধ হইতে পারে, এ আর কি বড় কথা? প্রজার শক্তি প্রজা না জানাতেই ভারতের এই দুর্দশা। উদ্বোধন! সেই কুসুম অপেক্ষা কোমল এবং বজ্র হইতেও কঠোর অনেকবাহূদরবক্ত্র-নেত্রাবস্থিত বিরাট প্রজাশক্তির উদ্বোধনে বদ্ধপরিকর হও।"

নাথ যখন জানাইলেন যে টাকাটা তিনি ক্রমে ক্রমে শোধ করিতে পারিবেন তখন যেন আশ্বস্ত হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন এবং কিছুদিনে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিয়াও দিলেন।

তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্বতই মনে হয় তাঁহার প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই যেন সকলের জন্য ও সকলকে লইয়া। প্রত্যেক শুভকর কাজেই তাঁহার উৎসাহ ও অন্তরের যোগ পরিলক্ষিত হইত। আমন্ত্রিত হইয়া তিনি তপোবল, শঙ্করাচার্য, রামানুজ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন এবং যাহারা যাইতে ইচ্ছা করিয়াছে তাহাদিগকেও সঙ্গে লইয়াছেন। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে উদ্ভিদ-জীবন সম্বন্ধে গবেষণামূলক বক্তৃতা শুনিতে শিক্ষিত ছেলেদের সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন এবং শুনিবার পরেই 'জীবন ও মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক বার্তা' লিখিয়া অজ্ঞ পাঠকসাধারণকে উহার সহিত পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রমনোবৃত্তি ও সাহিত্যরসবোধ আজীবন অব্যাহত ছিল; বিখ্যাত লেখকগণের গ্রন্থাবলী হাতের কাছে পাইলেই অবসরসময়ে পড়িয়া লইতেন। পণ্ডিত ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বরচিত কোন কোন নাটকের পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। কেহ বক্তৃতা শুনিয়া বা থিয়েটার বায়োস্কপ দেখিয়া শুনিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কিরে, কেমন লাগল, কি বল্লে?' তখন বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার তাঁহাকে বলিতে হইত।

য়ুরোপের উপ্‌শালা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করিয়া দেশে প্রত্যাগত ডাঃ বিধুভূষণ রায়কে উদ্বোধনের বৈঠকখানা ঘরে বলিয়াছিলেন, 'সোজা ভাষায়, তুমি যে বিষয়টা গবেষণা করে এলে সেটা আমাদের বুঝিয়ে দাও তো।'

ক্লাশ করিয়া তিনি স্বামিজীর গ্রন্থাবলী ও গীতাদি শাস্ত্র বহুস্থানে

বহুবার তো পড়াইয়াছেনই, ব্যক্তিগতভাবেও নিজের পার্শ্বচর অনেক ব্রহ্মচারীকে গীতা পড়াইয়াছেন। স্বামী শুদ্ধানন্দকে দিয়া সভাষ্য উপনিষদ পাঠ করাইয়া শুনিয়াছিলেন। প্রথমদিকে মঠের অনেক ছেলেকে তিনি পুজাবিধি শিখাইয়াছেন এবং সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষার পঠন-রীতি শিক্ষা দিয়াছেন। আজন্ম হিন্দী বলিতে অভ্যস্ত গুপ্ত মহারাজকে বাঙ্গলা ভাষা শিখাইয়াছিলেন। এক সময়ে প্রত্যেক শনিবার কলিকাতা হইতে মঠে যাইয়া সন্ধ্যার পর গানবাজনার ক্লাশ করিতেন, কাজের চাপে পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। মায়ের বাড়ীতে কিন্তু গান শিখানো অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল, এবং ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও কোন কোন সাধু সেই সময়ে তাঁহার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। পুরীতে শিষ্যস্থানীয় সন্ন্যাসীদিগকে স্বামিজীর প্রিয় সঙ্গীতগুলি তাঁহারই কায়দায় গাহিতে শিখাইয়া দেন।

স্বামিজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'শরৎ, সবাইকে দেখবি, তবে সম্প্রদায় পুষ্ট হবে।' প্রতিপদে সে আদেশ তিনি প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। শ্রদ্ধাপুর্ণ প্রীতির লেখনী ধারণ করিয়া তিনি শিষ্যস্থানীয়দেরও জীবনকাহিনী লিখিয়াছেন দেখিতে পাই। 'স্বামী স্বরূপানন্দ' ও 'স্বামী বিমলানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় পড়িয়া, ঐ দুই প্রেমিক সন্ন্যাসীর গুণাবলীতে আমরা যেমন মুগ্ধ হই, লেখকের গুণগ্রাহিতা আমাদিগকে ততোধিক মুগ্ধ করে। প্রজ্ঞানন্দ-প্রণীত 'ভারতের সাধনা' গ্রন্থের ভূমিকা এবং নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পরিচালিকা শ্রীমতী সুধীরা সম্বন্ধে লিখিত 'ব্রতধারিণীর মহাসমাধি' সমভাবেই তাঁহার অশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের জনৈক বন্ধু [৪] এক সময়ে কলিকাতায় থাকিয়া চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করিত। ঐ সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে যাইয়া সে

---

৪ ৺কুমুদকুমার চন্দ।

মাতাঠাকুরাণীর দর্শনাদি পায় এবং সরলতা ও সহৃদয়তা-গুণে সাধুদের প্রীতি অর্জন করে। একটি ছেলেকে সে ভালবাসিত। একদিন সে শরৎ মহারাজকে ধরিয়া বসিল, ঐ ছেলেটি যাহাতে অসৎসঙ্গে না মিশে ও ঈশ্বরের পথে যায় তজ্জন্য দুইএকটি কথা তাঁহাকে লিখিয়া দিতে হইবে। আন্তরিকতা ও বিশ্বাস দেখিয়া মহারাজ প্রসন্ন হইলেন এবং নিজের অদৃষ্ট অপরিচিত বালকটিকে সম্বোধন করিয়া কতিপয় সদুপদেশ লিখিয়া দিলেন।

সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও স্তবপাঠ হইয়া যাওয়ার পর শরৎ মহারাজ নীচে নামিয়া আসিয়া ছোট বৈঠকখানা ঘরটি আলো করিয়া-বসিতেন। ঐ সময়ে সান্যাল মহাশয়, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং আরও অনেকে আসিতেন। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও আলোচিত হইত। অনেকে এই সময়টিতেই প্রশ্ন করিয়া সাধনাদি-বিষয়ক নিজের জ্ঞাতব্যসমূহ জানিয়া লইতেন। স্বামী পূর্ণানন্দ নিষ্ঠাসহকারে সাধন-ভজন ও স্বাধ্যায় লইয়া থাকিতেন, সাধারণতঃ তিনিই অধিকাংশ প্রশ্ন করিতেন। বহুক্ষণ ধরিয়া পূর্ণানন্দের বহু প্রশ্নের উত্তর দিবার পরেও শরৎ মহারাজ সানন্দে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কি পূর্ণানন্দ, আর কিছু প্রশ্ন করবে নাকি?' একদিন পূর্ণানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, কি করলে আসনসিদ্ধ হওয়া যায়?' অমনি তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'যা করে তুমি আসনসিদ্ধ হয়েচ!' পূর্ণানন্দ ও অপর শ্রোতারা একথায় হাসিয়া উঠিলেন। মহারাজ তখন স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, 'ঘর থেকে বেরুবে না, দিনরাত বসে থেকে একটা অসুখ বিসুখ না করে বস।'

এই আসরে একএক দিন এমন হইত যে, সকলেই বক্তৃতা করিয়া যাইতেছে আর একমাত্র শরৎ মহারাজই যেন শ্রোতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। জনৈক ভদ্রলোক একদিন স্বামী পূর্ণানন্দের সঙ্গে বাগ্-

বিতণ্ডা আরম্ভ করিয়া দিলেন; মহারাজ তখন নির্বাক, নিস্পন্দ—চক্ষু নিমীলিত করিয়া ধ্যানমগ্ন। "একই স্থানে নৃত্যময়ী চঞ্চলা প্রকৃতির অভিনয় এবং শান্ত সমাহিত সাধুর পরমাত্মযোগ।" [প্র]

এই ঘটনার বহু পূর্বেকার কথা। একদিন আপিস ঘরে বসিয়া কতকগুলি যুবক উচ্চহাস্য ও ফষ্টিনাষ্টি করিতেছিল। এমন সময় গোলাপ-মা তথায় আসিলেন ও একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'তোমাদের ধন্যি আক্কেল। উপরে মা রয়েচেন, নীচে শরৎ রয়েচে, আর তোমরা এমন হৈচৈ করচ?' শরৎ মহারাজ তাহা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, 'তুমিও বেশ তো গোলাপ-মা। ছেলেরা অমন হৈচৈ করে, তাই বলে কি তাতে কান দিতে আছে? আমি তো পাশেই আছি, আমি কিছুতেই কান দি না, কিছু শুনতেও পাই না। কানটাকে বুঝিয়ে দিয়েচি, তুই তোর প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া শুনিস না।' [প্র]

কেহ কখনও শরৎ মহারাজকে গ্রাম্যকথা উচ্চারণ করিতে শুনে নাই। অমঙ্গলসূচক কোন কথাও কদাচ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইত না। স্বামী পূর্ণানন্দ একদিন একটি ছেলেকে 'পতিত, পতিত' বলিয়া ডাকিতেছেন শুনিতে পাইয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, 'কি পতিত পতিত বলচ? ও যে পতিতপাবন।' কাশীতে জনৈক নূতন সাধু তাঁহার আহারের জন্য ঠাঁকুরের প্রসাদ লইয়া গিয়াছে, ভাত উঠাইয়া পাতে রাখিবার সময় একটু ছড়াইয়া পড়িল। তিনি হাসিয়া কহিলেন, 'ভোলানাথ কায়দা জানে, ও জানে না।' পার্শ্বোপবিষ্ট সান্যাল মহাশয় কহিলেন, 'এমন অপদার্থ তবে এলে কেন?' সেকথায় শরৎ মহারাজ ব্যথিত হইলেন ও স্বীয় গুরুভ্রাতাকে ধমকাইয়া বলিলেন, 'অপদার্থ বলচ কেন? ও একেবারে অপদার্থ নয়।' [প্র]

যেকেহ একবার তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছে সে চিরকালের জন্যই তাহা পাইয়াছে। যেকেহ একবার তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়াছে,

শত অপরাধেও তাহাকে তিনি বর্জন করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে শিষ্যাশিষ্য বা আত্মীয়-অনাত্মীয়ের বিচার ছিল না। দীর্ঘকাল তাঁহার ও শ্রীশ্রীমার আশ্রয়ে থাকিয়া বর্ধিত হইয়াছে এমন এক ব্যক্তি মূঢ়তা-বশতঃ অকারণে তাঁহারই নিন্দাবাদে মুখর হইয়া উঠে। ঐ ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া দিতে স্বয়ং সঙ্ঘগুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াও তিনি তাহা করিতে পারিলেন না। পরে স্বীয় কর্মদোষে, দক্ষিণেশ্বর হইতে হৃদয় মুখুজ্যের চিরবিদায়ের মত, সেই লোক যখন মঠ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল এবং সন্ন্যাসীর গৈরিকবাস ছাড়িয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল, তখন শরৎ মহারাজই তজ্জন্য মর্মবেদনা ভোগ করিয়াছেন সর্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহারই কাছে থাকিয়া মানুষ হইয়াছে, এবং দীর্ঘকাল তাঁহার হইয়া অনেক কাজও করিয়াছে, এমন এক ব্যক্তি যখন পরে স্বৈর আচরণে প্রবৃত্ত হইল, এবং কথায় ও কাজে মাঝে মাঝে তাঁহাকে মনঃপীড়া দিয়া চলিল, স্বয়ং আশ্রয়দাতা হইয়া উহাকে তিনি বর্জন করিতে পারিলেন না; তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং স্বয়ং শেষ পর্যন্ত তাহার কল্যাণের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইয়া অপরকেও প্রার্থনা জানাইতে বলিয়া গেলেন। অপরাধবশতঃ কাহাকেও সঙ্ঘ হইতে সরাইয়া দিবার প্রস্তাব তাঁহার নিকট উত্থাপিত হইলে তিনি অনেক সময়েই তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন, কখনও বা সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়াছেন, 'জুড়াতে এসেচে, কোথায় যাবে। ভাল হবার জন্যেই এসেচে, ভাল হবার চেষ্টাও তো করচে—থাকুক না।'

আমরা দেখিয়াছি—এবং দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি—যে, সাধুজনোচিত জীবনযাপনে অক্ষম হইয়াছে এমন আদর্শভ্রষ্ট ব্যক্তিও শরৎ মহারাজের উপর গভীর বিশ্বাস রাখে। তিনি যে কখনও তাহাকে অবজ্ঞা বা বর্জন করিতে পারেন তাহা যেন সে ভাবিতেও পারে না। নিষ্কাম

মহাপুরুষের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত বেগবতী মঙ্গলেচ্ছাই যে ঐরূপ বিশ্বাসের জনয়িত্রী একথা আর বলিতে হইবে না।

নৈতিক দৃষ্টিতে অতি দূষণীয় কার্য করিয়া একটি যুবক সকলের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছে, এবং নিজের নির্দিষ্ট কার্যভার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে স্থির করিয়াছে। বিষাদখিন্ন মনে যখন সে শরৎ মহারাজের কাছে নিজের লাঞ্ছনা ও সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করিল, তিনি ঈষৎ হাসিয়া শুধু কহিলেন, 'আমি কি তোকে কিছু বলেচি?' অতি ছোট একটি কথা, কিন্তু যুবকের সকল ব্যথা তাহাতেই জুড়াইয়া গেল, সে পূর্ববৎ কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

তাঁহার শিষ্য আর একটি যুবক ঐরূপ গর্হিত কাজ করিয়া অনুতপ্ত-চিত্তে গুরুর কাছে সেকথা ব্যক্ত করিলে তিনি সমবেদনার সুরে বলিয়াছিলেন, 'আমরা সকলেই বড়ই দুর্বল। মা যদি দয়া না করেন; ঠাকুর যদি দয়া না করেন, আমরা কি ভাল হতে পারি? তুই ডাক্ তাঁকে; আমিও তোর জন্যে জানাব।'

শ্রীশ্রীমার জনৈক শিষ্যা[৫] শরৎ মহারাজকে পিতৃসম্বোধন করিতেন। একবার কাশীধামে পূজনীয় হরি মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার বাবার কথা শুনবে? আমরা যাদের ত্যাগ করি, তিনি তাদের হাত ধরে তুলে নেন।' [প্র]

অপরাধ দুর্বল মানুষ তো করিবেই। কিন্তু অন্যায় করিয়া যে অনুতপ্ত, কিংবা অন্যায় কার্য পরিত্যাগ করিবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে এমন অকপট ব্যক্তিকে আত্মরক্ষায় কিছুমাত্র সাহায্য না করিয়া শুধু শাসন করা নিষ্ঠুরতামাত্র। সেইজন্য 'কেন এমন করিলে?' —এইরূপ প্রশ্ন না করিয়া, যাহাতে ভবিষ্যৎ অকল্যাণ রুদ্ধ হয় তাহার জন্য চেষ্টিত হইতে আমরা শরৎ মহারাজকে দেখিয়াছি। তবে ব্যক্তি-

---

৫ ৺কৈলাসকামিনী রায়

বিশেষে তাঁহার সংশোধনের প্রণালী স্বতন্ত্র ছিল। কাহাকেও মৃদু তিরস্কারে বা উপদেশ-দানে, কাহাকেও অপরের দৃষ্টান্তে—দেখিয়া, কাহাকেও বা অবাঞ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া—ঠেকিয়া, আত্মশোধনের সুযোগ করিয়া দিতেন। কারণ, প্রকৃতিগত সংস্কার বিভিন্ন বলিয়া সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা একরূপ কখনও হইতে পারে না।

আমাদের জানা আছে, একবার একটি যুবক তাঁহার নিকট ধমক খাইয়া এমনই মোহিত হইয়াছিল যে, আর একটিবার ধমক খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রাণে জাগিয়াছিল। অথচ, যুবকটির স্বভাব এমন যে, কাহারও মুখের কড়া কথা সে নির্বিবাদে সহ্য করিতে জানিত না। মায়ের হাতের বা মুখের শাসনে শিশু তাঁহার স্নেহময়ী কল্যাণমূর্তি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পায় কি? অথবা বুদ্ধির অপূর্ণতাবশতঃ সেই মূর্তি তখন দেখিতে না পাইলেও, মায়ের উপরে তাহার বিরক্তি বা ক্রোধের উদয় হয় কি?

শরৎ মহারাজ অনেক সময়েই চুপচাপ বসিয়া থাকেন দেখিয়া তাঁহার আজীবন সাথী গুরুভ্রাতা বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল একদা উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ক্ষুদ্র প্রাণে আর কত সইব? এ পর্যন্ত যাদের সঙ্গে পরিচয় তাদের ভাবনাতেই অস্থির, নূতন আলাপে আর কত দুঃখ বাড়াব?'

নির্মম ব্যবহার জীবনে কখনও না করিলেও নিজে তিনি উহা যথেষ্টপরিমাণে পাইয়াছিলেন, অহেতু নিষ্ঠুর নিন্দাবাদও কখন কখন তাঁহাকে শুনিতে হইয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, আঘাতকারীর সঙ্গে পূর্ববৎ সপ্রেম ব্যবহার করিতে কখনও তিনি বিরত হন নাই। কোন ঘটনায় তাঁহার আশ্রয়প্রাপ্ত জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মহারাজ, যে কাজে আজ আপনি গিয়েছিলেন, তার জন্যে কি আপনি অপমানিত হয়েচেন?' প্রশান্তভাবে তিনি

উত্তর দিলেন, 'আমাকে অপমান! আমাকে কি কেউ অপমান করতে পারে? আমার মনবুদ্ধি যদি অপমান না নেয়, তবে আমার অপমান কিরূপে হবে? আমি আমার মনবুদ্ধি চিরকালের জন্যে ঠাকুরের, মার পাদপদ্মে দান করেচি, তাতে মান-অপমান ভালমন্দ কিছুরই স্থান নাই। তোমরা ব্যস্ত হয়ো না।' [প্র]

জনৈক বয়স্ক ব্যক্তি তাঁহার স্নানের পূর্বে তেল মাখিবার সময় তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া নানাজনের নিন্দাবাদ করিতেন। কারণ, অন্য সময় তাঁহাকে নিরালায় পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ক্রমাগত দুইদিন ঐরূপ হইলে তিনি নিন্দাবাদ শ্রবণের ভয়ে, এবং বক্তাকে বাধা দিলে পাছে তিনি অপমানিত বোধ করেন সেইজন্য ক্রমাগত সপ্তাহকাল পাইখানার ভিতর লুকাইয়া তেল মাখিয়াছিলেন। [প্র]

যৌবনে নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া শরৎ মহারাজ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণের সেবা করিতেন। বার্ধক্যে সেবা করিতে না পারিলেও, ঐরূপ রোগীর সান্নিধ্যে আসিয়া তাহার দুঃখ লাঘব করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। একদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পরে সামান্য বিশ্রাম করিয়াই, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বাহিরে যাইবার জন্য নামিয়া আসিলেন। জনৈক সেবক[৬] উহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। রাস্তায় মোড় ফিরিবার সময় একবার পশ্চাতে তাকাইয়া তিনি সেবককে দেখিয়াই বলিলেন, 'ফিরে যা।' সেবক উত্তর দিলেন, 'গেলামই বা আপনার সঙ্গে।' 'তবে চল' বলিয়া উভয়ে ট্রামে উঠিলেন এবং টেরিটিবাজারের সম্মুখে নামিয়া এজরা ষ্ট্রীটের এক হোটেলে আসিলেন। হোটেলের উপরতলার এক ঘরে খোকানি নামে সিন্ধুদেশবাসী এক যক্ষ্মারোগী ঘন ঘন কাসিতেছিল ও পিকদানিতে কফ ফেলিয়া রুমালে মুখ মুছিতেছিল। মহারাজ সেই ঘরে প্রবেশ

৬ স্বামী অশেষানন্দ।

করিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন ও অন্য আসনের অভাবে তাহারই খাটের উপর বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। অপরিচ্ছন্ন হস্তে কিছু ফল ছাড়াইয়া খোকানি তাঁহার সম্মুখে ধরিল। খাইতে প্রথমতঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও মুমূর্ষুর মিনতি তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; সকল রকম ফল হইতেই কিছু কিছু লইয়া মুখে দিলেন ও পূর্ববৎ আশীর্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। 'আপনি ঐ ফল কেন খেতে গেলেন?'—চিন্তাক্লিষ্ট সেবকের এই প্রশ্নে খানিক চুপ থাকিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'খোকানি যাতে মনে কষ্ট না পায় তার জন্যে খেয়েচি। জান, ঠাকুর বলতেন, ভালবেসে কেউ কিছু খেতে দিলে তাতে অনিষ্ট হয় না।'

এমন দরদী দেবতা, এমন ক্ষমা ও কল্যাণের মূর্তি, মানব, তুমি কয়টি প্রত্যক্ষ করিয়াছ জানি না। আমরা কিন্তু ঋষিকৃষ্ণের যোগ্য অনুচর এই পুরুষপ্রবরকে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয়দেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদামাতার করুণার কিঞ্চিৎ আভাষ পাইয়াছি, আর সেইজন্য, দুষ্কৃতির আগার, দুঃখভারাক্রান্ত জীবন সত্ত্বেও তাঁহাদের কৃপাকণা হইতে যে বঞ্চিত হইব না এই আশা ও বিশ্বাস প্রাণে দৃঢ় হইয়াছে।

১৬

মিলনের পথে

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বামী সারদানন্দ মায়ের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। অতঃপর মন্দিরের নিত্যসেবার ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থসংস্থান করিতে তিনি মনোযোগী হইলেন, এবং কিছুদিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকা আয়ের ব্যবস্থা করিয়া, মন্দির ও তৎ-সংক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তি বেলুড় মঠের ট্রাষ্টীগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইতোমধ্যে বেলুড় মঠে স্বামিজীর ও শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি-মন্দির দুইটির নির্মাণকার্যও সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। ১৯২৪ অব্দের ২৮শে জানুয়ারী স্বামিজীর এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী মহারাজের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল।[১]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি এই সময় বেলুড় মঠের পশ্চাদ্ভাগে একখণ্ড জমি সংগ্রহ করিয়া কর্মশালা নির্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। মঠের শান্তি ইহাতে বিঘ্নিত হইবে বলিয়া আপত্তি উঠিলেও, কোম্পানি যখন কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে চাহিল না, স্বামী সারদানন্দ তখন বাধ্য হইয়া বঙ্গের লাট-দপ্তরে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে সুফল ফলিল। কোম্পানি উহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

কর্মকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও, এবং সময়ে সময়ে গুরুতর ব্যাপার-সমূহে পরামর্শ দান করিতে হইলেও, শরৎ মহারাজ ক্রমেই যেন

---

১ বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমা, স্বামিজী ও শ্রীমহারাজের মন্দিরত্রয় প্রতিষ্ঠার সময়ে শরৎ মহারাজের ব্যবস্থানুযায়ী পূজক ছিলেন স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ।

আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইতেছিলেন। জপধ্যানের মাত্রা তিনি অনেকদিন পূর্ব হইতেই বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, উহার ফলে দিব্য অনুভূতি-সমূহ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অত্যুদার জীবন অপার্থিব সুষমায় ভরিয়া তুলিতেছিল। স্বীয় অনুভূতির কথা তাঁহার মুখে কখনও শোনা যাইত না; তাঁহার দিনলিপি হইতে জানা যায়, ১৯২৩ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর হইতে পরের বৎসর ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঘনঘন তিনি জগন্মাতার দর্শনাদি লাভ করিতেছিলেন।[২] অথচ এই সমস্ত দর্শন তাঁহাকে সংসারবিমুখ না করিয়া সংসারের তাপে তপ্ত মানবের প্রতি সমধিক সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়াছিল। সমভাবেই তিনি দীক্ষাদি দান করিয়া যাইতেছিলেন। জগদম্বার যোগ্য সন্তান অর্জিত ধন নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে চিরমিলনের পথে চলিয়াছিলেন।

ফাল্গুন মাসের একদিন বৈকালে শরৎ মহারাজ নীচের ঘরে জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। ভদ্রলোকটি কানে কম শুনিতেন বলিয়া কথাগুলি একটু জোরে হইতেছিল। হঠাৎ মহারাজের স্বর সপ্তমে চড়িল, সকলে সবিস্ময়ে শুনিল তিনি বলিতেছেন, 'তোমার টাকায় আমি মুতে দি, লোভ দেখিয়ে আমাকে দিয়ে কাজ করাবে?' আর দেখিতে ও শুনিতে পাইল ভদ্রলোকটি দুই হাতে মহারাজের পা দুইখানি ধরিয়া বলিতেছেন, 'আমি অন্যায় করেচি, আমায় ক্ষমা করুন।' ক্ষমা না চাহিতেই ক্ষমা করিতে যিনি চিরকাল অভ্যস্ত ছিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ জল হইয়া গিয়া চিরমধুর কণ্ঠে অন্য কথা পাড়িলেন।

---

২ প্রথম দর্শনের দিন তিনি দেবেন্দ্রনাথ বসুর পীড়িত পুত্রকে দেখিতে যান। যাইবার পথে চন্দ্রমোহন দত্তের নূতন বাড়ীতে পদার্পণ করেন। ২৫শে জানুয়ারীর দিনলিপিতে লেখা আছে: 7th day special communion, repeating of Darsana. ১০ই ফেব্রুয়ারীর দিনলিপি: Intense C. Touching centre massage, ১৯শের দিনলিপি: C. You in me.

ভদ্রলোকটি চলিয়া যাইবার পর একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে হাসিয়া কহিলেন, 'পাগলা লোক কি বলতে কি বলে ফেলে তার ঠিক নাই। সেদিন আশী হাজার টাকার এক মোকদ্দমায় হেরে মরেচে। মোকদ্দমা করবার সময় আমাকে আশীর্বাদ করতে বলেছিল। সকল কথা শুনে আমি বল্লুম, তুমি মিথ্যা মোকদ্দমা করবে, আর আমি যাব আশীর্বাদ করতে—না? আজ বিলেতে আপীল করবে স্থির করে এসেচে আশীর্বাদ চাইতে। আমি পারব না বলায় পাঁচ হাজার টাকার প্রণামী দেবে বলেছিল।'

ঐ ভদ্রলোকটি পূজনীয় শরৎ মহারাজকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন, জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির নির্মাণে যথেষ্ট অর্থসাহায্যও করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, মহারাজকে দিয়া যাহা খুসী তাহাই তিনি করাইয়া লইতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, আব্দারের মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া না গেলে মহারাজ তাঁহার আশ্রিতগণের এবং যাহারা তাঁহার উপরে বিশ্বাস ও নির্ভর রাখে তাহাদের অনেক রকম উৎপাতই সহ্য করিয়া যাইতেন।

এই বৎসর পাঞ্জাবে সহসা প্লেগ দেখা দিল মহামারীরূপে। চারিজন সাধু সেবাকার্যে সেখানে যাইতে অভিলাষী হইয়া শরৎ মহারাজের অনুমতি লইতে আসিলেন। মহারাজ কহিলেন, 'বুড়ো হয়েচি, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে যেতে বলবার বয়স আমার গত হয়েচে। তোমরা যেতে চাও যাবে, আমি কিন্তু কাউকে যেতে বলতে পারব না।' দিন দুই পরে চৈত্রসংক্রান্তি। সেদিন সেবকেরা যখন প্রণাম করিয়া পাঞ্জাব যাত্রা করিবেন, তিনি প্রত্যেকের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং পুনঃপুনঃ 'দুর্গা দুর্গা' উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদিগকে মা দুর্গার হাতে সঁপিয়া দিলেন।

৪ঠা জুন বুধবার রাত্রি ১০টা ২৫ মিনিট সময়ে, ৭৩ বৎসর বয়সে,

ঠাকুরের স্ত্রীভক্তগণের অন্যতমা পূজনীয়া যোগীন-মা সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা হেতু অধিক চলাফেরা করিতে অসমর্থ হওয়ায় শেষের ছয়সাত বৎসর তিনি শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতেই বাস করিতেছিলেন। অন্তিম সময়ে শিয়রে থাকিয়া শরৎ মহারাজ তাঁহাকে "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"—এই মন্ত্রবাণী শুনাইলেন।

স্বামিজী ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ কঠোরতপস্বিনী যোগীন-মাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার হাতের রান্না খাইতে ভালবাসিতেন। যোগীন-মা তন্ত্রমতে পূর্ণাভিষিক্তা ছিলেন, শরৎ মহারাজের কাছে বৈদিক বিরজাহোমও করিয়াছিলেন; কিন্তু বাহ্যতঃ সন্ন্যাসিনীর বেশ বা গৈরিকবস্ত্রাদি ধারণ করেন নাই। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, মেয়েদের ভিতর যোগীন জ্ঞানী।

শ্রীশ্রীমার প্রধানা সঙ্গিনী যোগীন-মার দেহত্যাগের পর, তাঁহার মুখ্যা সেবিকা গোলাপ-মাও স্বধামে প্রয়াণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পূর্ব হইতে, যেন জানিতে পারিয়াই, স্ত্রীভক্তদিগকে তিনি বলিয়া রাখিয়াছিলেন, 'যোগেন যাবে শুক্লপক্ষে আর আমি যাব কৃষ্ণপক্ষে।'

শরৎ মহারাজের শরীরও ভাল যাইতেছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনরূপ মহাযন্ত্র এতদিনে অনেকটা স্বয়ংক্রিয় হইয়াছে, সেইজন্য বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তিনি আর কোন বিষয়ে মতামত দিতে চাহিতেন না। কাজ হইতে বাস্তবিক তিনি অবসর গ্রহণ করেন নাই, বরং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজই করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই কাজ চলিয়াছিল বাহ্য জগৎ অপেক্ষা অন্তর্জগতেই সমধিক পরিমাণে—ত্রিতাপ-দগ্ধ নরনারী যেখানে ঘুরিয়া বেড়ায় শান্তি ও অভয়াশ্রয়ের সন্ধানে।

তাঁহার তৎকালীন শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বাঙ্গালোর

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্মলান্দকে লিখিত ১৭ই আগষ্টের এক পত্রে অবগত হওয়া যায়। পত্রের কিয়দংশ এইরূপ :

তুলসী মহারাজ,

শ্রীমান সুধীরকে তুমি যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছ তাহা পড়িয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। শরীর আমার ভাল যাইতেছে না—mild typeএর Beri-Beri (সামান্য বেরিবেরি), পেটের অসুখ ইত্যাদিতে, তাহার উপর গোলাপ-মা heart-এর (হৃদ্‌যন্ত্রের) অসুখে শয্যাগতা, বোধ হয় আর অধিকদিন দেহ থাকিবে না—সেজন্য, উত্তর দিতে বিলম্ব হইল।

…জীবনের অল্পদিনই আমাদের অবশিষ্ট আছে, কয়টা দিনের জন্য এইরূপে ঝগড়া বিবাদ করা একেবারে তিক্ত বোধ হয়। অধিক আর কি লিখিব ভাই,…তুমি একবার এদিকে কিছুদিনের জন্য চলিয়া আইস ইহাই অনুরোধ। আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে। ইতি—

চিরপ্রেমাবদ্ধ
শ্রীসারদানন্দ

স্বামী নির্মলানন্দ কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন যে, শরৎ মহারাজের শরীর ক্রমশই যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কে জানে, তিনিও 'ঘরমুখো' হইয়াছেন কিনা। প্রয়োজনীয় কাজকর্মে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর তুলসী মহারাজ ও অমূল্য মহারাজ তাঁহাকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ভুবনেশ্বর মঠে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের দুইজনকে ও সান্যাল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শরৎ মহারাজ ১৩ই নভেম্বর ভুবনেশ্বর মঠে পৌছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার শরীর চারিদিন বেশ ভালই ছিল, কিন্তু তাহার পরেই অজীর্ণ রোগ দেখা দিল। সেই অজীর্ণ ক্রমে রক্তামাশয়ে পরিণত হইলে তিনি এমিটিন ইন্‌জেক্‌শন

নিতে বাধ্য হইলেন; সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে নভেম্বর মাস কাটিয়া গেল।

গোলাপ-মার অসুখ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে জানিয়া শরৎ মহারাজ ভুবনেশ্বর হইতে ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীশ্রীমার জন্মমহোৎসব এই বৎসর তাঁহার বাড়ীতে না হইয়া নিবেদিতা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইল, এবং ইহার পরদিনই, ১৯শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪টা ৮ মিনিট সময়ে পূজনীয়া গোলাপ-মা নিত্যধামে প্রয়াণ করিলেন।

গোলাপ-মার দেহ শ্মশানে লইয়া গিয়াছে। নীচের ছোট ঘরটিতে শরৎ মহারাজ বসিয়াছিলেন, ডাক্তার বিপিনবাবু আসিতেই বলিলেন, 'The bird has flown away' (পাখী উড়িয়া গিয়াছে)। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, এঁরা কোথায় যান?' মহারাজ কহিলেন, 'কোথায় আর যাবে, ঠাকুরের কাছে গেল।'

গোলাপ-মা জপে সিদ্ধ ও নিরভিমান ছিলেন। ছত্রিশ বৎসর ধরিয়া নরবিগ্রহধারিণী জগন্মাতার সেবা করিয়াছিলেন। সেবানিষ্ঠার ইতিহাসে তিনি অতুলনা।

সিষ্টার খ্রীশ্চিন নিবেদিতা বিদ্যালয় ছাড়িয়া ৮নং বোসপাড়া লেনে বাস করিতেছিলেন। তিনি এই সময় অসুস্থ হইয়া পড়িলে ডাক্তার নীলরতন সরকার চিকিৎসা করিতে থাকেন। জনৈক ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়া শরৎ মহারাজ প্রতিদিন তাঁহার খোঁজ লইতেন ও মাঝে মাঝে তাঁহার জন্য ফলমিষ্টি প্রেরণ করিতেন। বিশেষতঃ নিজের জন্মতিথির দিন তাঁহাকে প্রচুরপরিমাণে ফলমিষ্টি পাঠাইয়াছিলেন।

* * *

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ। ২০শে জানুয়ারী সান্যাল মহাশয় ও দুইএক জন সেবক সাধুকে সঙ্গে লইয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজ ৺কাশীধামে আসেন

এবং শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের সন্নিকটে 'লক্ষ্মীনিবাস' নামক দ্বিতল বাড়ীতে প্রায় আড়াই মাস বাস করেন। সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শুভানন্দ প্রণাম করিতে আসিলে মহারাজ কহিলেন, 'কত কষ্ট করে একএকটি ছেলে তৈরি হয়, আর অযত্নে মারা যায়। এই দেখ না, সেদিন বিদ্যানন্দ দেহ রাখলে। সেবাশ্রমের খাওয়াদাওয়ার দিকে দৃষ্টি রেখো। যে কয়দিন এখানে থাকা হয় ছেলেরা যেন দুবেলা আসতে পারে। সেরূপভাবে কাজকর্মের বন্দোবস্ত কোরো।'

যতদিন মহারাজ কাশীতে ছিলেন, প্রায় প্রত্যহ বেলা ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে ঠাকুর প্রণাম করিতে আশ্রমে আসিতেন এবং দুই আশ্রম ঘুরিয়া বুড়োবাবা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিতেন। একদিন বুড়োবাবা বলিলেন, 'আগে আগে কেমন সব দিন গেচে, ধ্যানভজনে কতই আনন্দ পেয়েচি। শিরদাঁড়ার ভিতর একটা যেন গড়গড় করে মাথা পর্যন্ত উঠত, আর আনন্দে বিভোর হয়ে যেতুম। এখন সেসব যে কোথায় গেল তাই একএক সময় ভাবি।' মহারাজ কহিলেন, 'ওসব যায় না। সময়ে আবার ঠিক আসবে। সব সময় ওরূপ হলে বেশীদিন শরীর থাকে না। কিন্তু যে যতটুকু অনুভূতি করেচে, অন্ততঃ শেষ সময়েও তা পুনরায় আসবে।'

ভক্তরাজের (স্বামী সদাশিবানন্দের) সহিত মহারাজ কথা কহিতেছেন। ভক্তরাজ কহিলেন,—কাল আপনি বলেছিলেন, 'এক ঘণ্টা বসি, তা আধ ঘণ্টা যায় বাজে চিন্তায়; আর আধ ঘণ্টা বসা, তাও সব দিন হয় না। ঠাকুরের যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ হয় দেখচি।' একথা আমি তখন বেশ বুঝতে পারি নি। আজ বেশ বুঝেচি, আমাদের কল্যাণের জন্য আপনাদের সাধনভজন যা কিছু সব। মহারাজ খানিক চুপ থাকিয়া কহিলেন, 'ঠাকুর তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েচেন। এইরূপে কালে সবই বুঝিয়ে দেবেন।'

৺সরস্বতীপূজার দিন সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীমার একখানা পট সরস্বতী-মূর্তির নীচে দেবীঘটের উপর বসাইয়া তাঁহাকেই সরস্বতীরূপে ধ্যান ও আবাহন করিয়া পূজা করা হয়। তাহাতে একজন মন্তব্য করেন, 'মা জগদ্ধাত্রী, তাঁকে নীচে বসালে?' মহারাজ পরে ঐকথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'এঁরা [শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর] সকলের পায়ের নীচে, আবার সকলের মাথায় উপর—এটা বুঝলেই সব হল।'

১১ই ফেব্রুয়ারী সারনাথে চড়ুইভাতি হইবে স্থির হইয়াছে। সেই দিন বেলা প্রায় ১১টার সময় মহারাজ সারনাথে পৌঁছিলেন ও ভগ্ন-কীর্তিগুলি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। উভয় আশ্রম হইতে প্রায় ৬০ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন। স্বামী শান্তানন্দ কহিলেন, 'মা বলেছিলেন, তোমরাই এখানে তপস্যা করেছিলে।' মহারাজ ঐ কথায় সায় দিয়া খানিক পরে বলিলেন, 'এখানে অনেক সাধু তপস্যা করেছিল।'

খাবার জায়গা হইয়াছে। মহারাজ বৃক্ষমূলে বাঁধানো জায়গায় ও অপর সকলে মাঠে বসিয়াছেন। উপুদা (যোগীশ্বরানন্দ) শ্লোক বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলা শেষ হইলে, সকলে মিলিয়া 'নমঃ পার্বতীপতয়ে হর' বলিতেই মহারাজ কহিলেন, 'একি হল, বল—মণিপদ্মে হুঁ।' তিনি নিজে ললিতবিস্তরের শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ও সকলে 'মণিপদ্মে হুঁ' বলিতে লাগিল। শেষে উপুদার আর একটি আবৃত্তির পর স্বামী জগদানন্দ 'নমঃ পার্বতীপতয়ে' বলিবামাত্র মহারাজ হাসিয়া ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেও হাসিয়া উঠিল। তখন জগদানন্দজী কহিলেন, 'এক হিন্দুকে জোর করে মুসলমান করেছিল, তার আল্লা আল্লা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে কালী কালী এসে পড়ত! আমারও গলা পর্যন্ত পার্বতীপতয়ে, আর তার উপর মণিপদ্মে হুঁ।' (সকলের উচ্চহাস্য)।

ভাত সুসিদ্ধ না হওয়ায় মহারাজের খাওয়া তত ভাল হইল না। তিনি সাধারণ খিচুড়িই খাইলেন ও বলিলেন, 'দেখ ছক্কু যেন না জানে ; তরকারী বেশ রেঁধেচে।'

প্রায় পাঁচটায় মহারাজ মোটর গাড়ীতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইল ; সামান্য জ্বর হইয়া ঐ অসুখে চারিপাঁচ দিন ভুগিয়াছিলেন।

এইবারে ঠাকুরের জন্মতিথি-পুজার দিন রাত্রিশেষে আটটি তরুণ যুবক তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করে। তাহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া মহারাজ সঙ্ঘমধ্যে ত্যাগ-বৈরাগ্য ও তপস্যার ভাব উদ্দীপিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ৩

দোলপূর্ণিমার দিন বিকালবেলা মহারাজ সেবাশ্রমে বেড়াইতে আসিয়াছেন। মাঠে বেড়াইয়া, স্বামিজীর মন্দিরের দিকে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া হঠাৎ অদ্বৈতাশ্রমের অভিমুখে চলিলেন। স্বামী নিগমানন্দ বেঞ্চে বসিয়াছিলেন, মহারাজ সম্মুখে আসিতেই দাঁড়াইলেন। মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন আছ?' তার পরেই বলিলেন, 'বেটারা সেখানে প্রণাম করবার জন্যে ছুটোছুটি করে ; এখানে এসেচি, প্রণাম করচে না। প্রণাম কর।' এমন মধুরস্বরে 'প্রণাম কর' বলিলেন যে শ্রোতাদের প্রাণ জুড়াইয়া গেল। অমনি সকলে একে একে প্রণাম করিলেন। নিগমানন্দ কহিলেন, 'হরি মহারাজ বলতেন, কামাবার সময়, বেড়াবার সময় আর খাবার সময় প্রণাম করতে নাই। তাই করি নাই।' মহারাজ বলিলেন, 'আমার কাছে তা নাই।' 'যদি গাল দেন তাই প্রণাম করি নাই।' 'আমার কাছে গাল নাই।' আহা কি মধুর কথা!

---

৩ যুবকগণের সন্ন্যাসের আগ্রহ ও মহারাজের উদ্দীপনা ভাবাসৌন্দর্যে অপূর্ব। '৺কাশীধামে শেষবার' শীর্ষক নিবন্ধে উহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অদ্বৈতাশ্রমে ভূপেনবাবুর কীর্তন হইতেছে। মহারাজ বারান্দায় একখানি চেয়ারে ও অপর সকলে নীচে বসিয়াছেন। নামজাদা কীর্তনীয়া কিন্তু গান খুব জমিল না। প্রায় দেড়ঘণ্টা গানের পর কীর্তনীয়ারা হঠাৎ ঝুমুর দিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে সাধুরাও দাঁড়াইতেছিলেন, কিন্তু উপুদা আপত্তি করায় আর দাঁড়ান নাই। মহারাজ উহা লক্ষ্য করিয়াছেন ও নিজে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কীর্তনের পর তাঁহারা যাইয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, 'কেবল পেন্নাম, পেন্নাম! একটু নাচতে পারলি না? বেটারা সব বেদান্তী! আমরা যত রোগী উঠে দাঁড়ালুম, বেটারা একটু দাঁড়ালও না—গ্যাঁট হয়ে বসে রইল, যেন সমাধি হয়েছিল। দূর ছোঁড়াগুলি!' উপুদাকে বলিলেন, 'তুমি পরের বেলা খুব সমালোচনা করতে পার, নিজের বেলা দোষ নাই!'

আর একদিন তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে বেলা দশটা এগারটার সময় অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়াছেন, হাতে নীলরঙের একটি ঘাসফুল। ফুলটি দেখাইয়া বলিলেন, 'এইরূপ [শ্যামা] মায়ের রঙ্।'

এইবার কাশীতে অবস্থানকালে ভাবাবস্থায় প্রায়ই তাঁহার দর্শনাদি হইত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার একদিনের স্বগত উক্তিতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। সেদিন গদাইদার (বিকাশানন্দ) সঙ্গে তাঁহার ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে যাওয়ার কথা ছিল। অধিক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গদাইদা মনে মনে একটু বিরক্ত হইতেছিলেন কিনা বলা কঠিন, কিন্তু মহারাজ ধ্যান হইতে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বাবা বিশ্বনাথ হাত ধরে একটির পর একটি মন্দিরে নিয়ে গেলেন, কত দর্শন করালেন—কত মন্দির!' গদাইদা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ কোন্ মন্দির?' বাধা পাইয়া তিনি থামিয়া গেলেন, আর কোন কথা হইল না।[৪]

৩রা এপ্রিল মহারাজ কলিকাতা যাত্রা করেন। কেহ কেহ

৪ স্বামী হরানন্দ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

মোগলসরাই পর্যন্ত তাঁহাকে অনুগমন করিয়াছিলেন। তিনি সকলের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন ও বলিলেন, 'কে কোথায় থাকিস, কি করিস, খবর দিস।' একটা আনন্দের হাট যেন ভাঙ্গিয়া গেল। [প্র]

*　　　　*　　　　*

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবার মাস দুই পরে শরৎ মহারাজ সদলে পুরীধামে গমন করেন। পুরী হইতে স্বামী কেশবানন্দকে ২৯শে জুন তিনি যে পত্র লেখেন তাহার কিয়দংশ এইরূপ : "কলিকাতায় আসিয়া মঠ-সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক কথা শিবানন্দ স্বামিজী-প্রমুখ অনেকের সহিত সভা করিয়া স্থির করিতে হইয়াছিল, অন্যান্য অনেক কাজেরও বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল, এবং ঐসকল করিবার পরেই জ্বর হইয়া প্রায় একপক্ষের উপর ভুগিতে হয় ; সেজন্য সময়েরও অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল। একটু সারিয়াই এখানে চলিয়া আসিয়াছি এবং অনেকটা ভাল বোধ করিতেছি।...

"মনের শান্তি শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ধ্যানভজনে অধিক সময় কাটাইলে তবেই লাভ হইতে পারে। অতএব ঠাকুর ও মাকে যত পার ডাকিয়া তাঁহাদের নিকট ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা কর। আমিও কার্য হইতে একপ্রকার অবসর লইয়া ঐরূপ করিয়া দিন কাটাইতেছি। কারণ, শ্রীভগবানের দর্শনলাভই মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।"

শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের সঙ্গে পুরীবাসের আনন্দস্মৃতি উদ্দীপিত হওয়ায় শরৎ মহারাজ এবার অনেক সময়েই তাঁহার কথা কহিতেন। ষ্টেশন হইতে সদলে ধূলাপায়ে যাইয়া মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন ও খালি মেজেতে বসিয়া শালপাতায় মহাপ্রসাদ পাইয়াছিলেন —যেমন শ্রীমহারাজ করিতেন। সন্ধ্যার পর বালুকার উপরে বসিয়া

জপধ্যান করিতে মানা করিয়াছিলেন, কেননা ঐসময়ে সাপের উৎপাত হয়—মহারাজ বলিতেন। নিত্য তিনি মন্দিরে যাইতে পারিতেন না, কিন্তু সাধুভক্তদিগকে গভীর রাত্রে মন্দিরে যাইয়া জপধ্যান করিতে উৎসাহিত করিতেন। মহারাজের সেবক স্বামী নির্বাণানন্দকে গানও শিখাইতেন।

এখানে একটি ঘটনায় তাঁহার নিরভিমানতা প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া এক কবিরাজ বলিয়া বসে, 'যেরকম স্থূলকায় দেখচি, আপনার বোধ হয় জিহ্বালাম্পট্য আছে।' কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া শরৎ মহারাজ উত্তর দিলেন, 'কি আর খাই। রাত্রে পাঁচছয় খানা লুচি, তরকারী আর একপো দুধ; দিনে মাছের ঝোল আর দুটি ভাত। একে যদি জিহ্বালাম্পট্য বলেন তো তাই।'

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে: একদিন সেবক ঝোলভাত রাঁধিয়া তাঁহাকে খাইতে দিয়াছেন, অনেকটা খাওয়া হইয়া গিয়াছে এমন সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঝোল কেমন হয়েচে?' তিনি আবার একটু ঝোল মুখে দিয়া কহিলেন, 'আজ ঝোলে নুন দাও নি।' 'তবে নুন মেখে খান নি কেন?'—জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর দিলেন, 'ও আগে বুঝতে পারি নি, জিহ্বাটা খাচ্ছিল কিনা!'

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী পূজনীয়া লক্ষ্মীদেবী এই সময়ে পুরীধামে তাঁহারই জন্য নির্মিত লক্ষ্মীনিকেতনে বাস করিতেছিলেন। ব্রজগোপীর ভাব-মাধুর্যে ভূষিতা, অমলচরিতা লক্ষ্মী শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন ছিলেন। শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন।

২০শে জুন তারিখে সশিষ্যা লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে দেখিতে শশি-নিকেতনে আসিয়াছেন শুনিয়াই শরৎ মহারাজ দোতলা হইতে নামিয়া আসিলেন—তাঁহার হাতে দুইটি পাকা আম ও কয়েকটি পাকা কলা।

লক্ষ্মী আগে হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিলে তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রতিপ্রণাম করিলেন; লক্ষ্মী তখন তাঁহার মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। সানন্দে, সাধু ও ভক্তগণ-পরিবৃত হইয়া, গুরুভ্রাতা ও ভগিনীতে ভগবৎপ্রসঙ্গ চলিল। লক্ষ্মী উড়িয়া ও বাঙ্গলা গান গাহিয়া শুনাইলেন এবং দুই ঘণ্টার অধিক অতিবাহিত হইয়া গেলেও গাত্রোত্থান করিতে চাহিলেন না। অবশেষে শরৎ মহারাজের কথায় যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিলেন। মহারাজ তাঁহার গাড়ী ভাড়ার জন্য একটাকা এবং অতিরিক্ত দুইটি টাকা সেবকের হাতে দিয়া কহিলেন, 'দিদি যা খেতে ভালবাসেন তাই তাঁকে দিয়ো, আর কিছু ছানা কিনে তাঁকে খাইয়ো।'

লক্ষ্মীদেবী এই সময়ে মাঝে মাঝে ভাবস্থা হইয়া পড়িতেন। নিজ নিকেতনে একদিন শরৎ মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—দাদা, এরা বলে মূর্ছা। আমি কিন্তু অনেক রকম ঠাকুরদের দর্শন পেয়ে থাকি। অভ্‌ভরের পাহাড় দেখি। একদিকে লক্ষ্মী-নারায়ণ আর একদিকে ঠাকুর—মা, স্বামিজী, রাখাল মহারাজ, ও আর আর সাধু ভক্তেরা তাঁদের ঘিরে রয়েচেন। যোগীনদিদি ও গোলাপদিদিকে দেখলুম। ওঁরা বল্লেন, 'ও লক্ষ্মী, এখানে আহারনিদ্রা নাই, খালি ঠাকুরকে নিয়ে অবিরাম আনন্দ। এখানে রোগশোক নাই।' মহারাজ শ্রদ্ধার সহিত এইসকল দর্শনকথা শুনিলেন ও বিদায় লইবার পূর্বে তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া কহিলেন, 'আশীর্বাদ কর যেন ঠাকুরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ হয়।' [৫]

রথের দিন মহারাজ সদলে পুঁটিয়ার মন্দিরে গিয়া বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে বালকের ন্যায় সাগ্রহে বলিতেছেন, 'ঐ রথ এল, এবার চল।' অথচ রথ তখনও অনেক দূরে। পা-পোড়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়া

---

৫ 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী' গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

তিনি বিগ্রহ দর্শন করিলেন এবং একে একে তিনখানি রথই দড়ি ধরিয়া টানিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন।

শ্যামানন্দ-স্বামী পুরীতে আসিয়াছিলেন, এখন কর্মস্থলে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। না গেলে কাজের ক্ষতি হইবে, কিন্তু শরীর অসুস্থ। মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, 'দেখ, এতটা খেটেখুটে এই জ্ঞানটুকু হয়েচে যে আমাদের দ্বারা কিছুই হয় না। আগে আমারও মনে হত, আমি না হলে বুঝি কাজটা পণ্ড হবে—আমি না থাকলে একাজ আর কে করবে। এখন দেখচি, কারো অভাবে কাজ বন্ধ থাকবে না। এতদিনে এই জ্ঞানটুকু হয়েচে। তপস্যা করা চাই, নতুবা মনে হবে এসব কাজের কর্তা আমি।'

শ্রীক্ষেত্রে বাস ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন মহারাজের আকাজ্ক্ষার বস্তু ছিল। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কতবারই না তিনি এখানে আসিয়াছেন। এবারে প্রায় আড়াই মাস তিনি পুরীতে ছিলেন। সায়াহ্নে শশি-নিকেতনের দোতলার বারান্দায় কৌচে বসিয়া মহা-সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিতেন ও প্রায়ই ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িতেন। উহা ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহাকে বলিতে শোনা গিয়াছিল, 'আর কি মহাপ্রভুর দর্শন হবে!' পুরী হইতে তিনি ভুবনেশ্বরে আসেন ও দুই সপ্তাহ তথায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে বাস করিয়া সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ভুবনেশ্বরে তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছিল।

অতঃপর তিনি আর দূরবর্তী কোনও দেবস্থান দর্শন করিতে যাইতে পারেন নাই। পূর্বজীবনে একবার তিনি ৺কামাখ্যা-মহাপীঠ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের উক্তি হইতে জানা যায়; কিন্তু ইহার কাল নিরূপণ করিতে পারা যায় নাই।

কলিকাতা হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বর স্বামী কেশবানন্দকে তিনি যে

পত্র লেখেন উহার একাংশ এইরূপঃ “আমি তোমাকে ইতিপূর্বেই জানাইয়াছি—আমি এখন কার্য হইতে একপ্রকার অবসর লইয়াই রহিয়াছি। আবার যদি কোনও দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ কোনও কার্যের জন্য নিঃসন্দেহে পাই তাহা হইলে আবার নবীন উৎসাহে লাগিব এবং তাঁহার নিকট হইতে শক্তিসামর্থ্যও পাইব। যদি ঐরূপ না পাই তাহা হইলে আমার দ্বারা এজীবনে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে জানিবে।”

স্বামী সারদানন্দের কর্মবৈচিত্র্যময় জীবন যে প্রত্যেক কাজেই ঠাকুরের প্রত্যক্ষ আদেশে পরিচালিত হইয়াছে, উদ্ধৃত পত্রাংশে তাহারই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দেখিতে পাই। ক্রমাগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সুবিপুল কর্মভার তিনি বহন করিয়াছেন, অথচ একদিনের জন্যও অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই, লোকের নিন্দা বা প্রশংসা মুহূর্তের জন্যও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, তাঁহার প্রত্যেকটি কাজই বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সফলতায় ভরিয়া উঠিয়াছে ও প্রতিপদে উদীয়মান শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা পরিবর্ধিত করিয়াছে—কোন্ মহাশক্তিতে যে এই সমুদয় সম্ভবপর হইয়াছে, উদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। আর ঠাকুরের আদেশ পালন ব্যতীত অপর কোন কামনাই যে তাঁহার ছিল না, প্রচারক-জীবনে একদিন তাঁহার নিজের মুখেই সেকথা পরিব্যক্ত হইয়াছিল।

‘তোমার অনুসরণে লোকের কল্যাণ হবে’—আজীবন সুহৃৎ সান্যাল মহাশয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া শরৎ মহারাজ কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, ‘আমি কে? প্রভুর কৃপায় সকলেরই কল্যাণ হবে।’

স্বামিজীর মুখে সান্যাল মহাশয় শুনিয়াছিলেন, ‘আমাদের মধ্যে যে ভাগ্যবান প্রভুর পদে আত্মবলি দিতে পেরেচে, সেই মহাত্মাই তাঁর লীলাবর্ণনে সমর্থ হবে।’

পুরী হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে, অনেকেই লক্ষ্য করিলেন, স্বামী সারদানন্দ দিনদিন আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইতেছেন—তাঁহার জপধ্যান অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরে সকলের আহার শেষ হইয়া গেল, কিন্তু তিনি স্থাণুর ন্যায় একভাবে বসিয়াই আছেন, হাতে জপের মালাটি স্থির রহিয়াছে কিংবা হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে, মুখ রক্তবর্ণ। ঘরের বায়ুমণ্ডলেও একটা অনির্বচনীয় প্রশান্তগম্ভীর ভাব। সেই সময়ে কেহই তাঁহার ঘরে ঢুকিতে সাহস পাইত না।

একদিন ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ শ্রীমতী সরলাকে কহিলেন, 'মহারাজ যেভাবে শরীরের দিকে মোটেই নজর দিচ্ছেন না সেটা ভাবনার কথা। তুমি যদি এ সম্বন্ধে মহারাজকে একটু বলে দেখ তো ভাল হয়।' দুর্গাপদবাবুর নাম করিয়া সরলা সেকথা বলিতেই মহারাজ উত্তর দিলেন, 'কি আর করি বুড়োবয়সে, তাই বসে বসে রাম রাম করি। কেউ তো কিছু করবে না, তবু দেখে যদি করে।' [প্র]

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের যাবতীয় কার্যাবলীর ন্যায় তাঁহার এত জপ-ধ্যানও যে বহুর কল্যাণে অনুষ্ঠিত, তাঁহার নিজমুখের কথায় ইহাই প্রতীত হয়। এক শিষ্যা তাঁহাকে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, সংসারের নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে জপ করা তাঁহার হইয়া উঠে না। তিনি এই মর্মে উত্তর দিয়াছিলেন, 'নিয়মিতভাবে জপ করিতে না পারিলেও ক্ষতি নাই। তোমার হইয়া আমিই জপ করিব।' দীক্ষাদান-প্রসঙ্গে একদা বলিয়াছিলেন, 'দীক্ষা কি দিলেই হল গো, মন্ত্র দিয়ে তাদের জন্যে আমাকে জপ করতে হয়।' শিষ্যদিগকে তিনি ভুলিতেন না। কলিকাতায় তাঁহার জনৈক শিষ্য[৬] একদা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—মহারাজের কি আর আমাকে মনে আছে? দীক্ষাগ্রহণের দিন সেই

৬ শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

একবারমাত্র দেখিয়াছিলেন, আর তাহার আট মাস পরে এই আজ আসিলাম। অমনি মহারাজ সেবককে ডাকিয়া কহিলেন, 'ওরে সাতু, গোপালকে পেসাদ দে। ওকে আবার অনেক দূর যেতে হবে।' প্রসাদ খাইতে খাইতে গোপালবাবুর চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। একথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি বহুশিষ্য করিয়া যান নাই, বহুশিষ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াও মনে হয় না।[৭] দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া কেহ কেহ তাঁহার মুখে শুনিতে পাইয়াছে, 'মঠে যাও, আমাদের যিনি বড় তিনি আছেন সেখানে।'

সাধারণতঃ বেলা একটায় এবং যেদিন দীক্ষা দিতে হইত সেদিন আরও কিছু বিলম্বে আহার করিয়া তিনি কিছু সময় বিশ্রাম করিতেন এবং তাঁহার পরে চিঠিপত্রের জবাব দিতে বসিতেন। ইদানীং এত অধিক সংখ্যায় চিঠিপত্র আসিত যে স্বহস্তে সকল পত্রের জবাব লিখিয়া উঠিতে পারিতেন না ; তিনি বলিয়া যাইতেন এবং জনৈক সেবক—স্বামী অশেষানন্দ লিখিতেন। অপরাহ্ণ চারিটার পরে সাধারণতঃ স্ত্রীভক্তেরা আসিতেন এবং প্রণাম-পরিপ্রশ্নাদি করিয়া সন্ধ্যার পুর্বেই চলিয়া যাইতেন। নৈশ আসরের কথা পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; এখানে রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত তিনি বসিয়া থাকিতেন। এই আসরে তাঁহার শ্রদ্ধাবান কৃতবিদ্য শিষ্যেরা কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নিজমুখ হইতেই তাঁহার জীবনের কোন কোন কাহিনী শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্তরের আগ্রহ জানিয়া শেষের দুইএক বৎসরকাল তাঁহাদের কাছে তিনি আর একান্তভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকেন নাই বা থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই আত্মপ্রকাশ এতই সহজ স্বাভাবিকভাবে ঘটিয়াছে যে, তাহাতে আত্মপ্রচারের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞানে প্রেমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামিজী-প্রমুখ গুরুভ্রাতৃগণের সঙ্গে

---

৭ তাঁহার শিষ্যসংখ্যা দুইশতের কিছু বেশী হইবে বলিয়া মনে হয়।

চিরসম্বদ্ধ চিরমিলিত সেই অহংশূন্য আত্মপ্রকাশের সুষমা অহংসর্বস্ব আমাদের লেখনীতে ব্যক্ত হইবার নহে।

একদিন ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'জীবন্মুক্ত পুরুষদের কি কোন সুখদুঃখ হয় না?' 'হয় হোক, তাতে তাদের কিছু যায় আসে না'—এই উত্তর দিয়াই মহারাজ সান্যাল মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলেন, 'তোমার মনে আছে কি—পাহাড়ের খুব একটা উচুস্থানে আমরা দুজনে বসেছিলুম; সামনেই নীচে দেখা যাচ্চে, খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্চে, বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, কিন্তু আমরা যেখানে বসে আছি সেখানে রোদ।'

১৯২৫ অব্দে কোন সময়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার চিত্রশিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর একখানি ছবি আঁকিতে অভিলাষী হইয়া ফটোর জন্য লিখেন। শরৎ মহারাজ যত্নপূর্বক কয়েকখানি ভাল ফটো পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব গত বৎসরের ন্যায় এইবারেও নিবেদিতা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইল। শরৎ মহারাজ বিদ্যালয়-ভবনে গমন করিলেন এবং বেলা দুইটা পর্যন্ত তিন ঘণ্টাকাল সেখানে থাকিয়া, চণ্ডীর গান শুনিয়া ও সমাগত ভক্তগণের প্রসাদ গ্রহণ শেষ হইয়াছে দেখিয়া, নিজাবাসে ফিরিয়া আসিলেন।

২১শে ডিসেম্বর পুজনীয় শরৎ মহারাজের জন্মতিথি। ভক্তগণের একান্ত ইচ্ছা, তাঁহারা এবার মায়ের বাড়ীতে তাঁহার জন্মতিথি-পূজাদি করিবেন। তাঁহাকে পরাইবেন বলিয়া শিষ্যেরা যেসমস্ত ফুলের মালা লইয়া আসিয়াছিলেন সেইসকল মালায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে ও শ্রীশ্রীমাকে সাজাইতে তিনি আদেশ করিলেন, এবং স্বহস্তে নিজের ঘরে যে কয়খানি ঠাকুরদের ছবি ছিল সেসব ছবিতে মালা পরাইয়া দিলেন। দলে দলে শিষ্যেরা ও মঠ হইতে সমাগত সাধুরা তাঁহাকে প্রণাম

করিয়া যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার এক শিষ্য 'গৌরাঙ্গ' কতকগুলি ফুলের মালা লইয়া আসিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'দেখ না এদের কাণ্ডখানা, মার বাড়ীর দারোয়ানকে ভগবান করে ফেলতে চায়! যা আগে ঠাকুরকে মাকে প্রাণভরে সাজিয়ে আয়, তারপর দেখা যাবে।'

আনন্দোৎসবের মধ্যে দিনটি অতিবাহিত হইল। কিন্তু যাঁহাকে লইয়া এই আনন্দ তাঁহাকেই অসুবিধা ভোগ করিতে হইল বেশী। তিনি একটুও বিশ্রাম করিতে পাইলেন না। ছোট বাড়ীখানিতে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা বহুলোকের একত্র সমাগম হইয়াছে, কে কোথায় বসিবে ও প্রসাদ পাইবে, কত লোকের খাওয়া হইয়াছে, কত লোক খাইতে বাকি আছে—বারবার তাঁহাকেই খোঁজ লইতে হইতেছিল। তাঁহার নামে কোন কাজে লোকে সামান্য অসুবিধাটুকু ভোগ করে ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের হাজার ফুট গভীর নলকূপ হইতে জনৈক ভক্ত মাঝে মাঝে তাঁহার জন্য এক ঘটী জল লইয়া আসিতেন; তিনি তাহাতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইতেন।

বহুবার ইহা দেখা গিয়াছে যে, ভক্তিভালবাসার সহিত কোনও উত্তম জিনিষ তাঁহার জন্য লইয়া আসিলে তিনি উহা স্বীয় অভীষ্ট দেবতাকে দিয়াই সমধিক তৃপ্ত হইতেন। একদিন ডাক্তার কাঞ্জিলালের কন্যা, তাঁহার স্নেহপাত্রী ও শিষ্যা শ্রীমতী রমা একখানি সুন্দর উলের আসন লইয়া আসিয়া বলিল, 'মহারাজ, আপনার জন্যে এই আসনটি করেচি।' আসন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন ও স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, 'এত ভাল জিনিষ—এটা মাকে দি। কি বল মা, তোমার মত আছে তো? দিই মাকে?' মেয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, তৎক্ষণাৎ ঠাকুরঘরে গিয়া আসনখানি তিনি শ্রীশ্রীমাকে উৎসর্গ করিলেন। তদবধি সেই আসন পাতিয়া মাকে ভোগ নিবেদন করা হইতে লাগিল।

ইদানীং শরৎ মহারাজের সদাপ্রফুল্ল বদনে তাঁহার চিত্তপ্রশান্তি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহার চিরমধুর স্বভাবটি মধুরতম বলিয়া সকলের কাছে প্রতিভাত হইতেছিল। তাঁহার স্নেহকোমল হৃদয়খানি যে অতুলন গাম্ভীর্যের আবরণে অনেক সময়ে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহিত সে আবরণটুকু যেন চিরতরে অপসৃত হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিয়া কর্মদোষে একদিন যাহারা তাঁহার ধমক খাইয়াছে তাহারা দেখিল, মায়ের মমতা ও দরদ লইয়া আজ তিনি তাহাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল জানিয়া লইতেছেন, তাহাদের কোন জিজ্ঞাস্য আছে কিনা পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিতেছেন, এবং তাহারা চলিয়া যাইতে চাহিলেও যেন এত শীঘ্র তাহাদিগকে বিদায় দিতে চাহিতেছেন না।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ। স্বামী সারদানন্দের দিনলিপি হইতে জানা যায়ঃ ১লা জানুয়ারী দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের জন্মতিথির দিন তিনি ইটালি শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ে গিয়াছিলেন ; ৬ই স্বামিজীর জন্মতিথি-পূজায় যোগ দিতে বেলুড় মঠে যান ও সমস্তদিন তথায় অবস্থান করেন ; ৯ই ফক্স ভগিনীদ্বয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসেন। ফক্স ভগিনীদ্বয় বৎসরকাল যাবৎ বাগবাজার পল্লীর এক ভাড়াটে বাড়ীতে গুরুর সান্নিধ্যে থাকিয়া সাধনভজন করিতেছিলেন, শীঘ্রই আমেরিকায় ফিরিবেন বলিয়া তাঁহারা স্বহস্তে রান্না করিয়া গুরুদেবকে খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

১৬ই জানুয়ারী শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মতিথি-পূজায় তিনি পুনরায় মঠে গমন করেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার অন্যতমা শিষ্যা মিসেস্ কুক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। মিসেস্ কুক প্রায় একবৎসর যাবৎ বেলুড় মঠের অতিথিশালায় থাকিয়া সাধন-ভজনে কালাতিপাত করিতেছিলেন।

পুরীধামে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবী ২৪শে ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে ছয়টায় স্বধামে প্রয়াণ করেন। সেই সংবাদ শুনিয়া শরৎ মহারাজ ব্যথিত হইলেন এবং লক্ষ্মীর গুণগ্রাম—তাঁহার ত্যাগতপস্যা, ভজনানুরাগ ও অপরকে নকল করার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা উপস্থিত সকলের কাছে কীর্তন করিতে লাগিলেন।

*　　　*　　　*

কাজকর্ম হইতে একপ্রকার অবসর লইয়া শরৎ মহারাজ যখন প্রিয়তমের শেষ আহ্বানের প্রতীক্ষায় আছেন বলিয়া মনে হইতেছিল, এমন সময় এক বৃহৎ কর্মের নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান আসিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম কন্‌ভেন্‌শন বা মহাসম্মেলনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হইবে। স্বামী শুদ্ধানন্দ সেই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা।

দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পুর্ববৎ জপধ্যানে কাটিয়া যায়। অপরাহ্নে তিনি বসিয়া বসিয়া ইংরাজী ভাষায় অভিভাষণ লেখেন। ভারতে ও ভারতের বাহিরে নানাস্থানে এখন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বহু সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সমুদয় কেন্দ্র হইতে সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণ বেলুড় মঠে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন, দুইটি বৃহৎ ভাড়াটে বাড়ীতে তাঁহাদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া পুজনীয় শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিয়া যাইতেছেন। লেখা বন্ধ রাখিয়া তিনি কুশলপ্রশ্ন করিতেছেন এবং ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও করিতেছেন। এই সময়ে সকল কাজের মধ্যেও, তাঁহার আত্মসমাহিত ভাবটি অনেকেই লক্ষ্য করিতেন। বহিরাগত কোন কোন প্রবীণ সাধুকে এইরূপ বলিতে শোনা যাইত : 'ব্যক্তিগত জীবনে আমাদিগকে কিভাবে চলিতে হইবে, কিরূপ হইতে

হইবে, আচার্য তাহা আচরণ করিয়া শিক্ষা দিতেছেন। অভিভাষণে কি উপদেশ তিনি দিবেন তাহা আগেই অনুমান করিয়া লও।'

২৮শে মার্চ, দুইজন সেবক সঙ্গে করিয়া, আচার্য বেলুড় মঠে আসিলেন এবং প্রায় একপক্ষ কাল মঠেই বাস করিলেন। পয়লা এপ্রিল সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন স্থরু হইল, এবং সেই দিনই কলিকাতায় হিন্দুমুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা বাঁধিয়া গেল। ইহার ফলে সাধারণ সভাগুলিতে আশানুরূপ লোকসমাগম হইল না বটে, কিন্তু সম্মেলনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিল না। শরৎ মহারাজ প্রত্যহ উপদ্রুত কলিকাতার অবস্থা এবং দেশের নেতারা কি উপায়ে রক্তারক্তি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর লইতেন।

অতীত ইতিহাস ও কর্মবহুল সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ আচার্য যে স্থচিন্তিত সারগর্ভ অভিভাষণ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে পাঠ করিয়াছিলেন তাহার মুদ্রিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"যখনই কোন নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তখনই দেখা যায়, সমাজ এবং সমগ্র মানবজাতি উহার মূল তত্ত্বগুলি মানিয়া লইবার পূর্বে প্রথমে লোকে উহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, শেষে তৎসম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করে। কোন নূতন আন্দোলনকে এই দুইটি অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতেই হয়—ইহা যেন প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম। আর যখন মানবপ্রকৃতি সর্বত্রই সমান, তখন কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্ত্য জগৎ সর্বত্রই এই নিয়মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজনীতি, রাজনীতি বা ধর্ম—যেকোন ক্ষেত্রেই বল না কেন, যদি নূতন কোন সংস্কার করিতে চাও, নূতন কোন ভাবধারা আনয়ন করিতে চাও, তবে দেখিবে, তোমার চারিপাশের লোক তোমার বিরুদ্ধে লাগিবে। আর তোমার প্রবর্তিত সংস্কার-আন্দোলনের ভাবগুলি প্রচলিত ভাব হইতে

যতই নূতন হইবে, ততই বাধা প্রবলতর হইবে। লোকে বলিবে, উক্ত আন্দোলনের মূলে যে ভাবরাশি—যে আদর্শ বিদ্যমান, তৎপ্রভাবে বর্তমান সমাজে যাহা কিছু ভাল ও প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, তাহার ভিত্তি পর্যন্ত চুরমার করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যদি ঐ আন্দোলনের ভিতর যথার্থ জীবনীশক্তি থাকে, যদি উহা মানবপ্রকৃতির ও উহার বিভিন্ন অঙ্গ ও কার্যাবলির পরিচালক সার সত্যসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বাধা সত্ত্বেও উহার বিনাশ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উহার প্রভাব বাড়িতে থাকিবে এবং ক্রমে মানবহৃদয়ে উহা স্থায়িভাবে তাহার শিকড় গাড়িয়া বসিবে। এই বাহিরের বাধাই ঐ আন্দোলনকে নিজ শক্তিরাশি একমুখী করিতে এবং যে মূল সত্যসমূহের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত সেইগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সকলদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহাকে মন্দ বলিতে পারা যায় না।

"কিছুকাল পরে এই বাধা আপনা আপনি ধীরে ধীরে চলিয়া যায়, উদাসীনতা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। যাহারা প্রথমেই উহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছিল, তাহারাই বলিতে থাকে,—দেখ, এই যে আন্দোলন দেখিতেছ, ইহাতে নূতনত্ব আর কি আছে? ইহারা যেসকল তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে ও শাস্ত্রে অমুক অমুক শ্লোকে সেই কথাগুলিই যে রহিয়াছে। ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বহুকাল পূর্বেই এসকল কথা জানিতেন এবং বহুকাল পূর্ব হইতেই এগুলি করিয়া আসিতেছেন। অতএব এগুলি লইয়া অধিক মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই। এই দ্বিতীয় অবস্থায় বাধা অপসারিত হওয়ায় ঐ আন্দোলন বহুদূরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং কালে সমাজের লোকে যখন উহার অস্তিত্ব ও উপকারিতা স্বীকার করিয়া লয়, তখন উহা সমাজে একটা স্থান অধিকার

করিয়া বসে—উহাকে বাধা দিবার, উহার বিরুদ্ধে লাগিবার আর কেহ থাকে না।

"সুতরাং এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে সর্বসাধারণের সম্মতিক্রমে উহা সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, আর এইরূপে সমাজে পরিগৃহীত ও আদৃত হইবার উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে তখন হইতে দলে দলে উহাতে লোক প্রবেশ করিতে থাকে। তবে ঐ আন্দোলনের উন্নতির ইতিহাসে এইরূপ সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইলেই ঐ আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে মনে করা উচিত নহে। কারণ, বাধাহীন অবস্থায় পৌঁছিয়া প্রথম অবস্থার উৎসাহ ও উদ্যমে যেন একটু ভাঁটা পড়ে, আর প্রথমাবস্থায় উক্ত আন্দোলনের প্রবর্তকগণের মধ্যে যে ভাবের গভীরতা ও উদ্দেশ্যের একতা ছিল, হঠাৎ বিস্তারের সঙ্গে তাহা কমিয়া যায়। সুতরাং তখন বাহিরের বাধার স্থলে উহার অঙ্গগণের বিভিন্ন মতামতের ফলে অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হয়, এবং পরে, প্রথমাবস্থায় খাঁটি সত্যের জন্য যে একটা স্বার্থত্যাগের ভাব ছিল তৎস্থলে খাঁটি সত্যের সঙ্গে সত্যাভাসের আপোষ করিয়া, সমাজে একটা প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা এবং যথার্থ ভিতরের জিনিষটার পরিবর্তে বাহিরের চাকচিক্যের দিকে—দেখাইবার চেষ্টার দিকে একটা ঝোঁক হয়। যাহারা সত্যের জন্য কোনরূপ স্বার্থত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার না করিয়া আরামে জীবন কাটাইতে চায়, তাহাদের স্বভাবতই এই দিকেই প্রবৃত্তি হয়। আর যদি ঐ আন্দোলনের নেতাগণ সতর্ক দৃষ্টিতে জাগরিত না থাকেন অথবা ঐসকল দোষের উৎপত্তিতে বাধা দিবার জন্য—উহাদিগকে সমূলে বিনাশের জন্য কোনরূপ প্রতিকারের উপায় আবিষ্কার করিয়া ঐ অবস্থাটাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা না করেন, তবে তাহার ফলে যে কি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথমতঃ, এবং প্রধানতঃ যতই স্বার্থের ভাব প্রবেশ করিতে থাকে ততই যে

প্রেমের সূত্রে এতদিন সকলে একত্র ও গ্রথিত ছিলেন, তাহা কমিতে থাকে এবং সঙ্ঘের অঙ্গগণ সমগ্র সঙ্ঘের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যে উদার ব্যাপক দৃষ্টির প্রয়োজন তাহা ভুলিয়া পৃথক পৃথক ভিন্ন একএকটা দল হইয়া সমগ্র সঙ্ঘের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া উহার পৃথক পৃথক একএকটা অংশের উন্নতিবিধান ও উহার স্থায়িত্বসাধনের ভাব লইয়া কার্যে অগ্রসর হন। এইরূপে সঙ্ঘের ভিতর বিশ্লেষণের ভাব এই সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া সমস্ত সঙ্ঘটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। আর কালবশে গুরুজনের অবাধ্যতা, অহঙ্কার, আলস্য ও অন্যান্য শত শত দোষ সঙ্ঘের ভিতর প্রবেশ করিয়া চিরদিনের মত উহার সর্বনাশ সাধন করে।

"শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন প্রবর্তিত হয়, তাহাও ইহার প্রধান প্রবর্তক ও নেতা স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর্ধানের কয়েক বর্ষ পুর্বেই এইরূপ বাধা ও উদাসীনতারূপ সোপানদ্বয় অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি তাঁহার তিরোভাবের পুর্বেই রামকৃষ্ণ মিশন নাম দিয়া ইহাকে একটা কার্যোপযোগী গঠন দিয়াছিলেন ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই ইহা প্রায় ত্রিশ বর্ষ ধরিয়া তৎপ্রদর্শিত পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বর্তমানে এমন এক অবস্থায় পৌছিয়াছে, যখন ইহা ভারত ও ভারতেতর কয়েকটি দেশের লোকের হৃদয়ে আদর ও স্থান পাইয়াছে। প্রথমে ইহা প্রধানতঃ বঙ্গদেশের একটি ক্ষুদ্র নগন্য সঙ্ঘমাত্র ছিল; এক্ষণে এই অল্পকালের মধ্যে উহা ভারতের সকল প্রদেশে, শুধু ভারতে কেন, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, যুক্তমালয় রাজ্য, এমন কি সুদূর পাশ্চাত্যদেশ যথা আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং য়ুরোপেও কতক অংশে বিস্তৃত হইয়াছে। বন্ধুগণ, তোমরা এবং তোমাদের সহযোগী কর্মী ভ্রাতৃগণ সঙ্ঘের এই গৌরবময় পরিণাম আনয়নের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় শ্রীপ্রভুর হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইবার

সৌভাগ্যলাভ করিয়াছ। তোমরা একমাত্র শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া বারাণসী, কনখল ও বৃন্দাবনে জনহিতকর সেবাকেন্দ্রসমূহ স্থাপন করিয়াছ। তোমাদের ভবিষ্যদ্দর্শী নেতা তাঁহার কতকগুলি বক্তৃতায় যে বলিয়াছেন, অর্থবলে বলী ব্যক্তি নহে, কিন্তু চরিত্রবল ও দৃঢ় ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন এবং একটা মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি তীব্র অনুরাগরূপ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মানুষই এইরূপ কার্যকে স্থায়ী ও সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে, তাঁহার সেই বাক্য জনসাধারণের নিকট প্রমাণিত করিয়াছ। তোমরা মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অনেক প্রদেশে এবং ইদানীং নাগপুর, বোম্বাই, কুয়ালালামপুর ও রেঙ্গুনে প্রচার ও শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ স্থাপন করিয়াছ। ঐসকল স্থানের জনসাধারণ তোমাদের কার্য দেখিয়া তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তোমাদের সহযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। আর তোমরা সমগ্র ভারতের দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িত এবং অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন নরনারীর সাহায্যকল্পে পুনঃপুনঃ সেবাকেন্দ্র খুলিয়া সমগ্র দেশবাসী জনসাধারণের হৃদয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর এখন যে লোকের একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে, তাহা জাগাইতে সাহায্য করিয়াছ। তোমরা অদ্ভুত ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে তোমাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বিশ বৎসর বা ততোধিককাল ধরিয়া সমানে লাগিয়া আছে, কোন কোন স্থলে আবার সমগ্র জীবন একটা স্থানে কামড়াইয়া পড়িয়া আছ, কারণ, তোমাদের অবসর দিয়া তোমাদের স্থলে বসাইবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় নাই।

"সত্যই, আমাদের প্রভু এবং তাঁহার মনোনীত আমাদের সঙ্ঘের মূলনেতা তোমাদেরই মধ্য দিয়া দরিদ্র ভারতে এবং অন্য অধিকতর সৌভাগ্যশালী দেশসমূহে অদ্ভুত কার্য সাধন করিয়াছেন। কিন্তু উহা অপেক্ষা বড় বড় কাজ এখনও বাকি পড়িয়া রহিয়াছে। আর আমাদের

প্রভু ও স্বামিজী সময়ে তোমাদেরই মধ্য দিয়া উহা সাধন করিবেন, যদি তোমরা তাঁহাদের পবিত্রতা, সংকল্পের একনিষ্ঠতা, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ, এবং যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু মহৎ তৎসমুদয়ের উপর আত্মসমর্পণরূপ তাঁহাদের জীবনের মহান গুণরাশির অনুকরণ করিতে পার, এবং এতদিন যে বিনয় ও নম্রতার সহিত তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়াছ, যদি এখনও তাহাই করিয়া যাইতে পার। কারণ, যদি আমরা তাঁহাদের কার্য করিতে অন্যভাব লইয়া অগ্রসর হই, এবং তাঁহাদের কার্য করিতে নির্বাচিত হইয়া এতদিন উহা করিতে পাইয়াছি বলিয়া যদি আমরা অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠি, তবে, আমরা সেই কর্মক্ষেত্র হইতে একেবারে অপসারিত হইয়াছি এবং আমাদের স্থানে কার্য করিবার জন্য অপরে নির্বাচিত হইয়াছে—দেখিয়া শীঘ্রই আমাদিগকে শোকের অশ্রু বিসর্জন করিতে হইবে। বাইবেলে উল্লিখিত তথাকথিত ঈশ্বর-নির্বাচিত ইস্রায়েলিটদের কথা স্মরণ কর—তাহারা শ্রীপ্রভুর কথা এবং 'প্রভু অতি সামান্য ধূলিকণা হইতেও তাঁহার কার্য করিবার লোক গড়িয়া তুলিতে পারেন'—তাঁহার এই সাবধানবাক্যে কর্ণপাত করে নাই এবং তাহার ফলে তাহারা কি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, ভাবিয়া দেখ। এই প্রসঙ্গে ভারতে এক সময়ে আমাদের কতকগুলি প্রবল সম্প্রদায়ের দুর্গতির কথাও স্মরণ রাখিও।

"অতএব বিগত ত্রিশবর্ষ ধরিয়া আমাদের মিশন যেরূপ বিস্তারলাভ করিয়াছে, ইহা ভাবিতে গেলে যদিও আশ্চর্য হইতে হয়, ঐ সঙ্গে সঙ্গে গভীরভাবে এ প্রশ্নটিও আপনা আপনি আসিয়া পড়ে যে, এই বিস্তারের ফলে কি আমাদের আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় যে প্রবল ত্যাগের ভাব ও আদর্শের উপর প্রবল অনুরাগ ছিল, তাহা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, অথবা যে কার্য আমরা প্রথমে আদর্শের উপর তীব্র অনুরাগবশে ঐ আদর্শের জয় ঘোষণার জন্য করিতাম, তাহা বর্তমানে

আমাদের নামযশোলিপ্সা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, ও নিজ নিজ পদগৌরবের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিবশতঃ দাসত্ব ও বন্ধনে পরিণত হইয়াছে। সত্যই এক্ষণে এইসকল গুরুতর প্রশ্নের বিচার, চিন্তা, ও সমাধানের—খাঁটি শস্য হইতে তুষ এবং বিশুদ্ধ ধাতু হইতে খাদ বাছিয়া পৃথক করিবার সময় আসিয়াছে।

"এই বর্তমান মহাসম্মেলন তোমাদিগকে এই সুযোগ দিবার জন্য আহূত হইয়াছে। ইহাতে সমবেত হইবার ফলে তোমরা তোমাদের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ বা তোমাদের পূর্ববর্তী সহকর্মীদিগের সহিত এবং গুরুজনদিগের সহিত মিলিত হইবার এমন সুযোগ ও সৌভাগ্যলাভ করিয়াছ যাহা সচরাচর ঘটে না। এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোমরা অনেক শিক্ষা পাইবার সুযোগ পাইবে—সমগ্র মিশনের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী বিষয়ে আলোচনা করিয়া একটা স্থির করিতে এবং আমাদের সঙ্ঘের এই সঙ্গীন অবস্থায় সর্বসাধারণ কর্তৃক উহার প্রচারিত ভাবরাশি পরিগৃহীত হইবার ফলে যেসকল বিপদ ও দোষ প্রবেশ করে বলিয়া ইতিপুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে নিজেদের দূরে রাখিবার অবকাশ পাইবে। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা সকলে অকপট ও সরলভাবে এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া আমাদের অনুষ্ঠিত সমুদয় কার্যগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখ, তোমরা এই অদ্ভুত বিস্তারের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সেগুলি করিতে যাইয়া আমাদের সেই গৌরবময় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ কিনা। আদর্শটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক, কারণ, সেই আদর্শের ভিতরই প্রত্যেক আন্দোলনের সঞ্চিত শক্তি—কুণ্ডলিনী—নিহিত থাকে। নিজেকে ও অপরকে ইহারই তীব্র আলোকে বিচার করিয়া লও। ইহা যদি করিতে পার, তবেই তুমি

আমাদের কার্যের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের সহায়তা করিয়া এই মহাসম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে।

"এইরূপ সম্মেলন ভারতের ইতিহাসে নূতন নহে—ইহা যেন স্মরণ রাখিও—এইরূপেই আমাদের পূর্ববর্তী সঙ্ঘসমূহের উন্নতিসাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। আমরাও সেই প্রাচীন, বারম্বার পরীক্ষিত পথে ভ্রমণ করিবার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণ কয়েকবার এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সঙ্ঘের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সঙ্ঘ খুব বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল এবং সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের মহৎ কর্মের সর্বনাশ বা বিলোপসাধন ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদের শিষ্যগণও তাঁহাদের সঙ্ঘজীবনের প্রাচীন যুগে সময়ে সময়ে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উন্নতিবিধানার্থ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই কার্যপ্রণালী কিছু নূতন নহে; কিন্তু যাঁহারা এক্ষণে নিজেদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করিতে যাইতেছেন তাঁহাদের অকপটতা ও লক্ষ্যের একতানতার উপরই এই প্রণালী প্রয়োগের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অতএব তোমরা স্বেচ্ছায় যে কার্যসাধনে উদ্যোগী হইয়াছ, তাহা শ্রীপ্রভুর কৃপায় যতদিন না সমাপ্ত হইতেছে ততদিন প্রাণপণে খাটিতে থাক—আমাদের নেতা আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় 'উঠ, জাগ, যতদিন না লক্ষ্যে পৌছিতেছ, ততদিন অনলসভাবে অগ্রসর হইতে থাক' এই কথাগুলি বলিয়া আমি তোমাদের প্রত্যেককে উহাতে নিযুক্ত হইতে আহ্বান করিতেছি। বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, সন্তানগণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শপ্রচাররূপ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মিগণ, আমি আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র নাম লইয়া, আমাদের জগদ্বিখ্যাত নেতা স্বামী বিবেকানন্দের নাম লইয়া, এবং আমাদের ভূতপূর্ব সভাপতি আমাদের প্রভুর প্রিয়তম অন্তরঙ্গ স্বামী

ব্রহ্মানন্দের নাম লইয়া তোমাদের সকলকে স্বাগতসম্ভাষণ করিতেছি।"

সম্মেলনের অন্তে, দ্বাদশজন সভ্য লইয়া এক কার্যকরী সমিতি গঠিত হইল। ঐ সমিতি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্যসমূহ দ্রুত নিষ্পন্ন করিতে বেলুড় মঠের ট্রাষ্টীদিগকে সাহায্য করিবেন। এতৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া স্বামী সারদানন্দ ট্রাষ্টীগণের সভায় উপস্থাপিত করিলেন ও তাঁহাদের দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইলেন। সাধনভজন-সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাদি ব্যতীত, অন্যান্য সকল বিষয়ে কার্যকরী সমিতির সঙ্গে যোগস্থাপন করিতে নির্দেশ দিয়া প্রতি কেন্দ্রে সঙ্ঘাধ্যক্ষ ও সম্পাদকের স্বাক্ষর-করা লিপি প্রেরিত হইল।

১৭

মহামিলন

সম্মেলনের কাজ শেষ করিয়া ১১ই এপ্রিল পূজনীয় শরৎ মহারাজ যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার বহুমূত্ররোগ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে—প্রস্রাবে চিনি হইয়াছে ৩৫ গ্রেণ। কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, 'কাজ কাজ যে কর, এই তো কাজ করে এলুম—দেখ না, শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেচে। স্বামিজী যে কাজের ভার আমাকে দিয়েছিলেন, মনে করেছিলুম বছর পাঁচেক করব; সেই কাজ তিনি ত্রিশ বছর ঘাড়ে ধরে করিয়ে নিলেন। এখন আমার কাজ শেষ হল। ঠাকুর একএক করে আমার কাজ শেষ করিয়ে নিলেন। মা, মহারাজ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা—সকলে চলে গেলেন। মা বলেছিলেন, যোগেন গোলাপ রইল, দেখো। এখন তাঁরা তাঁদের কাছে চলে গেচেন—আমার কাজ শেষ।' [প্র] ঠিক এই সময়ে তাঁহাকে প্রিয়জন-বিয়োগজনিত একটি সংবাদও শুনিতে হইল। ২২শে এপ্রিল রাত্রি ৮টা ২০ মিনিট সময়ে বুড়োবাবা ৺কাশীপ্রাপ্ত হইলেন।

*   *   *

শ্রীশ্রীসারদামাতার অন্তরঙ্গ সারদানন্দ, অনেক সময়েই, মায়ের সঙ্গে অভিন্ন সত্তারূপে প্রতিভাত হইতেন। জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপুজার জন্য মা সমস্ত বৎসর ভাবিতেন, কি করিয়া মা-জগদ্ধাত্রীর পুজাটি হইবে। শরৎ মহারাজও, মায়েরই মত, প্রতি বৎসর পুজার সমুদয় জিনিষগুলি কিনিয়া গুছাইয়া জয়রামবাটীতে পাঠাইতেন। শ্রীমতী রাধুর কথা আগেই বলা হইয়াছে। অপর যাহারা, রাধুরই মত, মায়ের তিরোভাবে নিজেদের অনাথ জ্ঞান করিতে পারিত, শরৎ মহারাজ বিদ্যমান থাকিতে

তাহা তাহারা করে নাই। তাঁহার তিরোভাবের আটাশ বৎসর পরে, আজও ইহার সাক্ষ্য দিবার মত লোকের একান্ত অভাব ঘটে নাই। সমভাবে তিনি মায়ের বহু আশ্রিতের ও মন্ত্রশিষ্যের পার্থিব অভাব পুরণ করিয়াছেন ও আধ্যাত্মিক দৈন্য দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন—আর তাহাও অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ং উপযাচক হইয়া।

কাজের ঝঞ্ঝাট হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাইয়াও আশ্রিতবৎসল মহাপুরুষ তাঁহার উপর সর্ববিষয়ে নির্ভরকারী ব্যক্তিগণের ভাবনা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শ্রীভগবানে নির্ভর করিয়া তাহারা যাহাতে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সক্ষম হয় তজ্জন্য শেষের দুইএক বৎসর-কাল তাঁহাকে বিশেষ যত্নশীল দেখিতে পাই। একজনকে [১] বলিয়া-ছিলেন, 'আমার শরীর কি চিরদিন থাকবে? নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও।...যদি কখনো খালি জপধ্যান করবার ইচ্ছা হয়, সব ফেলে তাই করবে। সাধনভজন না করলে ঠাকুরকে বোঝা কখনো যাবে না।' পত্রেও এই ভাবের কথা কাহাকেও কাহাকেও লিখিয়াছেন, দেখিতে পাই।

আর একজন [২] তাঁহাকে ব্যক্তিগত কোন সাধারণ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তর দেন, 'দেখ বাবা, তোমাদের ছোটখাট সকল বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্যে আর গাইড (চালনা) করবার জন্যে চিরকাল কি বেঁচে থাকব? আমরা কি অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে এসেচি? তোমরা সাধু হয়েচ, তাঁর মুখ চেয়ে এসেচ, (নিজের পরিধেয় গেরুয়ার আঁচল ধরিয়া দেখাইয়া) সমান অধিকার দিয়ে দিয়েচি। সাধু নিজের পায়ে স্বাধীনভাবে দাঁড়াবে, ভুল হয় হাত পুড়িয়ে শিখবে—তিনি ছাড়া আর কেউ সামনে থাকবে না। তা হলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।' [প্র]

---

১ স্বামী নির্লেপানন্দ।

২ স্বামী পরমেশানন্দ।

কতখানি আন্তরিকতার সহিত তাঁহার মুখাপেক্ষী ব্যক্তিগণকে স্বাবলম্বী করিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন, পত্রের মাধ্যমে তাহাদের উপর শতধারে বর্ষিত আশীর্বাণী হইতেও কিয়ৎপরিমাণে তাহা উপলব্ধি করা যায়। আশীর্বাদ তিনি আজীবন করিয়াছেন, কিন্তু শেষের দিকের পত্রগুলিতে সেই আশীর্বাদের স্বুর বড় করুণ—যেন শেষবারের মত ভগবৎপাদপদ্মে তাঁহাদিগকে সঁপিয়া দিতেছেন।

স্বামী কেশবানন্দকে লিখিয়াছিলেন: 'বৃদ্ধি হইয়াছি, সেজন্য সকল কাজকর্ম হইতেই অবসর লইতে হইয়াছে। তুমি শ্রীশ্রীমাকে যখন সব দিয়াছ তখন যাহা ভাল হয় তাহার ব্যবস্থা তিনিই করিবেন। তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি যেমন করান তাহাই করিয়া যাও। তোমার মনোবাঞ্ছা, এজন্মে না হউক, পরজন্মে তিনি পূর্ণ করিবেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তোমার মনবুদ্ধি সব তাঁহার পাদপদ্মে অর্পিত হউক এবং মন শান্তিতে পুর্ণ থাকুক।'

কেহ কেহ হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যাইবে বলিয়া তাঁহার অনুমতি চাহিয়া ৺কাশী হইতে পত্র দিয়াছে। তদুত্তরে লিখিলেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের সকল বাসনা পুর্ণ করুন।'

হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ স্বর্গাশ্রমে যাইয়া কেহ কেহ তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তন্মধ্যে একজন জপতপ বিশেষ করিতে পারে না, একটু আধটু গীতা ও কথামৃত পড়ে এবং অনেক সময়েই নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকে। পত্রে সেই কথাটি অবগত হইয়াই তিনি লিখিলেন: 'তুমি নির্জনে থাকিয়া শ্রীভগবানের স্মরণমনন এবং শাস্ত্রাদি পাঠ করিতেছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে তোমার শুদ্ধা ভক্তি হউক এবং তাঁহার স্মরণমনন ও ধ্যানে শান্তি ও আনন্দের দিকে অগ্রসর হও।'

* * *

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী। প্রত্যুষে এক হিন্দুস্থানী ভিখারী বালক সারঙ্গের সহিত মধুরকণ্ঠে গাহিতেছিল, 'আনন্দ ভৈ আজু অযোধ্যাজীমে।' ছাদে পায়চারি করিতে করিতে শরৎ মহারাজ গুন্‌গুন করিয়া গাহিতে লাগিলেন, 'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।' ভিখারী বালকের গানে উদ্দীপনা হইয়াছে।

কার্যকরী সমিতির সভ্যগণের আগ্রহবশতঃ পূজনীয় শরৎ মহারাজের জন্মতিথি-পূজা কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে না হইয়া বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হইল। ইহাই তাঁহার শেষ জন্মোৎসব যাহাতে তিনি সশরীরে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ দিন (৯ই জানুয়ারী) বেলা দশটার সময় তিনি মোটর গাড়ীতে মঠে চলিয়া যান এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

স্বামিজী ও ঠাকুরের জন্মোৎসবেও তিনি মঠে গিয়াছিলেন। স্বামিজীর জন্মতিথি-পূজার রাত্রে ছয় ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ নবীন সন্নাসিগণের জন্য নামের একটি তালিকা পড়িতে আরম্ভ করিলে তিনি কহিলেন, 'আমি ওদের নামরূপের পারে ফেলে দিয়েচি, নামফাম তোমরা দাও।'

২৪শে মার্চ তারিখে একটি মেয়েকে তিনি লিখিয়াছেন: 'আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা এবং উৎসবের জন্য বেলুড় মঠে ১২।১৩ দিন ছিলাম।…শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে এবারে অন্যবারের অপেক্ষা অধিক লোক হইয়াছিল। ২০।২৫ হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছিল, এবং হাতে হাতে কত লোককে যে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। সকল বিষয়ের বেশ সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল।'

শান্তমধুর দিনগুলি একভাবেই কাটিয়া যাইতেছিল। সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত জপধ্যানে অতিবাহিত হইতেছে। বৈকালে চিঠিপত্রের জবাব দিতেছেন ও অতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্তিগত হিসাবপত্র লিখিয়া

রাখিতেছেন। নৈশ আসরে সকলের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা ও বাক্যালাপ করিতেছেন। তথাপি একটা আসন্ন ব্যাপারের প্রস্তুতিও যে চলিয়াছে, সময়ে সময়ে কাজে ও কথায় তাহারও আভাস দিয়া যাইতেছেন। শরণাগত ভক্তদের ব্যক্তিগত অর্থ ও কাগজপত্র, যাহা তাঁহার নিকট গচ্ছিত ছিল, তাহা একে একে বুঝাইয়া ফেরৎ দিতেছিলেন, আর কাহাকেও বা বলিতেছিলেন, 'কাজকর্ম তো শেষ হল, এরপর কাশী গিয়ে থাকব।' গুন্‌গুন করিয়া আপন মনে বুদ্ধচরিতের এই গানটি কখন কখন গাহিতেন, 'আমার এই সাধের বীণা যত্নে গাঁথা তারের হার।'

৩রা মে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর তৎকালীন পূজক স্বামী তত্ত্বানন্দ বসন্তরোগে দেহরক্ষা করেন। রোগের সূচনায় জনৈক সাধু শরৎ মহারাজকে বেলুড় মঠে লইয়া যাইতে আসিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'এতগুলো ছেলেকে ফেলে আমি আমার তথাকথিত মূল্যবান জীবন নিয়ে মঠে পালিয়ে যেতে চাই না; মা যা করবার করবেন।' তাঁহার অজ্ঞাতসারে তত্ত্বানন্দতে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইলে প্রেরণকারী সাধুকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার বসন্ত হলে আমাকেও পাঠিয়ো কিন্তু।'

ইহার কিছুদিন পরে, ২রা জুলাই কোয়ালপাড়ায় স্বামী কেশবানন্দের ও ৩রা জুলাই বাঁকুড়ায় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবনান্ত হয়। দুইটি সংবাদেই তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করিয়াছিলেন।

উদ্বোধনে একজনের ভীষণ ম্যালেরিয়া জর হইয়াছে এবং ক্রমাগত কাসিতে তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে। শরৎ মহারাজ তাঁহার স্থূল দেহ লইয়া একটি হাঁটু রোগীর বিছানার উপর রাখিয়া, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, 'ঠাকুর রয়েচেন, মা আছেন, ভয় কিরে।' বেয়াড়া রোগী, যাহার অধৈর্য স্বভাবের জন্য

কাছে যাইতে কেহই সাহস পাইতেছিল না, তৎক্ষণাৎ শান্ত হইয়া গেল, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিল।

ট্রাষ্টীগণের সভায় যোগ দিবার জন্য শরৎ মহারাজ আগষ্টের প্রারম্ভে একদিন বেলুড়মঠে গমন করিলেন এবং মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে তাঁহার সহিত একত্র ভোজন ও বিশ্রম্ভালাপ করিয়া, এবং প্রীতি-প্রফুল্লভাবে অন্যান্য সকলের সহিত কথা কহিয়া, নিজাবাসে ফিরিয়া আসিলেন। মঠ হইতে চলিয়া আসিবার সময় বলিয়াছিলেন, 'দেখুন মহাপুরুষ, শরীরটা বড়ই খারাপ হয়ে গেচে, বোধ হয় আর বেশীদিন টেকবে না।'

৬ই আগষ্ট, শনিবার। এইদিন সকালে স্নানাদি সারিয়া শরৎ মহারাজ নিত্য যেমন জপধ্যানে বসিতেন তেমনি বসিলেন, কিন্তু অন্যদিন অপেক্ষা একটু আগেই আসন ছাড়িয়া উঠিলেন ও ঠাকুরঘরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলেন। তখন মধ্যাহ্ন-ভোগ উঠিতেছিল। ভোগ উঠিতেছে দেখিলে তিনি সত্বর বাহির হইয়া আসিতেন, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও আজ যেন তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতে পারিতেছিলেন না। একবার দরজা অবধি আসেন, আবার ফিরিয়া গিয়া মায়ের খাটের পাশে দাঁড়ান ও প্রণাম করেন। এইভাবে বিশপঁচিশ মিনিট কাটাইয়া যখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন তখন তাঁহার মুখে এক অপূর্ব শান্তশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া তিনি সহস্তে সদ্যঃপ্রাপ্ত একখানি চিঠির উত্তর লিখিলেন। সেই লেখার শেষ কথাটি ছিল : 'শরণাগতকে তিনি রক্ষা করিবেন—করিবেন—করিবেন।' ইহাই তাঁহার শ্রীহস্ত-লিখিত শেষ অভয়-বাণী।

সন্ধ্যার আরতি ও স্তোত্রপাঠ হইয়া যাওয়ার পর তিনি যুক্তকরে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। তারপর একবার কলঘরে গেলেন

ও ফিরিয়া আসিয়া গামছায় মুখ-হাত-পা মুছিয়া ধীরে ধীরে খাটের উপরে বসিলেন। এমন সময়ে স্বামী হরিপ্রেমানন্দ একটা খরচের হিসাব ও উদ্বৃত্ত টাকা লইয়া আসিয়া তাঁহার পাশে রাখিয়া দিলেন। টাকা ও হিসাবটি দেরাজে রাখিয়া দিবার জন্য তিনি ডান হাত বাড়াইলেন, কিন্তু টাকা বা হিসাব কিছুই ধরিতে পারিলেন না। পুনরায় ধরিতে চেষ্টা করিয়াও না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ডান হাত দিয়ে ধরতে পাচ্ছি না কেন?' সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়া গেল ও কপাল দিয়া ঘাম আরম্ভ হইল। জনৈক সেবককে কহিলেন, 'ঐ তেল দুফোঁটা তালুতে দাও। একমাত্রা মকরধ্বজ তৈরি কর। কাউকে কিছু বোলো না—এখনি ভাল হয়ে নীচে যাচ্ছি।' শেষ কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খাটের উপরে শুইয়া পড়িলেন। তখন রাত্রি সাড়ে আটটা।

দেখিতে দেখিতে ডাক্তারে ও কবিরাজে ক্ষুদ্র বাড়ীখানি ভরিয়া গেল। ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ, ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ, কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, মহারাজের সন্ন্যাসরোগ হইয়াছে।

বেলুড় মঠে টেলিফোন করা হইল। মঠ ও কলিকাতার অন্যান্য কেন্দ্র হইতে সাধুরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থ ভক্তেরাও অনেকে আসিলেন। মহারাজের মাথায় বরফ দেওয়া সুরু হইল এবং কবিরাজী মতে চিকিৎসা চলিতে লাগিল। বাগ্‌যন্ত্র অসাড় হইয়া গেলেও তাঁহার অন্তঃসংজ্ঞা বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি ঔষধ খাইতে পারিয়াছেন, এবং বাঁ হাতে কুশী ধরিয়া দুইদিন ঠাকুরের চরণামৃত নিজেই পান করিয়াছেন।

রোগের প্রকোপ কিন্তু বাড়িয়াই চলিল। কবিরাজী ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হইতে লাগিল। অনুরক্ত ভক্তগণ

দূরদূরান্তর হইতে মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন।

দূরবর্তী স্থান হইতে যাঁহারা এই সময়ে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে তাঁহার এক শিষ্যের আনুপূর্বিক কাহিনী এখানে বিবৃত করিতেছি। বাহিরে সংজ্ঞাহীন প্রতীয়মান হইলেও অন্তরে তিনি যে পূর্ণপ্রজ্ঞ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, এই বিবরণ হইতে সহজেই তাহা উপলব্ধি হইবে। শিষ্যটি [৩] বলিয়াছেন: "৺কাশীতে একদিন [১৯২৫ খ্রীঃ] আমি মহারাজের পা টিপিয়া দিতেছিলাম, তাঁহার শরীর তেমন সুস্থ ছিল না। এই কাজে আমি অনভ্যস্ত ছিলাম, এবং মহারাজেরও বোধ হয় কষ্ট হইতেছিল, তাই তিনি ধমক দিয়া উঠেন। ইহাতে আমার অভিমান হওয়ায় তাঁহার কাছে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেই। মহারাজ ইহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠান ও আদর করিয়া অভিমান জল করিয়া দেন। হাত-পা টিপিতে কিন্তু তিনি আর বলিলেন না, বালকবুদ্ধিবশতঃ আমিও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম যে, নিজে তিনি না বলিলে কখনও ঐকাজ করিতে যাইব না। কিছুকাল পরে—মহারাজ তখন কলিকাতায় আছেন—তাঁহার সহিত দেখা ও তাঁহার সেবা করিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয় ও সেকথা তাঁহাকে লিখিয়া জানাই। তিনি উত্তর দেন, 'দেখা তোমার সহিত আমার হইবেই, এবং তোমার মনের সাধও মিটিবে।' দেখার সুযোগ কিন্তু অনেকদিনের মধ্যেও হইয়া উঠিল না।

"অবশেষে তাঁহার অসুখের সংবাদ পাইয়া আলমোড়া হইতে, মিসেস্ কুকের অর্থানুকূল্যে, কলিকাতায় যাই। মহারাজের ঘরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিছানায় বসিবামাত্র, যেন তড়িদাহত হইয়া,

---

৩ স্বামী বিশ্বরূপানন্দ।

আমার দিকে চাহিলেন। চারিচক্ষের মিলন হইল। তাহার পরে নিজের বাঁ হাত দিয়া আমার ডান হাতটি টানিয়া লইয়া তাহা টিপিতে স্বরু করিলেন। কাণ্ড দেখিয়া আমি তো হতভম্ব হইয়া গিয়াছি। সাতু মহারাজ কহিলেন, 'উনি তোমাকে ওঁর হাত-পা টিপে দিতে বলচেন, এ তারই ইঙ্গিত।' আমি তখন ধীরে ধীরে তাঁহার পা, হাত ইত্যাদি টিপিয়া দিতে লাগিলাম। ইহা তাঁহার মহাসমাধির মাত্র তুইদিন আগেকার ঘটনা।"

স্বামী নির্মলানন্দ এই সময়ে মালাবারে ছিলেন, সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র শরৎ মহারাজকে দেখিতে ছুটিলেন। দক্ষিণ ভারত তখন বন্যার জলে ভাসিয়াছে, রেল লাইন ধুইয়া গিয়াছে। বোম্বাই হইয়া ক্রমাগত ছয়দিন ঘোরাপথে চলিয়া যেদিন তিনি কলিকাতায় পৌছিলেন সেদিন ১৮ই আগষ্ট, ১৩৩৪ সালের ২রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার। তাঁহার দেখাও হইল, মহামিলনের মঙ্গল-মুহূর্তও আগাইয়া আসিল।

রাত্রি ২টা ৩৪ মিনিট সময়ে, রোগের আক্রমণের ত্রয়োদশ দিবসে, সারদা-গতপ্রাণ শ্রীসারদানন্দ "মহারাত্রির নিবিড় অঞ্চলাবরণে মহাসমাধিতে স্বখশয়ন লাভ" করিলেন। ঠিক সেই সময়ে বেলুড় মঠে নিজগৃহে থাকিয়া মহাপুরুষজী শুনিতে পাইলেন, চিরপরিচিত স্নিগ্ধকণ্ঠে শরৎ মহারাজ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, 'দাদা, কাশী চল্লুম।'

পরিশিষ্ট

স্বামী সারদানন্দের কোষ্ঠী

জন্ম-শকাব্দাদি ১৭৮৭।৮।৮।২৯।৩০।২৪।৭।৩০ শনিবার

৯ই পৌষ ১২৭২ সাল শনিবার দং ২৯।৩০।২৪।৭।৩০ অর্থাৎ সন্ধ্যা ৬টা ৩২ মিঃ

২৩শে ডিসেম্বর ১৮৬৫ খ্রীঃ

শুক্লা ষষ্ঠী, কুম্ভরাশি, শতভিষা নক্ষত্র, মিথুন লগ্ন।

বিং—রাহু ৭।৭।৮ অঃ—রাহু ৫।৮।৯

রবি ৮।৯।৪৯
চন্দ্র ১০।১৪।২২
মঙ্গল ৭।২৭।২২
বুধ ৮।৯।৪০ (বঃ)
বৃহস্পতি ৮।১৬।৩৪
শুক্র ৭।২৪।২০
শনি ৬।১৭।৩৭
রাহু ৫।২৫।১৪
হার্শেল ২।৯।৫৯ (বঃ)
নেপচুন ১১।১৫।৫১
লগ্ন ২।২৬।২২
দশম ১১।১৯।২
অয়নাংশ ২১°৫৮´
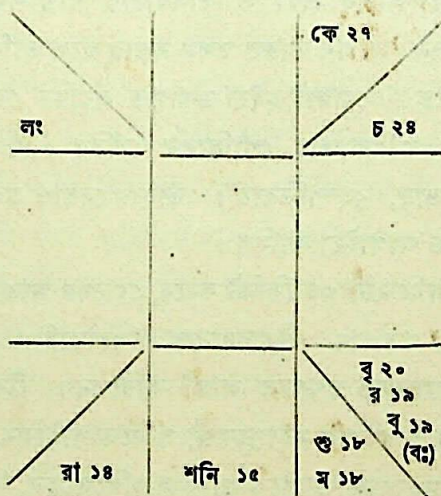
স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মিথুন লগ্ন ও কুম্ভ রাশি। তাঁহার জন্ম সময়ে চতুর্থে রাহু, পঞ্চমে শনি, ষষ্ঠে শুক্র মঙ্গল, সপ্তমে রবি বুধ বৃহস্পতি, নবমে চন্দ্র এবং দশমে কেতু অবস্থিত ছিল। লগ্নপতি বুধ দুইটি সাত্ত্বিক প্রকৃতির গ্রহ রবি ও বৃহস্পতির সহিত যুক্ত এবং শনির দ্বারা দৃষ্ট। রবি গাম্ভীর্য, দৃঢ়তা, চরিত্রবল, কর্মতৎপরতা এবং বৃহস্পতি উদারতা, প্রজ্ঞা, ক্ষমা, গুরুকৃপা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কারক। উচ্চস্থ ও পঞ্চমভাবগত শনি বলবান ও শুভফলপ্রদ, ইহা ত্যাগ, সংযম, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠা, পরিশ্রমশীলতা

ইত্যাদির কারক। লগ্নপতি বুধ এই তিনটি গ্রহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকায় স্বামী সারদানন্দ এই সকল সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। জন্মলগ্ন আকৃতি ও প্রকৃতি, তৃতীয়ভাব ধৈর্য, বল, বীর্য ও সাহস এবং চতুর্থভাব মনোবৃত্তি নির্দেশ করে। এই তিনটি ভাবের অধিপতি রবি ও বুধ বৃহস্পতির সহিত যুক্ত, পাঁচবর্গে বৃহস্পতির বর্গগত, এবং লগ্ন ও তৃতীয়ভাব বৃহস্পতির দ্বারা দৃষ্ট। এই কারণে তাঁহার আকৃতি, প্রকৃতি ও মনোবৃত্তির উপর বৃহস্পতির বিশেষ প্রভাব দৃষ্ট হয়। এই প্রভাব হেতু তিনি পরমহংসদেবের ন্যায় গুরু ও তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন এবং ভক্তিপরায়ণ, সংযতচিত্ত, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন।

অধ্যক্ষের পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বামী সারদানন্দ একাদিক্রমে প্রায় ত্রিশ বৎসর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক ছিলেন। তিনি কতটা গুরুভার বহন করিতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁহার কোলে বসিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত উক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটির সংগঠন ও পরিচালনায় তিনি যে কতটা গুরুভার বহনের উপযুক্ত তাহার পরিচয় দিয়াছেন ও অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্মকুণ্ডলীতে লগ্নের দশমস্থ কেতু দশমপতি বৃহস্পতির দ্বারা ত্রিপাদ-দৃষ্ট এবং চন্দ্রস্থিত কুম্ভরাশির দশমস্থ পাঁচবর্গে স্ববর্গগত শুভযুক্ত বলবান মঙ্গল তাঁহার কর্মশক্তির পরিচায়ক। রাশিপতি শনি উচ্চস্থ থাকায় ধর্মস্থানগত চন্দ্র শুভফলদাতা। চন্দ্রের ত্রিকোণে শনি এবং কেন্দ্রে যোগকারক শুক্র ও মঙ্গল একত্র যুক্ত থাকায় ধর্ম ও কর্মপথে তাঁহার প্রভূত উন্নতি নির্দেশ করিতেছে।

চতুর্থস্থান মাতৃস্থান। লগ্ন ও চতুর্থপতি বুধ কেন্দ্রগত, শুভযুক্ত ও শুভবর্গগত এবং বলবান রাহু চতুর্থে থাকায় তাঁহার মাতৃভক্তি অতুলনীয়। তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মানসপুত্র ছিলেন। মায়ের ও তাঁহার পরিজনবর্গের তত্ত্বাবধান, মায়ের জন্য বাসস্থান নির্মাণ ও স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা তাঁহার মাতৃভক্তির নিদর্শন।

বৃশ্চিকরাশিগত ষষ্ঠস্থ শুক্র ও মঙ্গল তাঁহার মূত্রসংক্রান্ত ব্যাধি ও সন্ন্যাস-পীড়ার কারক।

১লা ভাদ্র (বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে ২রা ভাদ্র) ১৩৩৪ সাল, ১৮ই আগষ্ট ১৯২৭ খ্রীঃ বৃহস্পতিবার রাত্রি ২টা ৩৪ মিঃ সময়ে কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে (জন্মাষ্টমীর পূর্বদিন) মেষরাশি, ভরণীনক্ষত্রে, বৃদ্ধিযোগে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৺কাশীধামে শেষবার

৩১শে জানুয়ারী—রাত্রি ৮৷৷ টা

একঘর লোক বসিয়া—পূজনীয় শরৎ মহারাজ তামাক খাইতেছেন।

বি—। ঠাকুর যে বলেচেন, 'মন মুখ এক করা'—তার অর্থ কি?

মহারাজ। মুখে যা বলচ মনে মনে তাই চিন্তা করবে।

বি—। মুখে যা বলা হয়, মনেও তো তাই চিন্তা করা হয়।

উঃ—তা আর হয় কৈ? মুখে হরিনাম করি, মুখে বলি, 'আমি তোমার দাস, তুমি প্রভু, তোমার জন্যে সব ছেড়েচি, তোমায় ডাকচি—দেখা দাও।' আর মনে অন্য কুচিন্তা করচি। তা হলে হবে না। হরি মুখে বলবে, আর মনেও চিন্তা করবে। চৈতন্যদেব বলতেন, 'সে-ই সেই', অর্থাৎ নামই ভগবান—অভিন্ন।

দী—। আমাদের উপর ঠাকুর-স্বামিজীর এত কৃপা রয়েচে, আপনাদেরও আশীর্বাদ রয়েচে, কিন্তু আমাদের সকলের সেরূপ কিছু হচ্চে বলে তো মনে হয় না।

উঃ—কি জান, কৃপা আশীর্বাদ তো রয়েচে, তবে এতকালের সংস্কার কি একদিনে ক্ষয় হয়ে যাবে?—না ধীরে ধীরে হবে? আর হচ্চে এই যে, ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেচ ভগবানের জন্যে, এরূপ ধীরে ধীরে হবে, হচ্চে। তাঁদের তো খুবই কৃপা রয়েচে, নিজেও খুব সাধনভজনে লেগে যাও দেখি। কিছু উপলব্ধি করতে হলে নিজেকে খাটতে হবে।

বি—। ধ্যানের সময় ইষ্টমূর্তির চিন্তা করচি, যদি অন্য মূর্তি আসে তা হলে কি করব?

উঃ—তা হলে ইষ্টই সেইরূপে এসেচেন—এই চিন্তা করবে। পরে সেটা চলে গিয়ে আবার ইষ্টমূর্তি আসে।

মা—। সব মূর্তি এলেই কি তাই করব?

উঃ—না। মহাপুরুষের মূর্তি এলে করবে।

মা—। আর যদি সাধারণ লোকের মূর্তি আসে?

উঃ—তাড়িয়ে দেবে। জোর করে ইষ্টমূর্তিকেই নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। জুতার দোকান এলে কি তার ধ্যান করবি?

স—। ঠাকুর যে বলেচেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যথা ইচ্ছা তথা যা'—তার মানে কি?

উঃ—'যথা ইচ্ছা তথা যা' তো নয়, 'যা ইচ্ছা তাই কর।' তার মানে, জ্ঞান হয়ে গেলে তারে দিয়ে তো আর বদমাইসি হয় না। যার বিবেকবৈরাগ্য দিয়ে, ভালবাসা প্রীতি, শুদ্ধমন, শুদ্ধচিত্ত দিয়ে ভগবান লাভ হয়েচে,—যার জ্ঞান হয়েচে, তাকে দিয়ে কি আর খারাপ কাজ হবে? কাজেই তখন সে যাই করুক না কেন, ভালই হবে।

স—। সে ঈশ্বরদর্শন হলে?

উঃ—তা বৈকি। ঈশ্বরদর্শন হলে—জ্ঞান হলে।

রা—। সাকার উপাসনায় কি অদ্বৈতজ্ঞান হয়?

উঃ—কেন হবে না? সাকার উপাসনাতেও পরে অদ্বৈতজ্ঞান হয়।

বি—। সর্বভূতে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়, না কিছুই থাকে না?

উঃ—উভয়রূপই হয়। ওসব হলে বুঝতে পারবে। কিছু কর, তখন বুঝবে—অনুভব হবে। শুধু লম্বা লম্বা কথা শিখে কি হবে? কিছুদিন খুব জপধ্যানে বসে পড়। তা না হলে সেই পাঞ্জাবী সাধুর মত 'তুস্‌সি তো স্বরূপ হ্যায়।' আর ডালরুটি উড়াও।...

হ—। ঈশ্বরকোটী কি রকম?—কাকে বলে?

উঃ—আমি তো ঈশ্বরকোটী নই বাবা যে বলব।

হ—। না, শাস্ত্রে কি বলে?

উঃ—অধিকারিক পুরুষরা কোন কাজের জন্যে আসেন, জ্ঞান নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন—যেমন, শুকদেব, নারদাদি ঋষি। এই তো বেদান্তে বলে।

হ—। তা হলে জীবকোটী আর ঈশ্বরকোটীর প্রভেদ কি?

উঃ—জীবকে খেটে সব করতে হয়। আর সে অদ্বৈতে গেলে ফিরে আসতে পারে না—সাধারণ জীব। আর ঈশ্বরকোটী—অবতারের সঙ্গে, জ্ঞান নিয়েই, মায়া আশ্রয় করে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা পরম অবস্থায় পৌঁছেও ফিরে আসতে পারেন।

হ—। অবতার-পুরুষ কিরূপ? তিনি কি জ্ঞানে সর্বদাই থাকেন?

উঃ—সর্বদাই তিনি জ্ঞানে অবস্থান করেন। তবে মাঝে মাঝে মায়া আশ্রয় করেন, ইচ্ছা করে।

হ—। তবে তাঁর সাধনভজন কি রকম করা?

উঃ—মায়া আশ্রয় করে সাধারণ জীবের মত অভাব বোধ করা, সেইজন্যেই সাধনভজন ইত্যাদি। অন্য সব কিরূপ জান? নুনের পুতুল সমুদ্র দেখতে গেল। ঠাকুর বলতেন, সমুদ্রের হাওয়া লেগেই কতক গলে গেল। কেউ একটু এগিয়ে গিয়ে ছুঁল ও গলে এক হয়ে গেল। কেউ বা আরও এগিয়ে দেখতে লাগল। নারদাদি সব জ্ঞানী এক গণ্ডূষ পান করলেন। শুকদেব, যিনি জ্ঞান নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন, তিনি আর একটু—এই রকম আর কি।

ক—। ওসব কি শক্তির তারতম্য, কিম্বা জ্ঞানের তারতম্য?

উঃ—ওসব শক্তির তারতম্য।...এতটা মহাপ্রাণ—নিজে শুধু ভোগ না করে, আরও দশজনকে ডেকে সেটি দেবার ইচ্ছা, এতটা ত্যাগ, এতটা ধৈর্য—এসব শক্তির তারতম্য।

বি—। তোতাপুরীর কি অদ্বৈতজ্ঞান হয়েছিল?

উঃ—(খানিক চুপ থাকিয়া) ওসব কথা কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করচিস? আমি কি তোতাপুরী ছিলুম যে জানব? ওসব বাবা, বইয়ে রয়েচে, বই পড়লেই তো পাবে।

বি—। না—না, মহারাজ, আমি জিজ্ঞাসা করচি এইজন্যে যে,

আপনি বল্লেন কিনা ঈশ্বরকোটী বা অবতাররাই নির্বিকল্প সমাধি থেকে ফিরে আসেন।

উঃ—কেন? জীবন্মুক্তদের কিরূপ হচ্চে? জীবন্মুক্তরাও তো জ্ঞান লাভ করে বেঁচে রয়েচে। ওসব অনুভবের জিনিষ, শুধু জিজ্ঞাসাতে কিছু হবে না। অনুভূতি না হলে বুঝবার যো নাই। খুব সাধন-ভজন কর দেখি, বেগার করলে হবে না।

রা—। যে কাজের ঠেলা ঘাড়ে দিয়েচেন, ওতে কি করে কে কি করে?

উঃ—কাজের ঠেলা বৈকি। কাজ না থাকলে যেটুকু করচ ওটুকুও করতে পারবে না—তা জান? যাও না, কাজ ছেড়ে দিয়ে ছত্রে খাও, সাধনভজন কর, দেখি কেমন পার। একদিন কর, দুদিন কর, পরদিন কেবল গুলতান খুঁজবে। স্বামিজী এই যে কাজ দিয়ে গেচেন—সেবা, নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা, এ নূতন পথ দেখিয়ে গেলেন, সোজা পথ দেখিয়ে গেলেন। তা পোষায় না। এখন নিষ্কাম কর্ম হচ্চে, ছেড়ে অন্য করতে গেলে সকাম এসে যাবে। ফলে এই দাঁড়াবে। লোকের সংসারে খেটে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে। যাও না সংসারে, মজা পাবে এখন। কত লোক শুধু বাপ-মার সেবাতেই অস্থির হয়ে যাচ্চে। ওঁদের শুধু খেতে দাও, বসিয়ে খাওয়াও—ওঁরা সাধনভজন করবেন। সাধনভজনে আর ঠাকুর-স্বামিজীর কাজে কি কিছু কমবেশী আছে? এতে থেকে যতটা করবার ইচ্ছা হচ্চে, কাজ ছেড়ে দিলে ততটা আর থাকবে না। বাধা পেলে শক্তির স্ফুরণ হয়। বাড়ীতে যতদিন থাকে, মনে সাধু হবার ইচ্ছা কতই প্রবল হয় ও সাধু হয়ে কত কি করব সঙ্কল্প থাকে। নানা কারণে—পড়াশোনা, বাপ-মার কথা, বিবাহের ব্যাপার ইত্যাদিতে বাধা পায়, তাতে শক্তির বৃদ্ধি হয়। আর যেই সেসব ছেড়ে এল, অমনি মনে

ক্ষরলে, 'কেল্লা মার দিয়া!'—আর কিছু নাই, সে struggle (সংগ্রাম) আর নাই। যেমন, জলের বাঁধ। বাঁধ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই কেবল জলটা বেরুবার চেষ্টা করচে। আর যেই বেরিয়ে গেল, অমনি ছড়িয়ে গেল। চারধারে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত জোর নষ্ট হল।

ক—। আচ্ছা মহারাজ, ধাক্কা খেয়ে খেয়ে তো আবার থেমেও যেতে পারে—জোরহীন হয়েও যেতে পারে?

উঃ—হ্যাঁ, তাও হয় বটে। তবে সে কম। সে কেবল চাচ্চে বের হতে, ওতেই একটা সুবিধা হয়ে যায়। যা মন্ত্র পেয়েচ তাই কর দেখি—তা কেউ করবে না। গুরু যা বলেচেন, কটা লোক তাই করে? খুব জোর আধঘণ্টা বসা, তাও বেশ স্থির হয়ে নয়। বেগার বসল—অমনি মালা ঘুরাল আর উঠল। মন্ত্র নিয়ে কে ঠিকঠিক করচে? তা করা নাই, অমনি চল্ল ব্রহ্মচর্য নিতে—'ব্রহ্মচর্যটা নিয়ে দেখি কি হয়।' 'ও বাবা, এতেও তো কিছু হল না, চল সন্ন্যাসটা নেওয়া যাক।' সন্ন্যাস ভিতরের জিনিষ, আর তা নইলে হুজুক। নিজেকে সন্ন্যাসের উপযুক্ত করতে হবে। কটা লোক ভাবের সহিত কাজ করচে? কুলির মত খাটা! যখন 'নারায়ণ'দের সেবা করচ, তখন নিজ ইষ্টই তাঁদের ভিতর রয়েচেন—এরূপ ভাবতে হবে।

বি—। ইষ্ট ও সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটাও দেখা যায়?

উঃ—ইষ্টই তিনি হয়েচেন—এইরূপ। ইষ্টই তাঁর ভিতর রয়েচেন—এইরূপ। ঠাকুর দেখতেন কি রকম? যখন যোগীন মহারাজের মা এসে ঠাকুরের কাছে কাঁদতে লাগলেন,—'যোগীন আমার ঘরবাড়ী ছেড়ে সাধু হয়ে গেচে!'—তখন ঠাকুর তাঁর ভিতর জগদম্বা মাকে দেখে হাসতেন আর বলতেন, 'মা! তুই এমনি কাঁদচিস!' এক বেশ্যা এসেছিল, তার মধ্যেও দেখে বলেছিলেন, 'মা, তুই ওর ভিতরেও রয়েচিস!' (একটু থামিয়া) খুব কর, খুব কর, একটু খাট।

ক—। ঈশ্বরকে তো দেখতে পাওয়া যায় না। দেখতে না পেলে তাঁকে কেমন করে ভালবাসা যায়? যাঁকে দেখা যায় না, আছেন কি নাই বুঝতে পারা যায় না, তাঁকে কেমন করে ভালবাসা যাবে?

উঃ—গুরু যা বলে দিয়েচেন, সেরূপ করে যাও। তাঁকে পাবার জন্যে যেমন যেমন আদেশ করেচেন, সেইমত চলতে পারলে পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। (বি—র প্রতি) গুরু যা বলেচেন, তা কি কর? তার অর্ধেকেরও কম লোকে করে কিনা কে জানে। করলে ফল পাবেই পাবে। পুরশ্চরণ একটা আছে জান?—মন্ত্রের পুরশ্চরণ। একলক্ষ করে জপ করতে করতে মন্ত্রের চৈতন্য হয়। আর সেরকম হলে, মন্ত্র একবার উচ্চারণ করলেই চিত্ত শুদ্ধ হয়।

বি—। প্রত্যহ একলক্ষ করে জপ করলে মন্ত্রের চৈতন্য হয়, পুরশ্চরণ হয়, না—কি?

উঃ—তা করলে মন্দ কি। একলক্ষ পার, দশহাজার পার, কর দেখি। রোজ বড় মন্ত্র হয় তো পাঁচহাজার কর দেখি।…ধীরে ধীরে বাড়াও, তা হলেই হবে। তা তো কেউ করবে না, কেবল এটা ওটা করা। খাবার সময় হয়, শোবার সময় হয়, তাঁকে ডাকবার বেলা কেউ নাই!

২রা ফেব্রুয়ারী

একঘর লোক বসিয়া। কা— আসিয়া প্রণাম করিলেন।

মহারাজ। কি পড়চ?

কা—। অধ্যাত্ম রামায়ণ।

মহারাজ। বাঃ, বেশ বই। ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। ওর অনেক সুখ্যাতি করতেন। অনেক স্থান মুখস্থ করে রেখেছিলেন। খুব স্মরণশক্তি ছিল। একবার পড়লেই বা শুনলেই মনে থাকত। শ্রুতিধর ছিলেন—প্রথম শ্রুতিধর। আর স্বামিজী দ্বিতীয় শ্রুতিধর।

দুইবার পড়লে বা শুনলে মনে থাকত, আর বহুকাল মনে থাকত।

বি—। মহারাজ, শ্রুতিধর মানে কি? মন কি খুব সূক্ষ্মভাবে গঠিত, না—কি?

উঃ—হ্যাঁ, সূক্ষ্ম তো বটেই। শ্রুতিধর মনটাকে যেটাতে দেবে, সেইটাতেই লেগে যাবে। যা পড়বে বা শুনবে, একেবারেই তা স্মরণ করে রেখে দেয়—খুব একাগ্র কিনা। শ্রুতিধর মনকে নিজের বশে রাখে। অন্য সকলের ছড়িয়ে আছে—সংসারে নানা জায়গায়। বিবাহ করলে, অর্ধেক স্ত্রীতে গেল; বাকি ছেলেপিলে বিষয়-আশয় ইত্যাদিতে গেল। শেষে বাকি থাকে কতটুকু। একাগ্র করা ভয়ানক ব্যাপার। ঠাকুর বলতেন, সরষের পুঁটলি—খুলে চারধারে ছড়িয়ে গেল। কতক কোথায় গেল, তার খোঁজ করাই মুস্কিল—কোথায় ছড়িয়ে পড়েচে! (খানিক চুপ থাকিয়া) সার যেটা, সেটাকে ধরতে হয়। সত্যবস্তু সার পদার্থ। ঠাকুর হরি মহারাজকে বলেছিলেন, 'বেদান্ত পড়চ, পড়। কিন্তু ওর সার তো এই যে, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য—না আর কিছু?' ঠাকুর শেষে বইসকল একত্র করে, বইয়ের একটা মালা তৈরি করে পরে নেচেছিলেন। তারপরে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। পত্র পেলে—'অমুক সন্দেশ, অমুক মিঠাই, অমুক অমুক জিনিষ নিয়ে আসবে।' সব কেনা হয়ে গেলে একবার মিলিয়ে দেখে নিলে। তারপর সে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চাই সত্য—সার জিনিষ।

৭ই ফেব্রুয়ারী

ছ—প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। সুধীর মহারাজ তাঁহাদের হাতে কয়েকজনের সন্ন্যাস সম্বন্ধে মতামত লিখিয়া পুজনীয় শরৎ মহারাজকে পত্র লিখিয়াছেন।

রাত্রি ৮টা না বাজিতেই বি—, রা—, ক—প্রভৃতি মহারাজের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় স্বামী শান্তানন্দ বি—কে

ডাকিয়া সিঁড়িতে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'তুমি খুব করে ধরবে, আর কি।' প্রায় সাড়ে আটটায় সান্ন্যাল মহাশয় মহারাজের ঘরের দ্বার খুলিলেন। মহারাজকে তামাক দিয়া কম্বল বিছানো হইলে সকলেই আসিয়া বসিলেন। মহারাজ শুইয়া আছেন।

বি—। মহারাজ, আপনি বলেছিলেন সন্ধ্যার পর সকলকে ডেকে নিয়ে আসতে—পত্র শোনাবেন।

মহারাজ। পত্র শুনে তোমরা খুসী হবে না। (দী—কে) আলো নিয়ে এসে পত্রখানা পড়ে শোনা।

দী— আলো আনিলেন ও পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে ঠেকিতেছেন, আর মহারাজ বলিতেছেন, 'দূ—র্, ওর হাতের লেখা পড়তে পারিস না বুঝি?' বি—র কথা যখন আসিল, মহারাজ কহিলেন, 'এর উপর এরূপ কেন?—কি করেচিস?'

বি—। জানি না। তবে বিদ্যাপীঠ থেকে চলে এসেচি বলে বোধ হয়।

মহারাজ। তবে আমি কি করব বাবা, এই তো দেখচ, তাদের ইচ্ছা নাই। আর ওরা না করেই বা করে কি। আমাদের পরে তো ওরাই সব দেখবে।

বি—। আপনারা কৃপা করে দিলেই দিতে পারেন।

মহারাজ। না বাপু, তা পারি না। ওরা যখন না করচে, তখন থাক্ না।

বি—। আপনি ইচ্ছা করলেই দিতে পারেন।

মহারাজ। না, তা পারি না। এই তো এখানে আছি, শুভানন্দ বা কালিকানন্দের অমতে কি কিছু করতে পারি?

রা—। আমার তো, মহারাজ, লিখেচেন—বয়স কম, আর মঠের অনেকে চিনে না।

মহারাজ। মঠের চেনা দরকার বৈকি। কেন চিনবে না?

বি—। আমাদের মঠে থাকতে দেন না।

মহারাজ। কেন দেবে না?

বি—। না মহারাজ, দেনই না। এই তো সব আছেন, জিজ্ঞাসা করুন।

মহারাজ। না, দেবে না কেন, দেবে।

শান্তানন্দ। আচ্ছা মহারাজ, যদি তিন বৎসর পরে সন্ন্যাস দেওয়া হবে, তবে তো এদের তিন্ বৎসর হয়েচে।

মহারাজ নিরুত্তর। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, 'ওরা তো আর না বলচে না, এক বৎসর পরে নিতে বলচে।'

বি—। এক বৎসর পরে সন্ন্যাস হবে, কিন্তু আপনাকে তো পাব না। আমার আপনার কাছ থেকে নেবার ইচ্ছা, তাই এতদিন নিই নি। প্রথম আমি ও নি— আপনার নিকট আসি, আপনিই 'মহারাজে'র নিকট দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্যের ঠিক করে দেন। তারপর কুয়ালালামপুর ও রেঙ্গুনে যাওয়ার কথা হল। 'মহারাজ' বল্লেন, 'কোথা যাবে ম্লেচ্ছদেশে—গুরুগঙ্গা ছেড়ে।' তিনি ভুবনেশ্বরে পাঠিয়ে দেন।...

মহারাজ। যাও, মঠে যাও। আমি মহাপুরুষকে লিখে দিচ্চি।

বি—। না, আমার আপনার নিকট নেবার ইচ্ছা।

মহারাজ। তা হলে থাক্, এখন হবে না।

বি—। আমার আপনার কাছ থেকেই নেবার ইচ্ছা। মহারাজের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় আপনি বলেছিলেন, 'এখানে হবে না, বাইরে গেলে হবে।' আপনি না দিলে আর নেব না।

মহারাজ। তা বাবা, তোমার যদি এমন নিষ্ঠা থাকে তো আমি গোর থেকে এসে সন্ন্যাস দেব। জান তো, একলব্যের কথা? দ্রোণ অস্ত্রশিক্ষা দেবেন না, বলেছিলেন। একলব্য সাধনা করে তাঁর কাছ

থেকে সব শিখেছিল। তবে এমনি গুরুভক্তি, গুরুর আদেশমাত্র আঙ্গুল কেটে দিয়েছিল। (একটু চুপ থাকিয়া) দীক্ষা তো নিয়েচ, জপধ্যান কর গিয়ে। জপধ্যানের নাম নাই, কেবল সন্ন্যাস! কয়লক্ষ জপ করেচ, সন্ন্যাস নিতে যে এসেচ? Formalityতে (বাহ্যানুষ্ঠানে) কি আছে? সন্ন্যাস অবস্থামাত্র।

বি—। আপনি বলুন, 'সন্ন্যাসে কিছুই নাই, তা হলে আমি সন্ন্যাস চাই না। আশীর্বাদ করুন, যেন আপনাতে বিশ্বাস থাকে। পুরশ্চরণ করি নাই, তবে যথাসাধ্য জপধ্যান করি।

মহারাজ। তা কয়দিন করেচ? হয়তো দশবার দিন, বড় জোর দুইতিন মাস আর কি।

বি—। না মহারাজ, ভুবনেশ্বরে দুই বৎসর ক্রমান্বয়ে করেচি। বিদ্যাপীঠে এসে আর হয় নাই। সমস্ত দিনই কাজ। আর বল্লে বলেন, 'কাজ কর, তবেই হবে।' রাত্রি জেগে করতে গিয়ে শরীর খারাপ হয়ে পড়ল।

মহারাজ। আচ্ছা, বুঝলুম। একসঙ্গে বসে কয়হাজার জপ করেচ?

বি—। জপ করতে গিয়ে গুণতে ভুল হয়ে যায়। তবে একসঙ্গে বসে পাঁচহাজার করেচি। (কান্না)

মহারাজ। কাঁদচ কেন? সন্ন্যাসের জন্যে যত কাঁদচ, ভগবানের জন্যে এতটুকু কাঁদ দেখি। তবে যাও, এক উপায় আছে। মহাপুরুষকে লেখ। তিনি যদি বলেন, তবে আমি দেব।

ক—। আমি মহাপুরুষ মহারাজকে লিখেছিলুম; তিনি এই উত্তর দিয়েচেন। [দী—পত্র পড়িয়া শুনাইলেন।]

মহারাজ। ও দেখচি সব সেরে রেখেচে!

রা—। আমার তো, মহারাজ, 'বয়স কম' লিখেচেন। আমার বয়স ক—র চেয়ে কম নয়। [মহারাজ নিরুত্তর।]

রা—। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি কি করব ?

মহারাজ। যাও, মহাপুরুষকে লেখ গিয়ে।

রা—। তিনি তো আমাকে চেনেন না।

মহারাজ। তুমি সব লেখ, আমিও লিখব।

বি—। আমি কি লিখব ?

মহারাজ। যা তোমার মন চায়। ও (ক—) কিরূপ লিখেচে ? সেরূপ লেখ গিয়ে।...

পরদিন সকালে বি— যাইয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, 'কি, মহাপুরুষকে লিখেচ ?'

বি—লিখেচি।

মহারাজ। কি লিখেচ ?

বি—। 'আপনার অনুমতি পাইলে পূজনীয় শরৎ মহারাজ আমাকে কৃপা করিয়া সন্ন্যাস দিবেন।'

মহারাজ। আমার অনুমতিতে লিখচ—এই কথাটা লিখে দাও। আমি কি করব বাবা,...সন্ন্যাস নিলেই তো হল না ; ভগবান লাভই উদ্দেশ্য।...

২৫শে ফেব্রুয়ারী—রাত্রি

গতকল্য ভোরে সন্ন্যাস হইয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় মহারাজ ধ্যান হইতে উঠিলেন। আটজন নূতন সন্ন্যাসীর মধ্যে তিনজনকে উপস্থিত দেখিয়া মহারাজ কহিলেন, 'কিরে, তোদের তো কালও ভিক্ষার নেমন্তন্ন আছে। আমার কাছে বলে গেচে।'

বি—। আমার একদিন মাধুকরী করে খাবার ইচ্ছা।

মহারাজ। বেশ তো। একদিন কেন, পারলে তিনদিনই খেতে হয়। যা হচ্ছে খাওয়া, এ তো আর সে রকমই নয়। সন্ন্যাসের মন্ত্রগুলোর মানে জগদানন্দের কাছ থেকে জেনে নিয়ো। দেখলে

তো, সব মন্ত্র কিরূপ ? ঐ সমস্ত ত্যাগ করেচ, এখন কেবল পরব্রহ্মের চিন্তা কর। মহাবাক্যই হচ্চে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'।

ব্রহ্মচর্য থেকে সন্ন্যাস নিয়েচ, এর মানে কি ? ব্রহ্মচর্যের নিয়মগুলো কি শিকায় তুলে রেখে দিতে হবে ?—তা নয়। সেগুলোও করতে হবে। সেগুলো এত অভ্যাস হয়েচে যে আর চেষ্টা করে করতে হচ্চে না—আপনা আপনি অভ্যাসগুণে হচ্চে। দেখ না, ব্রহ্মচারী যে এত হয়েচে, ক'টা সেই মন্ত্রগুলো স্মরণ করে। অনেকে মানেই জানে না। অনেকে কয়টি মন্ত্র, তাই জানে না। সন্ধ্যার সময় বসে সারাদিন কি করলুম চিন্তা করতে হবে, মনকে পরীক্ষা করতে হবে। তোমরা 'প্রেষ' স্মরণ করবে। যদি দেহবুদ্ধি আসে, তখন 'আমি তাঁর দাস—তাঁর সন্তান—তাঁর অংশ'—ভাবনা করবে।

ক—। মহারাজ, গায়ত্রী কি জপ করতে হবে ?

মহারাজ। পরমহংস-গায়ত্রী ? পরমহংস-গায়ত্রী জপ করা ভাল। পুর্বে ভাবতে, 'সূর্যমণ্ডলের মধ্যস্থিত পুরুষ' আর এর [পরমহংস-গায়ত্রীর] মানে হল,—তোমার ভিতর তিনি। তুমিই সেই, আর কি। তিনিই সব সময় প্রেরণ করচেন। একবার, পারলে দশবার জপ কোরো।

রা—। আমাদের কি তিনদিন আগুন ছুঁতে নাই ?

মহারাজ। (ঠাট্টা করিয়া) হ্যাঁ, তামাক পর্যন্ত না !

রা—। না মহারাজ, আমরা অনেকের কাছে শুনি যে তিনদিন আগুন ছুঁতে নাই ; তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করচি। এতক্ষণ তো ঘরে অন্ধকারে ভূতের মত বসেছিলুম।

মহারাজ। হ্যাঁ, ছুঁতে নাই ! দাঁতন করার যো নেই, সর্বভূতকে অভয় দিয়েচি কিনা ! আগুন ছুঁতে নাই, এ করতে নাই, ও করতে নাই—এতে যত মন দেবে। অত কি দরকার ? তোমার

ভগবানের চিন্তা নিয়ে কথা। যে যত সেই পরব্রহ্মের ধ্যান করতে পারবে, সেই জিতবে। তা না হলে, লাল কাপড়, আধ পয়সায় রঙানো, পরে ভিক্ষার সুবিধা আর পেন্নাম নেবার সুবিধা হবে।...

আগেকার বৈদিক সন্ন্যাস কত কঠোর ছিল। সন্ন্যাস নিয়ে উত্তরাভিমুখে চলে যেত। যাচ্চে—যাচ্চে—কিছুদিন বাদে এক সময় শরীরটা চলে যেত। এখন হচ্চে বিবিদিষা-সন্ন্যাস। সেই পরব্রহ্মের তত্ত্ব পাবার বাসনা, চেষ্টা। তা সন্ন্যাস নিয়ে ক'টা লোক করচে ? কেবল পরচর্চা আর পরনিন্দা! ঐ একটা আছে কি বি—...শুভানন্দ আজ এসে নালিশ করছিল। সন্ন্যাস নিয়ে কোথায় ভগবানের চিন্তা করবে, তা নয়। ফষ্টিনাষ্টি করা, কার বিরুদ্ধে কি বলা, এর কথা তার কাছে—এই সব। সন্ন্যাস নিয়ে কোথায় সাধনভজনে ডুবে যাবে,—disobedience (অবাধ্যতা)! কথা শুনব না, superiorরা (গুরুজনরা) যা বলেন তা করব না, নিজের দোষটা ঘাড়ে নেব না। আমার দোষ নাই—কেবল আপনাকে defend (সমর্থন) করা! উনি অমুক, তিনি অমুক! বিদ্যাপীঠে অমুক আমাকে সময় দিতেন না। সব সুবিধাবাদী। ভোরে উঠে নিজে কিছু করবে না, কেবল ঐ সব! ঐরকম ঐ বেটা রা—টারও আছে। ওটার অমনি এরটা তার কাছে, তারটা ওর কাছে লাগানো অভ্যাস আছে। সেদিন অমনি মা— আমার কাছে ছুটে এসেচে। আমি বল্লুম, 'তা বেশ, যে বলেচে তার কাছে আগে গিয়ে বল।' ঐরকম সন্ন্যাসী সব! আমি এইগুলিকে কিছুতেই সন্ন্যাস দিতুম না—মহাপুরুষ না বল্লে আমি দিতুম না। যেন ক্লাশ-প্রমোশন—কেঁদেকেটে ক্লাশ-প্রমোশন! মহাপুরুষের কাছ থেকে অনুমতি আনিয়ে সন্ন্যাস নিলে! আমি তো আর এখানে আসব না, উৎসবের সময় আর আসবই না। এলেই তো 'আমাকে সন্ন্যাস দাও', 'আমাকে ব্রহ্মচর্য দাও', 'আমাকে দীক্ষা

দাও'। 'দীক্ষা দীক্ষা' করে জ্বালাতন! করবে না কিছু, কেবল 'দাও দাও'। আমরা কত তাতিয়ে রাখব রে বাবা, নিজে না তাতলে?... (বি—র দিকে তাকাইয়া) সন্ন্যাস নিয়েচিস বেশ করেচিস, এখন ডুবে যা দেখি। বি—বেচারীকে শুধু বলচি না, সকলকেই প্রায় এইরূপ দেখতে পাই। কোন অমঙ্গল ভাব যেন কাছে না আসতে পারে। কোন অমঙ্গল ভাব যে কাজ থেকে আসে দেখচ, এমন কি, যে কাজ সাধনভজনের প্রতিবন্ধক বুঝচ, সে কাজ তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করবে।

খাবার সময় হওয়ায় সকলে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলে মহারাজ দী—কে বলিলেন, 'ব্যাটাদের যা গালাগাল দিয়েচি, বোধ হয় আর আসবে না।' কিন্তু তাহারা কি খাইয়াছে খবর নিতে তাঁহাকে পাঠাইলেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—রাত্রি

প্রায় সাড়ে আটটার সময় মহারাজ ধ্যান হইতে উঠিলেন। নূতন সন্ন্যাসীরা প্রণাম করিয়া বসিতে না বসিতেই বলিলেন, 'কিরে, বিরজার মন্ত্রগুলো বুঝে নিয়েচিস তো?'

রা—। না মশায়, আজ মাধুকরী করতে গিয়ে ঘুরে মাথা ধরে গিয়েছিল, এসে শুয়ে পড়েছিলুম।

মহারাজ। (স্নেহমাখা স্বরে) ঐ দেখ, অমন জানলে তোদের মাধুকরী করতে বলতুম কি!

সান্যাল মহাশয়। তোমাদের সেই গল্পটা বলে দাও—পাহাড়ের।

মহারাজ তখন হিমালয়ে নিজেদের মাধুকরীর ঘটনাটি বিবৃত করিলেন। [উহা 'পর্যটন ও তপস্যা' অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে।]

৫ই মার্চ

বি—। মহারাজ, মা বলেচেন, 'বাবা, শেষ সময় ঠাকুর হাত

ধরে নিয়ে যাবেন।'—এরূপ তাঁর উপদেশে পড়লুম। 'ঠাকুর' বলতে কিরূপ? যার যেরূপ কল্পনা [তার কাছে] সেরূপ?—না, ফটোতে যেরূপ দেখতে পাই সেইরূপ?

মহারাজ। মা কিরূপ বলেচেন, কি করে বলব। আমারও বিশ্বাস, ঠাকুর নিয়ে যাবেন। ঠাকুর যাকে কৃপা করে তাঁর সম্বন্ধে যেরূপ বুঝিয়েচেন, সে সেইরূপই দেখবে। তবে মা একথাও বলেচেন, 'সাধুরা কি আর করবে, তাঁর স্মরণমনন নিয়ে দিন কাটাবে।' এখন তাই কর গিয়ে।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

(১)

[নীচের প্রায় সমস্ত কথাই বাগবাজার-মঠে হইয়াছে। যে যে স্থলে প্রশ্নগুলি দিনলিপিতে লিখিয়া রাখা হয় নাই সেই সেই স্থলে এখানেও দেওয়া হইল না। উত্তর হইতে অনায়াসেই প্রশ্ন অনুমিত হইবে।]

প্রশ্ন—মূর্তি-চিন্তা ও চৈতন্যস্বরূপ-চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

উত্তর—কেন? যিনিই সাকার হয়েচেন তিনিই নিরাকারভাবে আছেন। দুই ভাবই সত্য। সব সময় মন তাঁর বিরাট ভাবের চিন্তা করতে পারে না, তাই তাঁর নামজপ, মূর্তি-চিন্তা ইত্যাদি নানা উপায়ে তদ্ভাব আয়ত্ত করতে চেষ্টা করা।

নামজপ মনে মনে করাই ভাল। মুখ, জিহ্বা নড়বে না। অনেক সময় মনে হবে আর কেউ ভিতরে জপ করচে। অথবা ইষ্টমন্ত্র হৃদয়ে আঁকা আছে, তুমি যেন তা পড়ে যাচ্চ। এ সব ভাবই সত্য। আরও নানা ভাব আসতে পারে। যতক্ষণ তাতে আনন্দ পাবে ততক্ষণ তা সত্য বলে বুঝবে। যদি অসুবিধা বোধ হয় তা হলে জানাবে। নিজের উপলব্ধি প্রকাশ করতে নাই।

৭।৩।২৬

প্রশ্ন—'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্…' ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ কি এই যে, কোনপ্রকারে দেহত্যাগকালে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়ে দিতে পারলেই জীবের ভগবৎপ্রাপ্তি হবে?

উঃ—টীকাকারেরা তো বলেন যে ওরূপ হয় না। সমস্ত জীবনে যে চিন্তার প্রাবল্য থাকে, শেষমুহূর্তে সেই চিন্তাই ভেসে উঠে। দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি তখন callous (অসাড়) হয়ে যায়। চেষ্টা করে কোন ভাববিশেষ আনতে পারে না। আজন্মপোষিত বাসনা স্বতঃ ভেসে উঠে। সেইজন্যই স্মরণমননরূপ অভ্যাসের দ্বারা সর্বদা চিত্তবৃত্তিকে তদ্ভাবে ভরপুর রেখে তন্ময় হয়ে থাকতে হয়। তা হলে শেষ-মুহূর্তে সেই চিন্তাই জেগে উঠবে। বহুজন্মের বাসনাপুঞ্জের sum & summation (সমষ্টি) এই দেহমন। আবার এখানকার বাসনারাজির sum & summation (সমষ্টি) ভাবী স্থূলসূক্ষ্ম শরীর বা নূতন দেহমন হবে। সুতরাং এখানকার বাসনার বস্তু যদি তিনি হন, তা হলে নূতন দেহমন তদ্‌গতিই প্রাপ্ত হবে।

১৮।৩।২৬

Form (আকৃতি) বিশিষ্ট হলেই তার একটা আমিত্ব জন্মে। রক্ত, মাংস, হাড় ইত্যাদির একটা সমষ্টির আমিত্বই আমার 'আমি'। আবার দেহের পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যেকেরই একএকটা স্বতন্ত্র আমিত্ব আছে। সব মিলিয়ে 'বিরাট আমি' বা ঈশ্বর।

যারা ভগবান লাভ করতে চায় তারা সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হবে। সম্পূর্ণরূপে ভগবানে নির্ভরতাই আত্মনির্ভরতা। প্রাণপণে তাঁকেই ভালবাসতে হবে। মুখে বলব তিনি আমার সর্বস্ব, অথচ নিজের সুবিধা বা অসুবিধার জন্যে এর ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকব, সে আত্মনির্ভরতা বা ভগবানে নির্ভরতার ভাব নহে।

প্রত্যহ এই চিন্তা করতে হবে,—আমি শরীর নই, মন নই, আমি তাঁর দাস, তাঁর অংশ, শুদ্ধ আত্মা। আমি সাক্ষী মাত্র। ভাল হোক বা মন্দ হোক, যেকোন ভাব হোক, স্থায়ী হবে না—আসচে আবার চলে যাবে। সুতরাং সাক্ষিস্বরূপ আত্মারই বিষয় চিন্তা করবে।

৮।২।২৭

প্রশ্ন—মধ্যে মধ্যে কামচিন্তা এসে মন বড় বিচলিত করে দেয়—কি করি ?

উঃ—কাম সকলেরই আছে, তার জন্যে চিন্তা কি ? আর তোমার শরীরটা দুর্বল হয়েচে বলেই হয়তো ঐসব আসচে। শরীরে মেদবৃদ্ধি হলেও ঐসব ভাব আসে। তা খুব প্রার্থনা করতে হয়। নিয়মিত ধ্যানভজন এবং কতকগুলি নিয়ম পালন করা ভাল। যেমন,—গঙ্গাস্নান, নির্দিষ্টসংখ্যক জপ, বেড়ানো ইত্যাদি। ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীরটাকে একটু ক্লান্ত করায় সাময়িক ফল পাওয়া যায়। তবে আসল হচ্চে অভ্যাস ও বৈরাগ্য। সর্বদা নিত্যানিত্য বিচার, প্রলোভনের বস্তুর অনিত্যতা চিন্তা, দুঃখদোষ কুফল দর্শন, লোকনিন্দা লোকলজ্জা চিন্তা। আর সর্বদা চিন্তা করবে—আমি তাঁর দাস, তাঁশ অংশ, শুদ্ধ পবিত্র আত্মা।

প্রকৃতিবিশেষে লোভ, কাম বা ক্রোধের আধিক্য হয়ে থাকে। যার যেটি প্রবল থাকে তার সে বিষয়ে সর্বদা সতর্ক বিচার রাখতে হবে। যেখানে গেলে মন চঞ্চল হয় বা যা করলে মন খারাপ হয়, সে স্থান বা কাজ থেকে সতত দূরে থাকতে চেষ্টা করবে। অবসর পেলেই মনে ঐসব ভাব আসতে পারে, সেজন্যে নিয়মিত কাজ, জপধ্যান ছাড়া অন্যসময় সৎসঙ্গ, সদ্গ্রন্থ পাঠ করবে।

১৪।২।২৭

জীবজগতের পারমার্থিক সত্যতা নাই বটে, তবে এদের ব্যবহারিক

সত্যতা আছেই। যতক্ষণ 'আমি ও আমার' বোধ আছে, শরীরমনের বোধ আছে, ততক্ষণ এজগতের সত্যতাও অবশ্যই আছে। যখন এসবের পারে যাওয়া যায় কেবল তখনই জগতের সত্তাকে অস্বীকার করতে পারা যায়, তার আগে নয়। ওখানে ভুল করেই আমাদের জাতির এ দুর্দশা। সামান্য ভোগ্যবস্তু পেলেই কৃতার্থ হয়, কিন্তু মুখে বলে, দুনিয়া দুদিনের। সন্ন্যাসীর ধর্মালাপ গৃহীদের মুখে—এ সম্পূর্ণ অলসতার লক্ষণ।

২৭।২।২৭

প্রশ্ন—ধ্যানের সময় ইষ্টমূর্তি স্পষ্ট হয় না, বরং ক্রমেই যেন অস্পষ্টতর হচ্চে মনে হয়।

উঃ—তাতে কি? প্রথমে তাঁকে ভাববে। পরে যখন দেখবে যে ভাল লাগচে না, তখন মনে করবে, তিনি যেন নিরাকার সর্বব্যাপী বায়ুর ন্যায় বা আকাশের ন্যায় রয়েচেন, আর তুমি তাঁতে ডুবে আছ—তোমার ভিতরে বাইরে সর্বত্র তিনি। [মহারাজ পত্রে লিখিয়াছিলেন,—'ভিতরে বাহিরে তিনিই রহিয়াছেন—এই ভাবনার সময় তাঁহার দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হয়, অহংএর দিকে নহে।]

প্রশ্ন—'চেতন সত্তার মধ্যে ডুবে আছি'—এরূপ ভাববার সময় হৃদয়ে বা ভ্রূমধ্যে নির্দিষ্ট কোন স্থানে মন স্থির হয় না, যেন সেই ভাবের মধ্যেই আপনহারা হয়ে যাই।

উঃ—বেশ তো, তাই করবে। সেই ভাবেই মন স্থির করবে। কোন নির্দিষ্ট স্থানেই মন স্থির করতে হবে এমন কোন নিয়ম নাই।

২২।৩।২৭ [বেলুড় মঠ]

প্রশ্ন—জ্যোতিঃ ও চৈতন্য কি একই ভাবকে বুঝায়?

উঃ—চৈতন্য প্রকাশাত্মক, জ্যোতিও প্রকাশাত্মক। তাই ভাববার সুবিধার জন্যে চৈতন্যকে জ্যোতির্ময় চিন্তা করা হয়। স্থূল জ্যোতির

সাহায্যেই স্থূলবস্তুর প্রকাশ হয়। এখন সেই স্থূল জ্যোতিও জড় কিনা সে বিষয়ে প্রমাণ কি? বেদান্তশাস্ত্রে তো স্পষ্টই বলে যে সেই চৈতন্য ছাড়া কোন সত্তা নাই। তবে আমরা তা বুঝতে পারি না চিত্তের মলিনতার জন্যে।

২৩।৬।২৭

প্রশ্ন—কাজ করতে গেলে নানা বিক্ষেপ আসে, তাতে মনে হয় যে কাজ বুঝি ঠিক করা হচ্চে না।

উঃ—বিক্ষেপ বাইরের উপর নির্ভর করে, সুতরাং কাজ করতে গেলে তা আসবেই। তবে নিয়মিত ধ্যানভজন করে গেলে ওরা আর মনের উপর বিশেষ কাজ করতে পারে না, অনেক কমেও যায়। কেউ কেউ সহজে ওগুলিকে অস্বীকার করতে পারে, আর যারা অপেক্ষাকৃত nervous (দুর্বল প্রকৃতির) তাদের একটু দেরীতে সে বিচার আসে। তবে আসবেই। কাজের জন্যে নিয়ম নষ্ট হতেও পারে, তবে অনেক ক্ষেত্রেই আবার redoubled forceএ (দ্বিগুণিত বেগে) আসে।

ঠিকঠিক ধ্যান হলে তার একটা প্রভাব সারাদিন থাকে। তবে ঠিকঠিক না হলেও আন্তরিক চেষ্টারও একটা ফল আছে। ধ্যান দুই প্রকারে হয়,—(১) মনকে অন্য সমস্ত বিক্ষেপশূন্য করে নিজ ইষ্টে স্থির করবার জন্যে আসনাদি করে অবস্থান করা। (২) তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সমস্তচেষ্টাশূন্য হয়ে তাঁকে ভাবা—অবসর বা বিশ্রাম কালটাতে এভাবে ধ্যান চলে।

২৬।৬।২৭

শিষ্য। মহারাজ, আমার ইচ্ছা কিছুদিন ধ্যানধারণা, পড়াশোনা নিয়ে থাকি।

স্বামী। অনেকদিন তো বাইরে থাকলে। লোকে গুরুগৃহে থাকে যাতে ভক্তিবিশ্বাস বাড়ে—গুরুর জীবন দেখে, আচরণ দেখে। তা

এখানে থেকে যদি কোন ফল না হয়ে থাকে তো এতদিন এখানে থাকলে কেন? আর যদি লাভ হয়ে থাকে তো আবার বাইরে যেতে চাও কেন?

শিষ্য। [সত্যই লাভ হইয়াছে কিনা চিন্তা করিয়া] লাভ হয়েচে বলেই মনে করচি আরো কিছুদিন ধ্যানধারণা করে ভাবটা পাকা করে নেব।

স্বামী। তা বেশ, সুবিধা হলে ধ্যানভজন করবে সে তো ভাল কথা। ঠাকুরের জন্যে যখন জীবন উৎসর্গ করেচ তখন ধ্যানভজন করতেই হবে—যতদিন না ভগবান লাভ হচ্চে।

প্রশ্ন—কাজ করতে করতে যদি ধ্যানধারণা বা পড়াশোনার প্রবৃত্তি জাগে, তা হলে কি মনে করতে হবে যে কাজ ঠিক ভাবের সহিত করা হচ্চে না?

উঃ—নিশ্চয়। কোন কর্তব্যের ভার নিয়ে তা সম্পূর্ণ করবার আগেই যদি কাজে বিরক্তি আসে বা ভাল না লাগে, তা হলে বুঝতে হবে যে, মন তোমাকে ফাঁকি দিচ্চে—বিশেষতঃ নিষ্কাম কাজের বেলা। কাজের সময় কাজের দিকেই বেশী ঝোঁক দিতে হয়। তবে কাজ যাতে শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়, যথার্থ ভাবের সহিত করা হয় সেজন্যে ধ্যানধারণাও করতে হয়। কর্তব্য ঠিকঠিক না করলে কোন কাজ তো হয়ই না, সঙ্ঘও চলে না। কাজ করতে করতে মন খারাপ হলে দুইএক মাসের ছুটি নিয়ে এমন কোন জায়গায় যাওয়া উচিত যেখানে গেলে মনের জোর বাড়ে আর পবিত্রতা আসে—মাঝে মাঝে যেমন এখানে আস। আর যদি কাজ ছেড়ে দিয়ে কেবল সাধনভজন নিয়ে থাকতে ইচ্ছা হয় তা হলে দুইএক বৎসরের জন্যে সব ছেড়ে সেইভাবে থাকতে পার। তবে তখনও নিজের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে। কাজের সময় যেমন মনের উপর সর্বদা সবিচার দৃষ্টি দেবে—মনের

স্থিরতা বাড়চে বা কমচে—সদ্ভাব বাড়চে বা কমচে ইত্যাদি বিশেষভাবে দেখবে, সেইরূপ তপস্থার সময়ও দেখবে যে আন্তরিকভাবে কতটা চেষ্টা করা হচ্চে। চেষ্টার প্রতিই লক্ষ্য দেবে।

প্রশ্ন—কি করে মনের প্রবৃত্তি শান্ত হবে? মন যে ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠচে মনে হয়।

উঃ—মন কি সহজে স্থির হয়? প্রবৃত্তি দমন করবার জন্যে খাটতে হবে। গীতাতেও তো অভ্যাস ও বৈরাগ্যের কথাই বলেচেন। অন্য উপায় তো জানি না বাবা। জানলে কি আর বলতুম না?

শিষ্য। অনেকসময় তো মহাপুরুষরা অনেকের অনেক রকম দর্শনাদি করিয়ে দিয়ে থাকেন বা সমস্ত ভার নিয়ে থাকেন—যেমন গিরিশবাবুর।

স্বামী। তাঁর বকল্‌মার কথা। বেশ তো, বকল্‌মা যদি দিয়ে থাক তবে আর চঞ্চল হবে কেন? তিনি যেমন রাখেন সন্তুষ্ট থাকতে হবে, তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে পড়ে থাকতে হবে।

শ্রীব্রহ্মস্বরূপানন্দ

(২)

২৪শে অক্টোবর, ১৯২৬

শিষ্য। সাধনভজনের দিকটা বাদ দিয়ে শুধু কাজে কি অভীষ্ট লাভ হয়?

স্বামী। হতে পারে, যদি কেউ সেভাবে করতে পারে। তবে সাধারণতঃ হয় না। সাধনভজন করতেই হবে।

শিষ্য। মনে অনেকসময় নানাপ্রকার কুচিন্তা আসে, সেগুলির হাত থেকে কি করে রক্ষা পাওয়া যায়?

স্বামী। সেগুলি তাড়িয়ে দিতে হবে। ঠাকুরের শরণাপন্ন হও। তাঁকে যত আপনার করে নিতে পারবে, ততই এগুলি আর আসবে না।

শিষ্য। মাছমাংস কি বিঘ্নস্বরূপ?

স্বামী। মাছমাংস খেয়ে যদি ভগবানে মন রাখতে পার, তবে খেয়ো। নতুবা ছেড়ে দিতে পার।

শিষ্য। আমাদের মন্ত্রের মানে কি?

স্বামী। 'সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করচেন তিনি আমার সকল দুঃখ হরণ করুন।'—এই মানে। সব মন্ত্রেরই এই একই মানে। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে চেষ্টা কর, নতুবা, হাজার মানে জানলেও কিছু হবে না।

শিষ্য। প্রাণায়াম ইত্যাদি মন-নিরোধ করবার কিছু সহায়তা করে কি?

স্বামী। ওর দ্বারা বিশেষ কিছু হয় না, তবে সামান্য একটু হয়তো হতে পারে। ভগবানকে যত ভালবাসতে পারবে, ততই মন বশ হবে।

শিষ্য। ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে জপ করতে হয়, না ধ্যান করে তারপর?

স্বামী। ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই করতে হয়। তারপর যখন ক্রমে এক এক অবস্থা লাভ হবে, তখন আপনিই বুঝতে পারবে যে, মুখ চলে তো হাত চলে না, ইত্যাদি।

১০ই নভেম্বর, ১৯২৬

শিষ্য। মহারাজ, গুরুশক্তি তো কিছুই বুঝতে পারচি না। বোধ হয় পরে সময়ে পারব—নয় কি?

স্বামী। হ্যাঁ, পরে ক্রমে বুঝতে পারবে। তুমি কি রকম মনে করচ—কি, হচ্চে না?

শিষ্য। যেমন, ভিতরে একটা কিছু হওয়া টওয়া।

স্বামী। আমার সে ক্ষমতা নেই বাবা, যার আছে তার কাছে যেতে পার।

শিষ্য। না না, তা বলচি না। মহারাজ, আপনার নিকট মাঝে মাঝে পত্র লিখি, এতে আপনি বিরক্ত হন কি?

স্বামী। অত প্রশ্ন কিসের হে বাপু। যেগুলি শাস্ত্রাদি পড়লে জানতে পার, সেগুলির জন্যে আমাকে লেখা কেন? এসব তো intellectual (যুক্তিতর্কের কথা)—কিছু নয়, practically (কার্যতঃ) করে দেখে নিতে হয়। শাস্ত্রাদি ভাল করে পড়লে অনেক প্রশ্ন নিরসন হয়ে যাবে। অত লেখবারও আমার অবসর নাই—কত চিঠি আসে। তবে নিজের বা ধর্মসম্বন্ধে কোন কথা থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পার।

শ্রীধীরেশানন্দ

(৩)

মহারাজ আমার পরিচিত একজনকে একখানি গীতা দেন। তাহা দেখিয়া আমারও গুরুর হাতে গীতা পাওয়ার সাধ হয়, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। দিন কয়েক পরে আবার যখন তাঁহার কাছে গিয়াছি, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে তিনি ঐরূপ একখানি গীতা হাতে করিয়া বলিলেন, 'নাও ধর। এবার হয়েচে তো?'

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহারাজ, গুরু, ইষ্ট কি এক?' মহারাজ—'হ্যাঁ।' আমি—'তবে যাঁকে দেখি তাঁর ধ্যান করা সোজা মনে করি। কারণ, সর্বদাই তো চোখের উপর দেখচি। তাই করব?' মহারাজ—'কর।' আর একদিন বলিয়াছিলেন, 'আমরা এই ঠাকুরের নাম ছাড়া আর কিছুই জানি না। এই নাম দিয়ে যা ইচ্ছা তাই কর। পূজা কর, ভোগ দাও, যা কিছু কর এই নাম দিয়েই করবে। আমরা এই ঠাকুর ছাড়া আর কিছু জানি না।'

শিবরাত্রির দিন উপবাস করিয়া মহারাজকে প্রণাম করিতে গেলাম। 'রাত্রে পূজা করতে পারি না। রাত বেশী হয়ে পড়লে বমি করে একশা হই। আমি উপোসে বড় কাতর।'—আমার মুখে একথা শুনিয়া মহারাজ কহিলেন, 'এবার করে দেখ না।' আমি—'কি করে পূজা করব মহারাজ?' মহারাজ—'ভক্তির পূজা করবি। আমি বলে

দিচ্চি: মহাদেবকে স্নান করাবি, স্নান করিয়ে প্রাণে যেরকম ভাল লাগে সেভাবেই গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য নিবেদন করে জপ করবি। এই রকম প্রহরে প্রহরে। বিধিনিয়ম কিছু করিস নি, এটা হল ভক্তির পূজা। এইতেই হবে।' মহারাজ মাথায় হাত দিয়া 'পারবি পারবি' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সেবার আমার শরীর খুব স্বাভাবিক ছিল, কোন কষ্ট হয় নাই।

শ্রীগোলাপবাসিনী গুহ

সংশয়নিরসন

১৩ই জুন, ১৯২৬

ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া শাস্ত্রাদি আলোচনা মনকে শাস্ত্রীয় তথ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিল। বহুকালের যত্ন-পোষিত সংস্কারাবলীর মূলে আঘাত লাগায় মানসিক চাঞ্চল্য, শান্তি ও স্থৈর্যকে অতিক্রম করিল। অব্যবস্থিত মন লইয়া স্বামী সারদানন্দের সমীপস্থ হইলাম।

শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—তুমি দীক্ষা নিয়েচ কি?

আমি—আজ্ঞে, নিয়েচি।

স্বামিজী—তবে তোমার প্রশ্নগুলি তোমার গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেই সব চেয়ে ভাল হত। আমায় জিজ্ঞাসা করতে চাও কর, আমি যা জানি বলচি।

প্রঃ—যখন দীক্ষা নিই, ইষ্টের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে নি। আজকাল জাগচে।

উঃ—সন্দেহ তো একটা রোগবিশেষ। ওটা মনের normal (সহজ) অবস্থা নয়। ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ যা বলে গেচেন, ঠাকুর নিজে যা বলে গেচেন, তাতে যদি তোমার বিশ্বাস না জেগে থাকে, তবে আমার কথায় কি হবে বল।

প্রঃ—ওঁদের কথা কত রকম ভাবে represented (বর্ণিত) হয়ে এসেচে, কে জানে। আমি আপনার কাছ থেকে আপনার নিজের কথা জানতে চাই।

উঃ—এই যে ঠাকুরের সব কথা আছে সেসব কি আমরা বানিয়ে লিখেচি ?

প্রঃ—তা না হলেও, তাঁর সন্তানগণের তাঁর প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসার ফলে হয়তো তাঁরা প্রতি ব্যাপারকেই magnify (বড়) করে দেখতেন ও দেখেন। তাঁরা হয়তো তাঁদের এই mental process (মানসিক ক্রিয়া) সম্বন্ধে conscious (সচেতন) নন।

উঃ—দেখ, আমরা তো প্রথম থেকেই কিছু ভক্ত হয়ে তাঁর কাছে যাই নি। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলুম। নাস্তিকতা, অবিশ্বাস আমাদের ভিতর পুরোমাত্রায় ছিল। ঠাকুরকে এক অবতার খাড়া করবার জন্যে আমরা তাঁর কাছে যাই নি। ধীরে ধীরে বাধ্য হয়ে সব মেনে নিতে হয়েচে। যখন দেখলুম, আমরা নিজেদের সম্বন্ধে যা জানতুম উনি আমাদের সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশী জানতেন, আর তাঁর কথাই সব সময়ে ঠিক হত, তখন কি আর করি, তাঁকে মেনে নিতে বাধ্য হলুম।

প্রঃ—ঠাকুরের ideal existence (মানসিক সত্তা) ছাড়া real existence (বাস্তব সত্তা) কিছু আছে কি ?

উঃ—আছে বৈকি। অনেকে তাঁকে দেখচে, কথা কইচে।

প্রঃ— আপনি তার কোন প্রমাণ পেয়েচেন কি ?

উঃ—কিছু কিছু পেয়েচি বৈকি। নইলে কি এমনি পড়ে আছি ?

প্রঃ—যদি ঠাকুর আছেনই, তবে স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) ইচ্ছামত তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পারতেন না কেন ?

উঃ—কথা কইতেন বৈকি। এই যেমন আমি তোমার সঙ্গে বসে

কথা কইচি, ঠিক এমনিভাবে কথা বলেচেন, আমরা জানি। তবে ইচ্ছামাত্র হত না। যেমন, তুমি শাঁখারিটোলায় থাক, আমার সঙ্গে কথা কইতে হলে, এখানে এসে দেখা করে তবে কইতে হবে। স্বামিজী তো আর ঠাকুরের সমান planeএ (ভূমিতে) ছিলেন না, কর্মের মধ্যে থাকলে মন একটু নীচে থাকে। তাই কথাবার্তা হতে হলে মনকে সংযত করে উপরের planeএ (ভূমিতে) নিয়ে যেতে হবে।

প্রঃ—আপনারা ইচ্ছামত দর্শন পান কি?

উঃ—ঐ যে বল্লুম, ঠাকুরের সমান planeএ (ভূমিতে) তো বাস করি না যে সব সময় কথা কইতে পাব। তুমি প্রথম থেকে ভুল ধারণা করে রেখেচ, তাইতে এত গোল হচ্চে। তুমি ঠাওরেচ তাঁর সন্তানরা দিনরাত তাঁর সঙ্গে কথা কইচেন, আলাপ করচেন। তা তো নয়।

প্রঃ—যদি আপনাদের তাঁর সঙ্গে communion (কথাবার্তা) থাকে তবে আপনাদের মধ্যে মতের বৈষম্য হয় কেন? —যেমন স্বামিজীর মিশন-সংগঠনের সময়ে।

উঃ—মিশন-গঠনের সময়ে কেউ তো ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করে কিছু করে নি। অনুমানের উপর তর্কবিতর্ক হয়েছিল। তাঁর সন্তানরা সবাই যে তাঁর সঙ্গে দেখাশোনা করতে, কথা কইতে পাচ্চেন, তাই তোমায় কে বল্লে? বিরূপ অবস্থায় পড়ে অনেকেই হয়তো তাঁর দেখা পাচ্চেন না। তবে কেউ কেউ পাচ্চেন।

প্রঃ—কোন active real (সক্রিয় বাস্তব) ভগবানের অস্তিত্ব আছে কি?

উঃ—আছে বৈকি।

প্রঃ—তাঁর সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ সম্পর্ক হয় কি?

উঃ—তাই যদি না হবে এখানে পড়ে আছি কি করতে?

প্রঃ—এই সম্পর্কে যেসব কথা বইয়েতে, জীবনীতে পাই,

সেসব নিরন্তর ভাবনার ফলে সংস্কারাবদ্ধ অনুমানও হতে পারে।

উঃ—তা হতে পারে। তবে ঐ অনুমানের পেছনে একটি বাস্তব সত্তাও তো আছে। যেমন ধর, তুমি একজন স্ত্রীলোককে ভালবাস। প্রথমে তুমি তার সম্বন্ধে একটি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করলে। ধর, তার সঙ্গে পরে তোমার বিয়ে হল। হলে পরে দেখলে, তার সম্বন্ধে ধারণা অনেক বদলে যাচ্চে—তুমি ক্রমেই disillusioned (নির্মোহ) হচ্চ। তাকে যত গুণবতী মনে করতে, আর তত কর না। এ ক্ষেত্রে কি হল ?—object (বস্তু) ঠিকই আছে, কেবল তোমার মনের অবস্থা তাকে ভিন্নসময়ে ভিন্নরূপ দেখলে। ভগবান সম্বন্ধে exaggerated (অতিরঞ্জিত) ধারণা হতে পারে। তবে যা হোক একটা কিছু আছে। স্বামিজী একটা উপমা দিতেন—ধর, এখান থেকে সূর্যের একটি ফটো নিলে, আর পনের হাজার ফিট উচ্চে উঠে আরো একখানি নিলে। দুখানিতে তফাৎ হয়ে গেল—একখানি বড়, একখানি ছোট। ফটো কিন্তু দুখানিই ঐ একই সূর্যের। তেমনি একএক plane (ভূমি) থেকে ভগবানকে একএক জন একএক রূপ দেখে।

প্রঃ—বিশেষ শক্তির বিকাশ ছাড়া অবতারবাদের আর কোন অর্থ আছে কি ? অর্থাৎ সত্যই কেউ অবতীর্ণ হন কি ?

উঃ—অবতীর্ণ হন বৈকি। ঠাকুরকে বলতে শুনেচি—যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই রামকৃষ্ণ। অর্থাৎ একই power (শক্তি) প্রয়োজন মত বিকাশপ্রাপ্ত হন। আবার বলেচেন, দুশো বছর পরে আবার অবতীর্ণ হবেন উত্তরপশ্চিম কোণে। কি জান, সমস্ত জীব-জগৎই তাঁরই বিকাশ বই তো নয়। তবে প্রয়োজন মত কোন কোন স্থলে বিশেষ বিকাশ ঘটে।

দক্ষিণপার্শ্বে আসনোপরি উপবিষ্ট শিষ্যত্বের মর্যাদাপ্রার্থীকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিবার জন্য আচার্যের নিরহঙ্কার দাবী লইয়া মহামুনি বলিতে

লাগিলেন,—'দেখ, সন্দেহ যখন জাগে তখন কি আর করা যায়। এখন হয়তো আমার কথা তোমার বেশ লাগবে, বাড়ী গেলেই আবার সন্দেহ হবে। ঠাকুর বলতেন, কারো কারো জন্মাবধি সব তাতে সন্দেহ জেগে থাকে—তার সঙ্গে আর কোন মতেই পারা যায় না। অবশ্য তুমি সেরূপ নও, বুঝতে পারচি। তোমার উপর তাঁর কৃপা রয়েচে। তবে এও একটি অবস্থা মাঝে মাঝে আসে। কদিন পর দেখবে, সন্দেহ যেভাবে এসেচে, সেইভাবেই চলে যাবে। ধরে রাখতে ইচ্ছা করলেও কিছুতেই পারবে না। চলে যাবেই। তাঁকে ডাক, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। সন্দেহ হয় বেশ তো 'হে ভগবান, তুমি যদি থাক, তবে আমার এই কর'—এইভাবে প্রার্থনা করে যাও। তাতেও উপকার হবে। দেখ, উপাসনাতে objective (বাস্তব) কিছু লাভ যদি নাও হয়, subjective (মানসিক) একটা লাভ আছে। সেটা এই—তাতে করে মন স্থূল বিষয় ছেড়ে higher planeএ (উচ্চভূমিতে) উঠতে চেষ্টা করে।

কিছুকাল পুর্বে একদিন যখন গভীররাত্রে কিছুক্ষণ ধ্যানান্তে শয্যা গ্রহণ করিয়াছি, দেখিলাম, ঠাকুরের জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আমার প্রতি অগ্রসর হইয়া আমার শিরোপরি হস্তস্থাপন করিতেছেন। ভয়ে চমকিয়া উঠাতে সেই মূর্তি তিরোহিত হন। সেই সম্পর্কে কথা তুলিয়া বলিলাম, 'আপনাকে একখানি চিঠি দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, উহা hallucination (ভ্রান্তি) কিনা। আপনি উত্তরে লিখেছিলেন, hallucination (ভ্রান্তি) হলেও ভাল।—কেন ?'

উঃ—ভাল এইজন্যে যে, দেবদেবীর স্থান যদি অন্যান্য সবের উপরে হয়, তবে অন্যান্য সবের চেয়ে দেবদেবীর স্বপ্ন অথবা দর্শন নিশ্চয়ই উচ্চতর। তোমার চিঠিখানা মনে পড়চে বটে।

অপর একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম,—একে একে অবতার-

পুরুষগণ দ্রুত আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমি তাঁহাদের পাদস্পর্শের চেষ্টা করিলাম। প্রথম কয়েকজনের চরণস্পর্শ সম্ভব হইল না। শঙ্করের চরণস্পর্শ করিলাম। অধিকতর সহজে শ্রীচৈতন্যের চরণস্পর্শ করিলাম। আর সর্বশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণস্পর্শের চেষ্টা করায় তিনি উপবিষ্ট হইয়া প্রণত আমার মস্তকোপরি দুই পদ স্থাপন করিলেন। এই স্বপ্ন-ব্যাপার উল্লেখ করিয়া বলিলাম,—'এই সম্বন্ধে আপনাকে পত্রে প্রশ্ন করেছিলুম। উত্তরে আপনি লিখেছিলেন, 'ঠাকুর বলিতেন, দেবস্বপ্ন সত্য।' হাজার স্বপ্নের ভিতর দেবস্বপ্ন সত্য হবে কেন ?

উঃ—দেখ, স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার আছে। কতকগুলি স্বপ্ন দেখবে, ঠিক ফলে যায়, আর কতকগুলি বাজে। বাজে স্বপ্নগুলি দেখে লোকে ঠাওরায় সব স্বপ্নই বাজে। কিন্তু যেগুলি ফলে যায়, তার সম্বন্ধে কি বলবে ? স্বামিজী বলতেন, এরূপ স্বপ্ন মনের উচ্চতর অবস্থার vision (দর্শন) ছাড়া কিছুই নয়।

জনৈক ভদ্রলোক এই সময়ে একটি সংবাদ লইয়া আসায় আলোচনার ব্যাঘাত হয়। তিনি চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম—'সংসার ত্যাগ করাতে মা বাপের যদি শারীরিক কোন অনিষ্ট হয়, তাতে কোন ক্ষতি হবে কি ?

উঃ—তাঁদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের তো অন্ততঃ বন্দোবস্ত করতে হবে।

আমি—তা তাদের আছে। তবে দেখবার লোকেরই যা একটু দরকার।

উঃ—তা দেখ না। দেখ, বেরিয়ে এলেই যে হবে তার তো কোন মানে নেই। বরং সংসারে resistance (বাধা) থাকাতে তাঁর দিকে একটা টান থাকে। বেরিয়ে এলে resistance (বাধা) না

থাকায় সে টানটুকুও চলে যায়। কার যে কিসে হয় বলা তো যায় না। আর দেখ, plan (মতলব) করে বেরুনো হয় না। যখন ব্যাকুলতা জাগে, তখন কোন consideration (ভাবনা) মনে জাগে না। ওসব নিজে নিজে ঠিক করতে হয়। কারুকে জিজ্ঞাসা করে কি হয়? যেমন করচ, করে যাও, যতদিন তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব না কর। সত্যিকার টান হলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে—কিছুর জন্যে ভাবতে হবে না। আর অনেকের বেরিয়ে আসার সঙ্গে selfish motive (স্বার্থপরতা), ফাঁকি দেবার ভাব ইত্যাদি থাকে। তাতে তাদের অনিষ্টই হয়। আমরা কি আর plan (মতলব) করে বেরিয়েচি? আমাদের ধারণা ছিল, সংসারে বড় হব, টাকা রোজগার করব। আর সাধ্যমত লোকের উপকার করা—এ ভাবও একটু আধটু ছিল। কিন্তু সব উল্টে পাল্টে গেল। কখন কি হয়ে যায় বলা যায় না। টান এলে আর কিছুই ধরে রাখতে পারে না। ঐ যে চিঠিতে লিখেচ, 'ধর্মকর্ম আগে কত সহজ মনে করতুম, এখন আর তা করি না।'—ঐ ঠিক বুঝতে পেরেচ। তিনটে পথ আছে—বিশ্বাস করে চলা, অবিশ্বাস করে ছেড়ে দেওয়া, আর open mind (খোলা মন) নিয়ে সত্যানুসন্ধান করা। এই শেষটাই হল scientific spirit (বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি)—এই ভাবেই সাধনভজন করে যাও। আর জেনো, atheist (নাস্তিক) হওয়া সহজ নয়। ঠিকঠিক atheist (নাস্তিক) হতে মনের খুব জোর দরকার।

মহারাজের শরীর ভাল নয়। কাজেই তাঁহাকে অধিকক্ষণ কষ্ট দেওয়া অনুচিত একথা বারবার মনে জাগিতেছিল। তাই এইবারে প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'আশীর্বাদ করুন, আমার এসব সন্দেহের ভাব যেন কেটে যায়।'

'হ্যাঁ বাবা, সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করচি তোমার ওসব ভাব কেটে

গিয়ে মন নির্মল হয়ে যাক। আসবে? তবে এস। কোন ভাবনা কোরো না। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'মহারাজ, বহুদিন থেকে ঠাকুরকে জীবনের আদর্শ ধরে আসচি, আজ এইসব সন্দেহ জাগাতে মনে বড় কষ্ট হচ্চে।'

'তা তো হবেই। তা কেটে যাবে, ঠিক কেটে যাবে। একমনে ডাক। সর্বদা নিজের সম্বন্ধে বিচার করবে। যে যত জপতপ প্রার্থনা করবে সে ততই পাবে,—না করলে কে পায়? সর্বদা বিচার করবে, তা হলে কি রকম progress (উন্নতি) হচ্চে-না-হচ্চে নিজেই বুঝতে পারবে। তোমার গুরু তোমায় একটা কিছু দিয়েচেন তো?—সেটা ধরে চলে যাও। তোমার কল্যাণ হোক।'

শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য

অমিয়কথা

(১)

১। ৺কাশীতে একবার ষ্টেশন হইতে একগাড়ীতে পূজনীয় শরৎ মহারাজের সঙ্গে আসিতেছি, হঠাৎ পরিষ্কার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল দেখিয়া বলিলেন, 'বিশ্বনাথের মায়া।'

২। একদিন গিয়া শুনি, শরৎ মহারাজ হরি মহারাজের কাছে কাহারও সম্বন্ধে বলিতেছেন, 'কেবল জ্ঞানচচ্চড়ি করে।' আমি মনে মনে ভাবিতেছি, জ্ঞান-চর্চা করা কি কখনও দোষের হইতে পারে? অমনি শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'যারা ঠিকঠিক জ্ঞানচর্চা করে তাদের কথা বলচি না।' এ নিশ্চয়ই আমার চিন্তার উত্তর।

৩। শরৎ মহারাজের মুখে শোনা: একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মা-দুর্গা গঙ্গাবক্ষ হইতে উঠিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং নিকটে আসিয়া তাঁহার দেহে মিলাইয়া

গেলেন। ঠাকুর পরে হৃদয়কে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'মা দুর্গা-এসে-ছিলেন, এই দেখ, মাটিতে তাঁর পদচিহ্ন রয়েচে।' ঠাকুরের জীবনে এই জাতীয় এই একটিমাত্র দর্শনের কথা শোনা যায়।

৪। গঙ্গারাম মহারাজের কথার উত্তরে একদিন বলিয়াছিলেন, 'যারা ঠাকুর, মার পা ছুঁয়েচে, তাদের কোনকালে দুর্গতি নাই।'

শ্রীজগদানন্দ

(২)

১। কাজকর্মের দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল। ঐ বিষয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজের মতামত জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, 'কাজ করবি কিরে, আগে চরিত্র গঠিত কর্, তারপর কাজ।'

২। কোন ব্যক্তিগত বিষয়ে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলাম, 'মা এইরূপ বল্লেন।' শুনিয়াই উত্তর দিলেন, 'আমি এখনো সব সময় বুঝে উঠতে পারি না, মা বল্লেন কি আমি বল্লুম।'

৩। আমি—'রূপের ধ্যান বড়, না তত্ত্বচিন্তা বড়?' মহরাজ—'তত্ত্বচিন্তা বড়।'

৪। আমি—'Realisation মানে কি অনুভব, না দর্শন?' মহারাজ—'Realisation মানে অনুভব। ঐ অনুভব শুধু দর্শন কেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করার চেয়েও বেশী।'

শ্রীসারদেশানন্দ

(৩)

১। ৺কাশীতে একদিন পূজনীয় শরৎ মহারাজকে নিজের দুঃখ-দৈন্যের কথা বলিতেছিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'গুরুকৃপায় সাধক শেষকালে বুঝতে পারে, সে জীবনে ভালমন্দ যা কিছু করেচে সবই তাকে এগিয়ে দিয়েচে—কেবল এগিয়ে দিয়েচে।'

২। আর একদিন শুনিলাম, স্বামী সর্বেশানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'—একথা আমি ভাল বুঝঁতে পারচি না। পুরুষের মধ্যে মাতৃরূপে সংস্থিতা হন কি করে?' মহারাজ কহিলেন, 'সাধারণভাবে বলা যায় যে, পুরুষের মধ্যেও মাতৃভাব কিছু না কিছু আছে। গীতায় 'অপরেয়ং ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥' —এই শ্লোকে ভগবান জীবমাত্রকেই তাঁর পরা প্রকৃতি বলেচেন। একমাত্র তিনিই পুরুষ, আর সকল জীব তাঁর প্রকৃতি।'

৩। আর একদিন কেহ 'যারা এখানে আসবে তাদের শেষ জন্ম'—একথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, 'এর একটা rational (যুক্তিসঙ্গত) অর্থ করাই ভাল। যারা তাঁর ভাব নেবে তাদের জন্মের একটা শেষ, একটা limit (সীমা) হয়ে যাবে। কারো কারো এই জন্মেই হয়ে যাবে, কারো কারো একাধিক জন্ম লাগবে, তবে অনন্তকাল ধরে জন্মমৃত্যু হবে না। যে যত খাটবে তার তত শীঘ্র হবে।'

৪। জপধ্যান বাদ দিয়া শুধু কাজ নিয়া থাকিবার কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'যতই কাজ থাক্, নিত্য অন্ততঃ দুই ঘণ্টা বসে জপধ্যান করবে। নতুবা ঠিক থাকতে পারবে না—না—না বলচি।'

শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য

(৪)

১। একদিন পুজনীয় শরৎ মহারাজকে বলিলাম, 'ঠাকুর ভবনাথের মায়া খেয়ে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না, বল্লেন, মা খেতে দিচ্চেন না। ঠাকুর তো সত্যসন্ধ, তবে কেন এমন হল?' তিনি কহিলেন, 'ঠাকুরের দুটো ভাব আছে—একটা মানুষভাব আর একটা দিব্যভাব। মানুষভাবে তিনি সকলের উপর অনন্তসহানুভূতি-

পূর্ণ ; যারা তাঁর কাছে আসত তাদের সকলের দুঃখ দূর করতে সচেষ্ট। কিন্তু দূর করবার জন্যে দিব্যভাবে আরূঢ় হয়ে দেখেন, এখনো সময় হয় নি—মার ইচ্ছা নয়।'

২। বেদান্ত প্রচারের কথা উঠিয়াছে। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তি বেদান্ত শ্রবণের অধিকারী। 'আমাদের ওসব নাই, তবে আমাদের বেদান্ত শুনে কি লাভ?'—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে শরৎ মহারাজ কহিলেন, 'তাঁর কৃপায় সব হতে পারে। অধিকারী তিনি তৈরি করে নেন।' একথা শুনিয়া আমি আপন মনে বলিতেছি, 'সবাইকে কি নেন?' অমনি তিনি বলিতে লাগিলেন, 'তাঁর কৃপায় তোমাদের হবে। ক্রমে সাগর উদ্বেলিত হয়ে ভেসে যাবে—ভেসে যাবে—ভেসে যাবে।' বলিতে বলিতে তিনি যেন উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু খানিক পরেই পূর্ববৎ শান্ত ও গম্ভীর হইলেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘটক

(৫)

কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, 'তন্ত্রশাস্ত্র—তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি—আর্ট uphold (সমর্থন) করে। শিল্পীরা প্রতিমা-গঠনে পরিবর্তন করতে পারে, তোমরা না হয় ধ্যানের মন্ত্রের একটু আধটু অদলবদল করে নেবে। যেমন দুর্গা-প্রতিমার কথা ধর; কোন ভক্তের কাছে যে ঠিক এই মূর্তির আবির্ভাব হয়েচে এর কোন রেকর্ড নেই।'

শ্রীঅতুলচন্দ্র চৌধুরী

(৬)

একদিন শ্রীসারদানন্দ-মহারাজকে বলিলাম, 'সব ত্যাগ করে যে সাধনভজন করব তার সার্থকতাটা কোথায়? যদি শেষে এমন দাঁড়ায়

যে সবই মিথ্যে, তখন অবস্থাটা কি হবে?' মহারাজ কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন,—'সাধনভজন করে যদি কিছু না হয়, সবই মিথ্যে দাঁড়ায়, you will be sinning in very good company —in the company of Buddha, Jesus Christ, Chaitanya and Sri Ramakrishna. (তা হলে বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি অতি মহৎ ব্যক্তিরা সাধনভজন করে যে পাপ করেচেন, তোমারও তাই করা হবে।)

আমি—এতেও তো মেনে নিতে হবে যে এঁরা অভ্রান্ত?

মহারাজ—তা তো বটেই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু

(৭)

একদিন শ্রীসারদানন্দ মহারাজকে আমাদের দেশের depressed classদের (অবনমিত শ্রেণীসকলের) কিভাবে উন্নতি হইতে পারে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'Depressed (অবনমিত) কথাটি মনের মধ্যে স্থান দেওয়াই খারাপ। এতে অনুন্নত ব্যক্তিদের আরও অনিষ্ট হবে। তাদের মনে হবে, তারা শক্তিহীন আর উচ্চবর্ণের লোকেরা সত্যই তাদের নীচু করে রেখেচে। এতে তাদের স্বাভাবিক শক্তির জাগরণ হতে বিলম্ব হবে। তা ছাড়া, এরূপ ভাব মনে স্থান পেলে উচ্চশ্রেণীদের প্রতি নিম্নশ্রেণীদের সর্বদা বিদ্বেষভাব জেগে থাকবে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে নির্দেশ করতে হলে 'higher' 'lower' (উচ্চ নীচ) বলাও ঠিক নয়। যখন একই মায়ের সন্তান, তখন সকলের মধ্যে কেউ forward (প্রগতিশীল), কেউ backward (অনুন্নত)—এই বলাই ভাল। যে অনুন্নত তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে একটু দেরী হবে, কিন্তু তাতে দুঃখের কিছুই নাই।'

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ হাজরা

সৎকথা

[বিভিন্ন সময়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজের সঙ্গে আমার নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হইয়াছে।]

১। আমি—মহারাজ, আমি বহু বহু লোকের সঙ্গ করেচি, কিন্তু আপনাদের কাছে এলে যেমন আনন্দ পাই, তেমন আর কোথাও পাই না কেন ?

মহারাজ—বহুদিনের পরিচিত কিনা, তাই।

২। আপনাদের কাছে এলে আমার জপতপ হয় না, মনটা কেমন শুদ্ধ হয়ে যায়—এর কারণ কি ?

উঃ—ঠাকুরবাড়ী— সন্ধ্যাপূজা নাই, নিজেই মন স্থির হয়ে যায়।

৩। আপনার কাছে বসলে খুব আনন্দ পাই, কিন্তু হঠাৎ এমন সংস্কার জেগে উঠে যাতে আমায় অস্থির করে দেয়। মনে হয়, উঠে যেতে পারলে বাঁচি।

উঃ—সত্ত্বগুণটি ভিতরে ঢুকে পড়ে কিনা, তাই তোর ভিতরের আবর্জনাগুলি ভেসে উঠে। এ খুব ভাল।

৪। অনেক সময় দেখি, কতকক্ষণ জপ করার পর জপ আর হতে চায় না। ধ্যান করতে যাই, তাও হতে চায় না। মনটি স্থির হয়ে থাকে আর জপধ্যান করতে কষ্ট হয়।

উঃ—কতটা সময় ঐভাব থাকে, দেখেচিস ? আর তাতে আনন্দ পাচ্চিস কিনা ? যদি আনন্দ অনুভব করিস, তাহলে মনে করবি সত্তায় আছিস। ওকেই জ্ঞানের আভাস বলে।

৪। আপনাদের কাছে এসেচি, তবে কি কিছু করবার নাই ? আপনাদের উপর, কি ঠাকুরের উপর, নির্ভর করলে হবে না ?

উঃ—হ্যাঁ, নির্ভরতাও চাই, পুরুষকারও চাই। ধ্যানজপ করবার যে ইচ্ছা, এও তাঁরই ইচ্ছা বা কৃপা মনে করবি।

৬। মন এখনো ঠিক হচ্চে না কেন ?

উঃ—নাম করা ঠিক হচ্চে না। ইষ্টনাম ঠিক ঠিক হলে এসব সংস্কার আপনি চলে যাবে। তবে ওদিকে খেয়াল করিস না; তুই হাঁটতে চলতে সর্বদা নাম করে যা।

৭। অনেকে মূর্তি, দেবদেবী দর্শন করেন, শুনি। আমার তো দর্শনাদি হয় না।

উঃ—আসল জিনিষ হচ্চে, তুমি ষোলআনা মন তাঁকে দিলে কিনা। সকলেরই যে দর্শন হবে এমন কোন কথা নেই।

৮। শ্বাসে প্রশ্বাসে সব সময় নামজপ না হতেই নামরূপ বাদ দিয়ে নিরাকার-ধ্যান কিরূপে সম্ভব ? একথা আমি বুঝতে পারি না।

উঃ—ও একরকম আছে। দেখিস নি ঠাকুরের উপদেশে আছে, নেতি-নেতি বিচার। অনেকে কতকদিন জপতপ করে [চিত্তশুদ্ধি হইলে] 'নেতি-নেতি বিচার' করে উঠে যায়।

৯। সকলে কি ভাবে চলবে ?

উঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এসেছিলেন, অর্জুনও এসেছিলেন। তাঁদের ভাবে সকলকে চলতে হবে। নূতন কেউ কিছু করতে পারবে না। স্বামিজী বলেচেন, 'ওরে, আমি যা বলেচি, তার উপর মক্স করিস; তা না হলে গোলমাল হয়ে যাবে।'

১০। মহারাজ—যার এখানে আছে, তার সেখানে আছে। যারা এখানে মা, স্বামিজী, মহারাজ প্রভৃতিকে পেয়েচে, তারা সেখানেও তাঁদের পাবে। সেখানে কেবল আনন্দ। কেবল 'বাড়ী বাড়ী' করিস, তোদের বাড়ী সেখানে ঠিক হয়ে আছে। মা আর ঠাকুর যে ঘরে বসেচেন, তাদের আবার ভয় কি।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়

সারদানন্দ-স্মৃতি

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ৺জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে। ১লা এপ্রিল কর্মস্থল হইতে বাহির হইয়া রাত্রে কলিকাতা পৌঁছি ও পরদিন সকালে বিষ্ণুপুর রওনা হই। মহারাজের সঙ্গে একগাড়ীতে উঠিয়াছি, দীর্ঘ আটনয় ঘণ্টা একসঙ্গে থাকিবার সুযোগ পাইলাম। যতক্ষণ তাঁহার নিকট ছিলাম, ভিতরে আপনা হইতে জপ চলিতেছিল। জয়রামবাটী হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় প্রণাম করিতে যাইতেছি, বলিলেন, 'এস বাবা, এস।' এমন মধুরভাবে উচ্চারিত কথা আর কখনও শুনি নাই। হরি মহারাজের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি একবার পাইয়াছিলাম, দুইই যেন একজাতীয় জিনিষ।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে কলিকাতায় গিয়াছি, মহারাজ বড়ই যত্ন করিলেন। সম্প্রতি তাঁহার বেরিবেরি হইয়াছিল, বাম পা-খানি লম্বা করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া বলিলেন, 'দেখ না, ফুলোটা এখনো কমে নি—আঙ্গুল বসে যাচ্চে।' আমি হাত বুলাইয়া দিলাম।

১৯২৫ অব্দে ৺পুরী যাইয়া সৌভাগ্যবশতঃ মহারাজের দলভুক্ত হইয়াছিলাম। সেখানে শুনিলাম, পুরী আসিবার পথে কোন বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই মহারাজের সঙ্গে আগত দী— তাহার তত্ত্বতালাস করিতেন, কিন্তু সঙ্গের মেয়েদের খবর লইতেন না। ভাবিয়াছিলেন, তিনি ইহাতে খুসী হইবেন; কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ হইল। মহারাজ খুব বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি যখন অতটা যত্ন করে আমার খোঁজ-খবর নিলে, তখন মেয়েদেরও নেওয়া উচিত ছিল। আমার সঙ্গে যখন এসেচ, তখন মেয়েদের প্রতি ঔদাসীন্য দেখানোটা ভাল হয় নি।'

পুরীতে একদিন মহারাজকে কিসে কাম দূর হয় জিজ্ঞাসা করিলাম। মহারাজ কহিলেন,—ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমারই কি সব কাম গেচে? সব আছে, তবে মাথা তুলতে পারচে না।' মানুষ তো

কাঠপাথর হবে না, সব sentimentই (ভাবই) থাকবে, তবে অভিভূত করতে পারবে না। কামচিন্তা এল, গেল—মন দিয়ো না। তাঁর চিন্তাই কর।

কোন জিজ্ঞাসা মনে জাগিলে সকল সময়ে মহারাজকে প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইত না। কখন কখন মনেই উত্তর আসিত, কিম্বা মহারাজ অযাচিতভাবে উত্তর দিতেন। বিধু বলিল, উদ্বোধনের ছোট ঘরটিতে বসিয়া সে মনে মনে বলিতেছিল, 'সাধনায় এগুতে পারচি না, মহারাজ যদি কিছু করে দেন তো বাঁচি—অন্য উপায় দেখি না।' ঘরটি লোকপূর্ণ। মহারাজ আপনা হইতে বলিতেছেন,—এক ব্যক্তির প্রবল ইচ্ছা হয়েচে অতুল ঐশ্বর্য লাভ করবে। এক সাধু বলে দিলেন, 'সব ছোড়ে সব পাওয়ে।' লোকটি সাধুর কথা শুনে নিজের যা কিছু সম্বল ছিল এককালে ত্যাগ করল, আহারনিদ্রার খেয়ালও রইল না। ফলে তার অত্যন্ত আমাশয় দেখা দিল। তখন সে শৌচে বসে ভাবচে, 'ভগবান, ধন তো পেলুমই না, শেষে কিনা এমন কঠিন রোগ দিলে!' এমন সময় খানিকটা মাটির চাপ ভেঙ্গে পড়ে কয়েক ঘড়া মোহর বেরিয়ে পড়ল। ধন পাইয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু আমাশয় না হলে হয় না।

পুরীতে মহারাজ শান্তভাব কাহাকে বলে এইরূপে বুঝাইয়াছিলেন,—ভগবানের সহিত সখ্য-দাস্যাদি কোনরূপ সম্পর্ক না রেখে মনঃ-সংযমপূর্বক তাঁর স্মরণমনন করাকে শান্তভাব কহে। যাহা যাহা মনকে বিষয়াভিমুখী বা বিক্ষিপ্ত করে সেই সকল বিষয় থেকে মনকে নিবৃত্ত করে তাঁতে স্থাপনের চেষ্টাই শান্তভাবের সাধনা।

কলিকাতায় একদিন ধনগোপালবাবুর লিখিত বইয়ের প্রসঙ্গ হইতেছিল। মহারাজ কহিলেন, 'মায়াবতী থেকে ঠাকুরের যে জীবনী বেরিয়েচে তার দ্বারা সাহেবদের বিশেষ সুবিধা হবে না। যারা ঠাকুরকে আগে থেকেই ভক্তি করতে আরম্ভ করেচে, তাদেরই উপকার

হবে। আমার তো ইচ্ছা ছিল একখানা জীবনী ইংরাজীতে লিখি। লীলাপ্রসঙ্গ লেখবার সময় দুইতিন অধ্যায় লেখাও হয়েছিল। ঘটনাগুলি ঠিক রেখে এমনভাবে লেখা যায় যাতে সাহেবরা আকৃষ্ট হতে পারে; কিন্তু তা পারলুম কই?'

ম্যাক্সমুলার-লিখিত ঠাকুরের জীবনীর কথায় মহারাজ বলিলেন, 'ম্যাক্সমুলারের খুব বিস্ময় ছিল যে কেশববাবুর চিন্তার ধারা হঠাৎ আশ্চর্য-ভাবে বদলে গেল কি কারণে। তিনি বাইবেলের শিক্ষাদ্বারা অনু-প্রাণিত হয়ে প্রচারাদি করছিলেন, আদি ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে যাবার হেতুও অনেকটা তাই। স্বামিজীই ম্যাক্সমুলারকে বুঝালেন যে ঠাকুরের প্রভাবই সেন মশায়ের পরিবর্তনের কারণ।'

[মহারাজের মুখে বিভিন্ন সময়ে শ্রুত কথাগুলি শ্রেণীবিভাগ-ক্রমে সাজাইয়া দেওয়া হইল।]

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামিজীর কথা

"ঠাকুর ধর্মলাভ সহজ করে দিতেই এসেছিলেন। আচারনিয়মের বাড়াবাড়িতে মানুষ পিষে যাচ্ছিল। ভগবানের ভজন করবার জন্যে স্থানকালের অপেক্ষা অনাবশ্যক, যেকোন অবস্থায় তাঁকে ডাকা চলে। শুচি-অশুচির কোন তোয়াক্কাই তিনি রাখেন নি। আর উপায়?—যা তোমার ভাল লাগে। সাকার ভাল লাগে?—তাতেই হবে। নিরাকার ভাল লাগে?—লেগে থাক, ওতেই তোমার উন্নতি হবে। ভগবান আছেন কি নাই সন্দেহ হয়েচে?—আচ্ছা তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর, 'প্রভু তুমি আছ কি নাই জানি না, তুমি সাকার কি নিরাকার যেরূপ হও আমাকে বুঝিয়ে দাও।' কাপড় ছাড়া, স্নান করা, তিলক কাটা, বিছানা ছাড়া—পার তো কর, অসুবিধা হয়, ওদিকে খেয়াল না দিয়ে তাঁকে ডেকে যাও।

"ঠাকুর মঘা, অশ্লেষা, যোগিনী, ত্র্যহস্পর্শ, দিক্‌শূল, বৃহস্পতিবারের

বারবেলা খুব মেনে চলতেন। কেন মানতেন তা বলতে পারি না। তিনি অনেক জিনিষই বিশ্বাস করতেন। তিনি মানতেন বলেই আমরা মানি। যখন আমেরিকায় ছিলুম, ওসব দিনক্ষণ মনেই আসত না। আর এসব গণনা বর্তমানে নির্ভুলও নয়।

"ঠাকুর শ্রাদ্ধের অন্নগ্রহণে ভক্তির হানি হয় বলতেন। মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হয়ে সমুদ্রে পড়েছিলেন। এক ধীবর তাঁকে জালে পায়। ভাবের জন্যে তাঁর শরীরে নানা বিকৃতি ঘটেছিল, তাঁকে নেড়েচেড়ে দেখতে ধীবরের প্রেমের উদয় হয়। পূর্বে সে হরিনামের কোন ধার ধারত না, এক্ষণে বিভোর হয়ে মুহুর্মুহু হরিনাম উচ্চারণ করতে থাকে। এদিকে মহাপ্রভুর অনুচরেরা তাঁর সন্ধানে বেরিয়েচেন। ধীবরের বৃত্তান্ত শুনে, এ নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর কার্য স্থির করে তাঁরা তাঁর সন্ধান পেলেন। ধীবরের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবার উপায় জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁরা আদ্যশ্রাদ্ধের অন্ন খাওয়াবার উপদেশ দিলেন।

"উত্তম শরীর আর উত্তম মেধাপ্রাপ্তি আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শরীর ও বুদ্ধি নির্মল না হলে ভগবৎসাধন হয় না। ভগবানের তৃপ্তি-সাধনের জন্যে নিবেদিত অন্নগ্রহণে শরীরমন বিশুদ্ধ হয়। শ্রাদ্ধের, বিশেষতঃ আদ্যশ্রাদ্ধের অন্ন প্রেতের তৃপ্তির জন্যে দেওয়া হয়। যেমন ভাব নিয়ে আহার করবে, শরীরমনও তেমনি ভাবে গঠিত হবে।

"ঠাকুর একদিন কোন ব্যক্তির 'সংসারে কি ভাবে থাকব' এই প্রশ্নে ঢেঁকির vision (দৃশ্য) দেখেছিলেন। দেখেই বলেছিলেন, 'ধান ভানবার সময় দশটা কাজ চলে বটে, কিন্তু মনটা হাতের উপর থাকে। তেমনি মন ভগবানে রেখে সকল কাজ করতে হবে।'

"কামকাঞ্চন ত্যাগ করে ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে হয়—একথা বুঝাতে গিয়ে ঠাকুর দেখেছিলেন, হালদার-পুকুর পানায় ঢাকা—একব্যক্তি পানা সরিয়ে স্ফটিকজল পান করচে। পানা—কামকাঞ্চন।

"কেশব সেন 'যত মত তত পথ'—এই সত্যের ঠিকঠিক ধারণা করতে পারেন নি। তিনি বুঝেছিলেন যে, সকল ধর্মে অল্পাধিক সত্য আছে, তাই বিভিন্ন ধর্মের সারভাগ সংগ্রহ করে 'নববিধান' সৃষ্টি করলেন। ঠাকুরের experience (অনুভূতি) ভিন্নরকমের। তিনি প্রত্যেক ধর্মের প্রচলিত সাধনপদ্ধতি অবলম্বন করে, কিছুই ছাঁটকাট না করে, সেই ধর্মের চরম উপলব্ধি লাভ করেছিলেন।

"ঠাকুরের তিথিপূজার দিন আমরা সকল দেবদেবীর সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মহাপুরুষদের পুজা করে থাকি। আমরা 'মহম্মদায় নমঃ' বলে আর আর মহাপুরুষদের সঙ্গে তাঁরও পুজা করে থাকি। কেনই বা করব না ? ঠাকুর দেখিয়েছিলেন, 'যত মত, তত পথ।' অনেককাল পরে তিথিপূজার সময় মঠে এসে দেখলুম, এখনো ঐভাবেই পুজা চলচে। গিরিশবাবু একদিন দেখে বড় খুসী হয়ে বলেছিলেন, 'ও বাবা, এ যে দেবতার গাঁদি—যে যার পুজা নিয়ে চলে যাচ্চেন !' বরানগর মঠে সকালে আটটায় পুজায় বসত, সকল পুজা শেষ করতে রাত চারটা বেজে যেত।

"ঠাকুরের শরীর অত্যন্ত সুস্থ ছিল, নতুবা অত সাধনা সম্ভবপর হত না। আহার নিদ্রা কিছুরই ঠিকানা ছিল না। আধসের থেকে দশ-ছটাক চালের ভাত খেতেন, সুস্থ অবস্থায়। ভাবাবেশে অনেকসময় অত্যধিক খেয়ে হজম করতেন।

"ঠাকুরের লজ্জাসরম একেবারেই ছিল না। পরণে কাপড় প্রায়ই থাকত না। একদিন জামা গায়ে রয়েচে দেখে বলচেন, 'দেখ, গায়ে জামা—ভদ্র হয়েচি।' শ্রোতারা হাসতে লাগল। তখন হুঁস হল যে পরণে কাপড় নাই। পঞ্চবটী পর্যন্ত গিয়ে কাপড় খুলে ফেলতেন। আমরা কেহ গাড়ু হাতে করে দাঁড়িয়ে আছি—বাহ্যে সেরে এসে শৌচ করবেন, জল ঢেলে দিতে হবে। পায়ে চটিজুতা থাকত, শরীর বড় কোমল হয়েছিল, খালি পায়ে হাঁটতে পারতেন না।

"শিশুকালে ঠাকুরের গণ্ডমালা ছিল, পরে ক্যান্সার হয়। গণ্ডমালা আর যক্ষ্মা বোধ হয় এক পোকা থেকে হয়।

"একদিন সংকীর্তনের মধ্যে ঠাকুর চলেচেন, তাঁকে অনেকটা দীর্ঘ বলে মনে হয়েছিল। অনেকবার দেখে ঐ সিদ্ধান্ত করেছিলুম।

"ঠাকুরের নিকট বিভিন্ন ভাবের ভক্ত এলে তাঁর সেই সেই ভাব হত। কেহ হয়তো শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, ঐরূপ ব্যক্তি কাছে এলে ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণভাব আসত। শাক্তভাবের সাধক কাছে এলে শক্তির আবির্ভাব অনুভব করতেন। মহাভাব রাধিকা, চৈতন্য মহাপ্রভু, আর ঠাকুরের জীবনে দেখা গেচে।

"আমাদের ঠাকুরের অসীম শক্তি ছিল। অপরের মনে ধর্মভাব জাগাবার শক্তি তাঁর আশ্চর্যরকমের ছিল। কারো যোগবিভূতি থাকলে, যখন সে তাঁর নিকট আসত তিনি নিজের মধ্যে তার বিভূতি টেনে নিতেন। বিভূতি লোপ পাওয়ায় ধর্মজীবনের অন্তরায় দূর হত।

"ঠাকুর না এলে আমরা আর বেশী কি হতুম?—স্বামিজী একটা মস্ত উকিল হতেন, আমি হয়তো একটি বড় ডাক্তার হতুম।

"ঠাকুরের শরীর যাবার পর যোগীন-স্বামী মা, গোলাপ-মা প্রভৃতিকে নিয়ে বৃন্দাবন যাচ্ছিলেন। গাড়ীর মধ্যে যোগীন-স্বামীর ভীষণ জ্বর। যতক্ষণ হুঁস ছিল ততক্ষণ কেবলই ভাবতেছিলেন, কি করে এঁদের বৃন্দাবনে নামাব! এই সময়ে তাঁর একটি vision (দর্শন) হয়। দেখলেন, ঠাকুর স্থির হয়ে বসে আছেন, নিকটেই বিকটাকৃতি জ্বরাসুর। সে কেবলই বলচে, 'তোকে দেখে নিতুম, তা পারলুম না—তোর গুরু পরমহংসের জন্যে। তোকে এখনই ছেড়ে দিতে হচ্চে। যাক্, এই বেটীকে (লালকাপড়-পরা একটি স্ত্রীমূর্তি দেখিয়ে) রসগোল্লা দিস।' ভোরেই জ্বর ছেড়ে গেল। মাও গাড়ীর মধ্যে ঠাকুরকে দেখেছিলেন। জয়পুরে গিয়ে মন্দিরে লালকাপড়-পরা

ঐ দেবীমূর্তি দেখতে পেয়ে যোগীন-স্বামী যোগীন-মাকে বৃত্তান্ত বল্লেন। আশ্চর্য, নিকটেই একটি রসগোল্লার দোকান। একটাকা কি একটাকা দু আনার রসগোল্লা কিনে দেওয়া হল। ঐ বেটী সম্ভবতঃ শীতলা। ঠাকুরের কৃপা না হলে হয়তো যোগীন-স্বামীর বসন্ত হত।

"একদিন ভাগবতপাঠ প্রসঙ্গে দক্ষরাজার মেয়েদের কথা হচ্ছিল। হঠাৎ মা বলে উঠলেন, 'জানি গো তাদের জানি। ওরা আমার বোন।' গৌরী-মা সঙ্গে ছিলেন, তিনি বল্লেন, 'এইবার সকলকে বলে দেব। আমাদের কথা তুমি গায়ে তোল না, আজ তো নিজমুখেই স্বীকার করলে।' তখন মা কাতর হয়ে বল্লেন, 'কাকেও কিছু বোলো নি, আমি কি বলতে কি বলেচি!'

"মা যোগীন-মহারাজের হাত থেকে বৃন্দাবনে একদিন মিষ্টান্ন খেলেন। তারপর পান চেয়ে নিয়ে তার খানিকটা ফেলে দিয়ে খেলেন, যেমন ঠাকুর করতেন। মা ভাবে বিভোর হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, নিকটেই যোগীন-স্বামী। সেদিন মা ঠাকুরের ভাবে আবিষ্ট। সেইরূপ কথা কওয়া, পান খাওয়া। সে সময় মার লজ্জা একেবারেই ছিল না।

"বৃন্দাবনে মা যোগীন-মহারাজকে মন্ত্র দেবার জন্যে তিনদিন ঠাকুরের আদেশ পেলেন। পরে তাঁকে মন্ত্র বলে দিলেন। যোগীন-মহারাজ বলেছিলেন, ঠাকুর তাঁকে একটা কিছু বলবেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু বলে যান নি।

"বিষ্ণুপ্রিয়া লোকচক্ষুর আড়ালে সাধনসমুদ্রে ডুবে থাকতেন। মহাপ্রভুর তিরোধান হয়েচে, একব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে নীলাচল পর্যন্ত গিয়ে সেকথা জানতে পারেন। তখন তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট এলে বিষ্ণুপ্রিয়া, সেই প্রথম, ঐ ব্যক্তির সামনে এসে তাঁকে আদরযত্ন করে উপদেশাদি দিলেন।

"শেষ-জীবনে রাধুর ব্যাপার নিয়ে জয়রামবাটীর লোকেরা বলত,

মার মায়া হয়েচে। কিন্তু তিনি যে ঐ উপায়ে নিজেকে ঢেকে রাখতেন তা তারা বুঝতে পারত না।

"ঠাকুর নিজের প্রকট অবস্থায় মা-ঠাকরুণকে নিত্যরাণীর কথা বলেছিলেন। ঐ রাণী স্বামীর জীবনকালে কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি পরতেন, স্বামীর দেহরক্ষার পর কাঁচের গয়না ভেঙ্গে ফেলে সোনার অলঙ্কার পরলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'এখন আমার স্বামী অমর হয়েচেন, তাই ঠুনকো কাঁচ ফেলে দিয়ে সোনার অলঙ্কার পরেচি।' ঠাকুরের দেহরক্ষার পর মা বালা খুলে ফেলতে গেলে ঠাকুর দর্শন দিয়ে বাধা দিলেন। মা একবার বৃন্দাবনে, আর একবার কামারপুকুরে অলঙ্কার ছেড়ে থানধুতি পরতে সঙ্কল্প করেছিলেন, কিন্তু ঠাকুর বাধা দেন।

"গিরিশবাবুর বাড়ীতে দুর্গাপূজা। মা অষ্টমী-পুজার দিন ভাবাবেশে মিষ্টান্নাদি খেলেন। পরদিন অনেক চেষ্টা করেও মাকে কিছুই খাওয়ানো গেল না। আগের দিন খেয়েচেন, আজ কেন খাবেন না—জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, 'সেদিন আমি 'আমি' ছিলুম না। আজ বেশ্যার ছোঁয়া অন্ন কি করে খাই?'

"মা আদৌ প্রচার হতেন না। একদিন যোগীন-মাকে বল্লেন, 'তোমাদের সবারই ভাবসমাধি হয়, আমার কিছুই হয় না—ঠাকুরকে একবার বোলো তো।' যোগীন-মা সরল লোক, ঠাকুরকে একথা বলতে ঠাকুর চুপ করে রইলেন। তারপর একদিন পূজা করবার সময় মার হাসি, অশ্রু ইত্যাদি দেখে যোগীন-মা অবাক হলেন। মাকে বলতে 'ওসব কিছু না' বলে উড়িয়ে দিলেন।

"মা বলতেন, 'দোষদৃষ্টি বড় খারাপ। আমার উটি ছিল। বৃন্দাবনে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করায় তবে গেচে।' বাস্তবিক মা কারো দোষ দেখতেন না, দেখালেও বুঝতেন না। কোন লোকের দ্বারা বড়ই

ক্ষতি হচ্চে মার নিকটে বলায়, হয়তো মানলেন। তাকে ডেকে বল্লেন, 'ছেলেরা তোমার উপর বিরক্ত হয়েচে, দিনকতক এদিক ওদিক থাক।' সেও দুচার দিন বাদেই আবার জুটল। মা তার সহায়।

"স্বামিজীর বিলাত যাবার আগে মার এক vision (দর্শন) হয়েছিল। ঠাকুর আর স্বামিজী হাত ধরাধরি করে গঙ্গায় নাবলেন। নেবেই ঠাকুর গঙ্গার জলে মিশে গেলেন। স্বামিজী খুব উত্তেজিত হয়ে আবেগভরে গঙ্গাজল ছিটাতে লাগলেন। এই vision (দর্শন) এত জীবন্ত হয়েছিল যে মা দুইদিন গঙ্গায় পা দিতে পারেন নি—ঠাকুর গঙ্গায় মিশে আছেন এই বোধের জন্যে।

"স্বামিজী বলতেন তাঁর নিকট vision (মানস-প্রতিচ্ছবি) অনেক সময় inverted (উল্টা) হয়ে আসত। ইচ্ছামাত্র যেকোন vision (চিত্র) আসত এমন নয়। আমার সম্বন্ধে একদিন কিছু বলতে চেয়েছিলেন, তা পারলেন না; বল্লেন, 'আজ হবে না, পেট গরম হয়ে রয়েচে।'

"স্বামিজীর শক্তি দেখে এক সাহেব কিছু মতলব করে তাঁর কাছে যাওয়াআসা করত। একদিন স্বামিজী হঠাৎ তার হাত দেখে সে এ পর্যন্ত যা কিছু করেচে সব বলে দিলেন। গুডউইন্ বলত, স্বামিজীর কথায় সেই লোকটির মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। লোকটি আর স্বামিজীর কাছে আসে নি।

"ওদেশ থেকে ফিরে এলে স্বামিজীর শরীর একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি বলতেন, 'যা কিছু ওদেশে রেখে এসেচি। বক্তৃতার সময় এই শরীর থেকে শক্তি বেরিয়ে শ্রোতাদের অনুপ্রাণিত করত।' একটা দেশের চিন্তার ধারা বদলে গেল—চারটিখানি কথা নয় তো।

"স্বামিজী এদেশে ফিরে এলে অনেকে তাঁকে শক্তিসঞ্চার করবার জন্যে অনুরোধ করেন। উত্তরে স্বামিজী বলেছিলেন, 'বক্তৃতা করতে করতে ঐ শক্তি ক্ষয় হয়ে গেচে, এখন আর পারব না।'"

একজন মঠ হইতে ফিরিয়া 'মহাপুরুষ'-কথিত স্বামিজীর 'গায়ত্রী' দর্শনের কথা উত্থাপন করিলে মহারাজ বলিলেন, 'একটু ভুল হয়েচে। স্বামিজী ধ্যান করবার কালে দেখেন নি—স্বপ্নে দেখেছিলেন। গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে, উষার আবির্ভাব চারদিকে—আয়াহি বরদে দেবি, ইত্যাদি স্বর করে গীত হচ্চে শুনলেন। স্বামিজী এই সময় বেদের পঠন-পাঠন করছিলেন। ঐ দর্শন স্বামিজীর উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর একদিন তুলসী মহারাজের বাড়ীতে বেলা দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত যন্ত্রসাহায্যে, তন্ময় হয়ে, গায়ত্রীর আবাহন—'আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ॥'—এই কয়টি কথা আলাপ করেছিলেন। মঠেও অনেকবার গায়ত্রীর বন্দনা আলাপ করতে করতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েচেন। তবে তুলসী মহারাজের বাড়ীতে খুব বেশী তন্ময়তা এসেছিল। স্বামিজী যখন ভজন গাইতেন, তখন হুঁস থাকত না। কোথা দিয়ে সময় চলে যেত। স্বামিজীর বাণীদোষ আদৌ ছিল না, যেমন বিশুদ্ধ স্বর তেমনি স্পষ্ট উচ্চারণ। বিশেষ বিশেষ স্থানে উপযুক্ত জোর দেওয়ার ফলে গানের ভাবার্থ ফুটে উঠত।'

একজন বলিলেন, 'মহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] আমাকে বলেছিলেন,—আহা, তোমরা আমাকে দেখেই এত আনন্দ পাও, যদি স্বামিজীকে দেখতে তা হলে কতই না আনন্দ পেতে!' মহারাজ কহিলেন, "তা বৈকি। স্বামিজীর সঙ্গে আমাদের কারো তুলনা হয় না। আমাদের কথা তো ধরবারই নয়, 'মহারাজ'ও ঐ কথাই বলচেন। বাস্তবিক স্বামিজীর নিকট আমরা সকলেই pigmies (বামন)। আবার ঠাকুরের তুলনায় স্বামিজীও pigmy (বামন)। কাশীপুরের বাগানে স্বামিজী রামচন্দ্রের উপাসনায় প্রাণমন ঢেলে দিয়েচেন, তাঁর ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা বারবার করে ঠাকুর

শেষে বলচেন, 'এখানে যে তোড়টি এসেছিল তার তুলনায় এর ব্যাকুলতা সিকিও নয়!' এবার ঠাকুর কোথাকার লোক ছিলেন, বুঝে নাও।

"ঠাকুরের বড় ভয় ছিল, পাছে নরেন্দ্র তাঁর ভাব সমগ্র আয়ত্ত না করে দুইএকটি দিক মাত্র দেখেই একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি করে বসে। সেই কিশোরবয়সেই কেশব সেন প্রভৃতি তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন, তাঁর পক্ষে ঐ সমাজে একটা নেতা হওয়া একটুও অসম্ভব ছিল না।

"কোন কোন উপনিষদে অদ্বৈতভাবের, কোন কোনটিতে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবের বহু শ্লোক রয়েচে। ঐগুলিকে টেনেবুনে একভাবের অর্থবোধক করবার চেষ্টা তিনি আদৌ করেন নি। সকল ভাবই সত্য —মনের বিভিন্ন অবস্থায়। চরম সত্য হচ্চে অদ্বৈতোপলব্ধি।

"স্বামিজীর interpretation (ব্যাখ্যা) ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরকে যিনি বুঝতে যাবেন, ঠাকুরের ভাব ঠিকঠিক তিনি ধরতে পারবেন না। অনেকে ঠাকুরের উক্তিগুলিই বেদবেদান্ত বলে চালাতে চায়। বেদ-বেদান্ত ঠাকুরের জীবনী ও উক্তিসকলের সাহায্যে interpret (ব্যাখ্যা) করতে হবে, বেদবেদান্তই অবলম্বনীয়।

"স্বামিজী না বুঝালে আমরা ঠাকুরের কিছুই বুঝতুম না। ধর না, ঠাকুর বৈষ্ণবধর্মের 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন' সম্বন্ধে আলোচনা করচেন। 'জীবে দয়া'—এইকথা উচ্চারণ করেই তিনি বলচেন, 'থু, থু। জীবে দয়া! জীবে দয়া করবার তুমি কে? দয়া নয়, শিব-জ্ঞানে সেবা।' একঘর লোক এইকথা শুনেছিল, কে কি বুঝত? স্বামিজীই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলেন। বল্লেন, 'আজ এক অপুর্ব কথা শুনলুম—অদ্বৈতজ্ঞান আর ভক্তির একত্র সমাবেশ। যদি বেঁচে থাকি, জগতের নিকট এসত্য প্রচার করব।

"'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' পুস্তকখানি দেখেচ? বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত ধর্মের যে রূপ প্রকটিত হয়েচে, তার সার সঙ্কলন

করে ঠাকুর যে অবতারবরিষ্ঠ তা বুঝিয়েচেন। তিনি ঐরূপ না বুঝালে আমরা কেহ কেহ হয়তো 'অবতার' পর্যন্তই বলতুম। যেমন, রামচন্দ্র দত্ত ঠাকুরকে চৈতন্যপ্রভুর অবতার জ্ঞান করে তখনকার কোন্ কোন্ ভক্ত এখন কার কার মধ্যে আবির্ভূত হয়েচেন—এই মীমাংসায় নিযুক্ত ছিলেন।

"স্বামিজী বলতেন, 'আমি ঠাকুরকে এক কণামাত্র বুঝেচি।' ঠাকুর বলতেন, 'দারিদ্র্য নরেনকে দাবিয়ে রেখেচে। দেখ না, অত গুণী লোক একটি সামান্য কর্মের জন্যে ছুটোছুটি করেও তা পেল না। উপযুক্ত সুবিধা পেলে ও একটা কাণ্ড তখন তখনই করে বসত।'

"স্বামিজীর observationএর (পর্যবেক্ষণের) শক্তি কত অধিক ছিল। ভিক্ষা করে দেশে দেশে ঘুরেচেন, আমরাও সেসব স্থানে গিয়েচি। কিন্তু তিনি ঐসব জায়গায় এত খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে মনে রেখেচেন যে, যখন আমাদের বলেচেন তখন আশ্চর্য হতে হয়েচে; আমাদের অপেক্ষা তিনি কত অধিক দেখেচেন তা বলে শেষ করা যায় না।

"জাপান হয়ে আমেরিকা যাবার সময় তিনি জাপানের কোন কোন শহরে নেবে গিয়েছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে জাপানের ভিতরকার অবস্থা বুঝে বলেছিলেন, 'জাপান য়ুরোপের যেকোন দুই দেশের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে লড়বার সামর্থ্য অর্জন করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত, কেবল international statusএর (আন্তর্জাতিক স্থানের) জন্যে অপেক্ষা করচে।' 'The New Orient' (নবীন প্রাচ্য) পত্রিকায় এক সাহেবও দেখচি স্বামিজীর ঐ উক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর সূক্ষ্ম দর্শন-শক্তির প্রশংসা করেচেন। হয়তো তাঁকে স্বামিজী সেকথা বলেছিলেন। দুচার দিনের দেখাশোনায় একটা জাতির pulse (নাড়ী) নির্ণয় করা সোজা কথা নয়।

"মজুমদার মশায় স্বামিজীকে নানাপ্রকারে অপদস্থ করতে চেষ্টা পেয়েছিলেন। স্বামিজী আমেরিকায় মদ খেতেন, বেশ্যাসক্ত ছিলেন—এসকল কথাও বলেচেন! চিকাগো বক্তৃতার পর স্বামিজীর অসাধারণ কৃতিত্বে সকলেই মলিন হয়েছিলেন। এমন কি, তিনি ব্যারোজ-সাহেবের সাহায্যে স্বামিজীর নিন্দাবাদ প্রচার করতে চেষ্টাও করেচেন।

"মিশনারিদের তো কথাই নাই। তারা স্বামিজীর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল। স্বামিজীর বক্তৃতার পর অনেকে টাকা দেওয়া বন্ধ করায় মিশানারিদের অনেকগুলি কেন্দ্র উঠে গিয়েছিল। স্বামিজী যে এদেশের ধর্মের প্রতিনিধি নন একথা প্রমাণ করবার জন্যে, শিশুদের কুমীরের পেটে দেওয়ার প্রথা, রথের চাকার তলায় পড়ে মেয়ে-পুরুষের প্রাণদান, ইত্যাদি ছবিতে এঁকে দেখিয়ে ভারত যে কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতের ধর্মমত কত তুচ্ছ—কত অসার, তা বুঝাবার কত চেষ্টাই না হয়েছিল। স্বামিজীর কথায় আমেরিকার অনেক লোক বুঝেছিল, ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচারক পাঠানো অনাবশ্যক।

"চিকাগো বক্তৃতার পর এক ধূর্ত ব্যবসাদার স্বামিজীর বক্তৃতা কিনে নেয়। সে নানা জায়গায় বক্তৃতার ব্যবস্থা করবে, লাভের অংশ দুজনে ভাগ করে পাবেন। স্বামিজীর উদ্দেশ্য ঠাকুরের ভাব প্রচার করা। ঐ লোকটির কথায় বুঝেছিলেন, আমেরিকায় বুঝি ঐরকমেই ভাবপ্রচার করতে হয়। কিন্তু আজ এখানে, কাল বহুদূরে আর এক জায়গায়, বক্তৃতা করতে করতে শীঘ্রই হয়রান হয়ে পড়লেন। পরে দুইএক জন বন্ধুর পরামর্শে যথাসম্ভব সত্বর ঐ লোকটির সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করলেন। তারপর নিজেই এক ঘর ভাড়া করে নিউইয়র্কে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। এখানে বক্তৃতা বিনা পয়সায় দেওয়া হত। আমাদের দেশে বিদ্যাদান আর ধর্মদান অর্থসাপেক্ষ নয়। সেই ঘরে চেয়ারটেবিল রাখলেন না, ফরাস পাতা থাকত। সেখানেই যত লোক জমা হতে লাগল। নিজে রান্না

করে খেতেন। যাঁরা pioneers (অগ্রদূত) তাঁদের কত কষ্ট করতে হয়। একটা ছোট ঘরে খাবার জিনিষপত্র, মসলাদি থাকত। এক সাহেব একদিন সেই ঘরে ঢুকে প্রত্যেকটি জিনিষ কি জেনে নিয়ে চেখে দেখতে লাগল। এটি খুব বিরক্তিকর ব্যাপার। চক্ষুলজ্জা আর etiquetteএর (ভদ্রতার) খাতিরে স্বামিজী কিছুই বলতে পারচেন না। একটা পাত্রে অনেকগুলি লঙ্কা ছিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, 'এগুলি কি ?' স্বামিজী ভাবলেন এবার ব্যাটাকে জব্দ করতে হবে। 'এগুলি Indian plums' (ভারতের কুল)—বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে সাহেব একমুঠো মুখে দিয়ে মরে আর কি। ওরা ঝাল মোটেই খায় না। লোকটি আর সেই ঘরে ঢুকে নি।

"স্বামিজী কাকেও তাচ্ছীল্য করতেন না। আমরা যাদের সঙ্গে কথা বলতেও ঘৃণা বোধ করতুম তিনি দুই ঘণ্টা বসে তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন। একজন ষাঁড়ের দালালের সঙ্গে আলাপ করে সকল বিষয় জেনে নিলেন। শিখে রাখলেন—আবশ্যকমত খাটাবেন।

"আইন পড়বার জন্যে স্বামিজী ফিস জমা দিয়েছিলেন। একদিন মনে হল, সবই বৃথা, ঠাকুর আর বেশীদিন থাকবেন না। অস্থির হয়ে নগ্নপদে কাশীপুর বাগানে এসে উপস্থিত। তখন বাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ। মাষ্টার মশায়ের কাছে কয়েক মাসের খরচ ধার করে মার হাতে দিয়ে এলেন আর বল্লেন, 'আমাকে আর বিরক্ত কোরো না।' ন'বাবু (গিরিশবাবুর ভাই) তাঁকে খালি পায়ে যেতে দেখে কি হয়েচে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, 'আমার আমি মরেচে।' স্বামিজী গিরিশবাবুকে গোপনে মনের অবস্থা জানিয়ে এসেছিলেন। বাগানে এসে ঠাকুরের কাছে বায়না! তুই কি চাস ?—ঠাকুর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামিজী বল্লেন, 'সমাধিস্থ হয়ে থাকব, কখন একটু নেমে কিছু খেয়েই আবার সমাধিস্থ হব।' শুনে ঠাকুর বল্লেন, 'তোর

কথা শুনে আমার কষ্ট হচ্চে। তুই অত বড় আধার, তোর অমন বুদ্ধি হল কেন? সমাধি অভ্যাস করে ভগবদ্দর্শন লাভ করতে যাবি কেন?' স্বামিজী বল্লেন, 'তা যা মশায় ভাল হয় করে দিন।' ঠাকুর বল্লেন, 'আচ্ছা, বাড়ী একটু গোছাল করে আয়, সব হবে।'

"স্বামিজী ঠাকুরের নির্দেশমত সাধন আরম্ভ করলেন। অবস্থার পর অবস্থা লাভ হল, শেষে একদিন সন্ধ্যার পুর্বে শয়ন-অবস্থায় নির্বিকল্প সমাধি। অনেকক্ষণ পরে দেহবুদ্ধি একটু ফিরল। তখন নিজের মাথা ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ববোধ নাই। 'ও গোপালদা, আমার শরীর কোথা গেল?' গা টিপে গোপালদা বল্লেন, 'এই তো তোমার শরীর এখানেই রয়েচে'!—কিন্তু হুঁস হল না। ঠাকুরের নিকট সংবাদ দিলে তিনি হেসে বল্লেন, 'থাক শালা—আমাকে রোজ জ্বালাতন করে, এখন বুঝুক।' দেখ শরীরের প্রতি মায়া কি সুগভীর। নির্বিকল্প সমাধি হয়েচে এমন লোকেরও শরীর কোথা গেল—এই ভয়।

"ঠাকুরের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখার দিন স্বামিজীর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। স্বামিজী বলেছিলেন, 'তুমি একি করলে!—আমার যে বাপ মা আছে।' এবার সমাধির পর ঠাকুরের নিকট এলে, ঠাকুর ঐ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'সব তো দেখলে। এখন বাক্স বন্ধ—চাবি আমার কাছে রইল, সময় হলেই পাবি।' স্বামিজী সারা-জীবন ঐ সমাধি লাভের জন্যে ছটফট করে বেড়িয়েচেন।...

"ঠাকুরের সমাধিকালে stethoscope (বুকপরীক্ষার যন্ত্র) লাগিয়েও হৃৎস্পন্দন পাওয়া যেত না। চোখে পলক পড়ে কিনা দেখবার জন্যে এক ডাক্তার চোখে আঙুল দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। Life (জীবন) তখন কোথায় থাকে?—কে জানে। হয়তো brainএ (মস্তিষ্কে)।

"স্বামিজীর ঠাকুরকে ধ্যানে দেখে তৃপ্তি হত না। সাদা চোখে অন্য বস্তুর মত দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন। সর্বদা মনে হত কেউ

তাঁর হাত ধরে রয়েচে। অসুখের সময় ঐ হাত তাঁর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিত। তিনি অসুস্থ অবস্থায় কাকেও গায়ে হাত দিতে দিতেন না। অবশ্য একথা সেবককে জানতে দেন নি। দেহরক্ষার কয়েকমাস পূর্বে বলেছিলেন, 'এখন আমার হাত ছেড়ে দিয়েচে। আগেকার মত কেউ আমার হাত ধরে নেই।'

"ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে স্বামিজীকে একমাসের মধ্যে নানা সাধন করিয়ে নির্বিকল্প সমাধি পাইয়ে দিয়েছিলেন। He was the rock upon which the structure was to be built. (তাঁকে ভিত্তি করেই যে গড়নটি দাঁড় করাতে হবে।)

"আবার নির্বিকল্প সমাধি লাভ করব, আর ঠাকুরের একটি স্থান করতে হবে—এইভাব মাথায় নিয়ে স্বামিজী দেশ দেশান্তর ঘুরেচেন।"

আরও অনেকের কথা

"মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি ছিল। যা একবার শুনেচেন, তা প্রায়ই ভুল হত না।

"গিরিশবাবুর খুব একাগ্রতা ছিল। নিজে বই লিখতেন না। হুঁকা হাতে পায়চারি করে বেড়াতেন—চিন্তা করতে করতে ছবির মত সব প্রতিভাত হত। তখন বলে যেতেন। এত দ্রুত বলতেন যে, অন্যের লিখে নেওয়া দুরূহ হত। অতি অল্পসময়ে একখানা নাটক রচনা হত। তিনি বলতেন, 'আমি খোলার ঘর থেকে পরমহংস পর্যন্ত সকল অবস্থার লোক দেখেচি, আমার অঙ্কিত চরিত্রের সমালোচনা বাইরের লোকে কি করবে।'

"শঙ্করাচার্য গিরিশবাবুর অতি চমৎকার সৃষ্টি। তিনি যখন অভিনয় করতেন, stageএ (রঙ্গমঞ্চে) একটা ধর্মভাব এনে দিতেন।

"ঈশান মুখুজ্যে মশায় বিদ্যাসাগরের মত দাতা ছিলেন। সারাদিনের

পর খেতে বসেচেন, এমন সময় হয়তো ভিক্ষুক এসে উপস্থিত। নিজের অন্ন ভিক্ষুককে ধরে দিয়ে সামান্ত কিছু খেয়ে দিন কাটালেন।

"ঠাকুর বলতেন, 'হরীশ যেন জ্যান্তে মরা।' ও চলত ফিরত কিন্তু মনটা ভিতরে থাকত, যেন শরীর কাজ করচে। ঠাকুর বলেছিলেন, 'স্ত্রী কষ্ট পাচ্চে, একবার বাড়ী গিয়ে দেখেশুনে আয়।' হরিশ উত্তর দিল, 'ওসব ভাল নয়, ওদের কথা শুনতে নাই।' একথায় ঠাকুর খুসী হয়েছিলেন। বাড়ী যেত না। শেষে মাগীরা তুক্ করলে। ঠাকুর দেখে বল্লেন, 'ওরে সর্বনাশ করেচে—একেবারে উন্মাদ হয়ে গেল!' যা হোক, তাঁর কৃপায় অনেকটা সামলে গিয়েছিল।

"শশী মহারাজের বাপও মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা ছেলেকে ফিরাবার চেষ্টা করেছিলেন। একদিন পরিষ্কার বলেই ফেল্লেন, 'এত চেষ্টায়ও কিছু হল না!' কেনই বা হবে?—ঠাকুরের কাছে আমরা রয়েচি! শশী মহারাজের বাবা পরে আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। সারারাত জপ, মন্ত্রপাঠ করে কাটাতেন। বিজয়ার দিন যাত্রা করে রাখলে সারা বছর যাবার দিনক্ষণ দেখবার আবশ্যক হয় না, আমাদের সকলকে তিনি বিজয়ার দিন যাত্রা করিয়ে রাখতেন।

"কেশববাবুর বক্তৃতা শুনেচি, খুব fire (উদ্দীপনা) ছিল। তিনি অতিশয় sincere (সরল) ভক্তলোক ছিলেন। সুন্দর বক্তৃতা করতেন, চেহারাও সুন্দর ছিল। শেষদিকে রামায়ণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বাঙ্গলা-ভাষায় বক্তৃতা দিতেন—লোকে মুগ্ধ হয়ে শুনত।

"প্রতাপবাবুর অদ্ভুত মতপরির্তন। তাঁকে মহিমা চক্রবর্তীর নিকট বলতে শুনেচি, 'আমরা ধর্মের কি জানতাম?—ষণ্ডার মত চলেছিলুম। উনিই (ঠাকুরই) তো ধর্ম কি, বুঝিয়ে দিলেন।' তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি খুব প্রশংসাসূচক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। কি আশ্চর্য, তিনিই পরে

উল্টো কথা সব বলেচেন—নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা পরমহংসদেব আমাদের থেকে নিয়েচেন, আমরা ভগবানের মাতৃভাব তাঁর থেকে পেয়েচি, ইত্যাদি। এইসব বাদানুবাদ যখন চলছিল তখন হরমোহন তাঁর আগের লেখা প্রবন্ধটি ছাপিয়ে দেয়।

"আমরা যতদুর শুনেচি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বারদীর ব্রহ্মচারী, গয়ার পরমহংস আর আমাদের ঠাকুরের কাছে শিক্ষাদি পেয়েছিলেন। গোস্বামী মশায়ের শাশুড়ী একদিন বলচেন, 'বিজয়ের কি অবস্থা, সে হরিনামামৃত পানে বিভোর হয়ে থাকে।' শুনেই ঠাকুর বল্লেন, 'ও বাবা, আমার কিন্তু তুবেলা না খেলে চলে না।' "

মৃত্যুভয় কিরূপে যায় এই প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলিতেছেন, "মৃত্যুভয় ঈশ্বর-বিশ্বাসে যায়। একটি স্ত্রীলোকের মৃত্যুর কথা বলচি। মেয়েটি বড়ই লজ্জাশীলা, ঠাকুরের খুব স্নেহের পাত্রী ছিলেন। ঠাকুর বলতেন, 'অমন স্ত্রী দশটা থাকলেও পতনের ভয় নাই।' মেয়েটি মৃত্যুর পূর্বে আমাকে ডাকিয়ে গীতা পাঠ করতে অনুরোধ করলে। ওর লজ্জাশীলতার কথা জানা ছিল, পেছন ফিরে গীতা পড়লুম। সেইদিন শেষরাত্রে আবার খবর দিয়েচে। গিয়ে দেখি সে আদৌ লজ্জা করচে না। সকালেও তার অত্যধিক লজ্জাশীলতা দেখে গেচি। সে বলচে, 'আমার যাবার সময় হল না?—মুখ ধুইয়ে দাও। বাসি কাপড়ে যাব না, কাপড় বদলে দাও।' যেন এবাড়ী থেকে ওবাড়ী যাচ্চে! তার ইচ্ছামত সব করা হল। তখন সে বলচে, 'খাট আন, গঙ্গায় যাব।' বিলম্ব হচ্চে দেখে মেয়েটি বড়ই ব্যস্ততা প্রকাশ করতে লাগল, 'কি এখনো এল না—এখনো এল না?' খাট এল, ধরাধরি করে উঠিয়ে দিলে একেবারে মৃতের মত বোধ হল। আমরা মনে করলুম, বোধ হয় দেহ ছেড়ে গেচে। কিন্তু বাবুরাম মহারাজের মা বল্লেন, 'নিয়ে যাও, ও যখন বলেচে তখন গঙ্গায় না যাওয়া পর্যন্ত

প্রাণ বেরুবে না।' গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হল। গঙ্গার দিকে মুখ করে শুইয়ে দিলে একবারমাত্র তাকিয়ে সে দেহত্যাগ করলে!

"আমার এক ভাই মৃত্যুর কিছু আগে বলতে লাগল, 'এই চলে গেল, তোমরা ধর না কেন?—(শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখিয়ে) এই এতদূর পর্যন্ত এসেচে, তোমরা ধর।' আমি বল্লুম, 'যাক না, তুমি ভগবানের নাম কর।' তখন সে ঠাকুরের নাম করতে লাগল।

"গিরিশবাবুর আত্মীয় (প্রমাতামহ চুনিরাম বসু) নারায়ণের প্রসাদ ছাড়া অন্য কিছু খেতেন না। একদিন সুস্থ শরীরে আপিস থেকে ফিরে এলে প্রসাদী অন্ন দুটি বমনের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। তা দেখে তিনি নিশ্চয় করলেন, যখন প্রসাদ পেটে রইল না, তখন মৃত্যু সন্নিকট। তখনই গঙ্গাযাত্রা করলেন। হেঁটেই চলেচেন, পথে খুব একদম প্রস্রাব হল। অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ করায় খাটে উঠলেন। গঙ্গাতীরস্থ হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু হল।

"এক গাঁজাখোর এতদূর নেশার দাস হয়েছিল যে, অর্থাভাবে বাড়ীর ঢেঁকি বিক্রী করে গাঁজা কিনেছিল। একদিন সে হুচোট খেয়ে বেদনা পেল, হাতের জিনিষপত্রও মাটিতে পড়ে গেল। তখন সে কাতরকণ্ঠে বল্লে, 'মা, আমাকে এত কষ্ট দিলি? বেদনা পেলুম, জিনিষপত্রও নষ্ট হয়ে গেল!' সে বাড়ীতে এক আসন করেছিল, তার নীচে গাঁজা, আফিং লুকিয়ে রাখত, শিষ্যেরা এলে মাঝে মাঝে দিত। একদিন সে দলের লোকদের বল্লে, 'গঙ্গাযাত্রার সময় হয়েচে, চল গঙ্গায় যাই।' নেশাখোরের দল তখনই খাটে উঠিয়ে তাকে নিয়ে চল্ল। গঙ্গাতীরস্থ হয়ে দেখলে, এক মুমূর্ষুর কাছে ভাগবত পাঠ হচ্চে। খাট থেকে নেমে সে বল্লে, 'ওর দেরী আছে, আমার সময় হয়েচে।' তারপর নিজেই গঙ্গাগর্ভে কণ্ঠনিমজ্জন করবামাত্র তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।"

প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক Ole Bullএর (ওলি বুলের) কথায় মহারাজ

বলিলেন, 'ইনি নরওয়েকে স্বাধীন করবার কয়েকজন বিশিষ্ট উদ্যোগীদের অন্যতম। বাজাতে বাজাতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যেতেন, ম্যানেজার ফাঁকি দিয়ে উপার্জিত অর্থ লুণ্ঠন করত। একটি রমণী বুলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। মিসেস্ ওলি বুলের নিকট শুনেচি, মিষ্টার বুল ভারী সংযত পুরুষ ছিলেন। Performanceএর (অভিনয়ের) দিন কফি, চা ছুঁতেন না—nervesএর (স্নায়ুর) উপর কর্তৃত্ব থাকবে না, হাত কেঁপে যেতে পারে।'

নানাকথা

ডাক্তার-মহারাজ 'Les miserables' নামক উপন্যাসের Bishop (ধর্মযাজক) প্রভৃতির কথা কহিলেন। মহারাজ বলিলেন, 'বিশপ কাল্পনিক লোক, কিন্তু পওহারী-বাবার আশ্রমে চুরি সত্যি ঘটনা। চোর সাধু হয়ে গিয়েছিল, তাঁর সঙ্গে স্বামিজীর দেখা হয়েছিল। ঠিকঠিক বিশ্বাস কারো প্রতি হলে সে অবিশ্বাসের কাজ করে না।'

খ্রীষ্টানরা মনে করে, যারা যীশুকে ভজে না তাদের অনন্ত নরক। বৈষ্ণবরা মনে করে, যে বৈষ্ণব নয়, জন্মান্তরে বৈষ্ণব হয়ে তবে সে সিদ্ধ হবে। মহারাজ বলিলেন, 'এসব ধর্মের বাইরের কথা। সম্প্রদায়-রক্ষার জন্যে পরবর্তী কালে ঐসকল অনুশাসন প্রচলন করা হয়েছিল।'

ভয়ের কারণ সম্বন্ধে মহারাজ বলিলেন, 'অনেক সময় ভয়ের কারণ হচ্চে diffidence (আত্মশক্তিতে সন্দেহ)।' এইকথা বলিয়া মহারাজ নিজের প্রথম বক্তৃতা করার ঘটনা উল্লেখপূর্বক কহিলেন, "কালী এখন বক্তৃতা দেয়, কিন্তু স্বামিজী কি করে তাকে বক্তৃতা দিইয়েছিলেন, তার কাছে শোন। সে কাতর হয়ে পুনঃপুন বলতে লাগল, 'আমি কি বলব, কিছুতেই বক্তৃতা দিতে পারব না।' স্বামিজী বল্লেন, 'তাহলে এখান থেকে চলে যা। জানিস তো এদেশে ভিক্ষা দেয় না।' সে কাঁদতে লাগল। তখন স্বামিজী বক্তৃতা লিখিয়ে মুখস্থ

করিয়ে তার দ্বারা বক্তৃতা দেওয়ালেন। প্রশ্নোত্তর নিজেই করলেন।

"অনেকের diffidence (সঙ্কোচভাব) কেটে গেলে গর্ব হয়। ওতে কাজ খারাপ হয়। তবে নিজের শক্তি বুঝে কাজের প্রোগ্রাম করা, আর confidence (আত্মবিশ্বাস) থাকাকে গর্ব বলে না। দেখা যায়, সামর্থ্য না বুঝে মানুষ অনেক কিছু আশাভরসা করে। আমরা যৌবনের রক্তের তেজে নিজের শক্তিসামর্থ্যের over-estimate (অধিক মূল্যনিরূপণ) করি। পরে অভিজ্ঞতার ফলে, ওজন বুঝে নিজেদের adjust (নিয়ন্ত্রিত) করে থাকি। এতে মনে হতে পারে, progress (অগ্রগতি) কম হল বা অধোগতি হচ্চে—তা নয়।"

বৈষ্ণব-সাধনার কথায় মহারাজ বলিতেছেন, 'বৈষ্ণবরা সাধনায় অগ্রসর হয়ে যখন অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হন, তখন ঐ ভাব ত্যাগ করে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধটাই স্থায়ী করে রাখতে চেষ্টা করেন। ভগবানের সঙ্গে একীভূত হওয়া সাধনের অন্তরায় মনে করে ঐভাব উপস্থিত হওয়ার উপক্রমেই তাঁরা সাবধান হয়ে থাকেন। শান্তভাব বৈষ্ণবরা নীচে রেখেচেন আর emotional sideটা (হৃদয়াবেগের দিক) বাড়িয়ে তা সমগ্রভাবে ভগবানে অর্পণ করাই চরম কর্তব্য মনে করেন। emotionএর (হৃদয়াবেগের) চরম হচ্চে মধুরভাবে।'

বৃন্দাবনে মীরাবাইয়ের সঙ্গে রূপ-গোস্বামীর সাক্ষাতের কথা উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন পুরুষ নাই—মীরা বলিয়াছিলেন। মহারাজ কহিলেন, 'স্বস্থ জীব আপনাকে দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত মনে করলেই প্রকৃতি হয়ে গেল।'

অনেক লোক মিশনের নিন্দা করে।···মহারাজ কহিলেন, 'ওসব কথায় কান দেবে না। স্বামিজী আমাদের বলে গেচেন, নিজের দলকে বড় প্রতিপন্ন করবার জন্যে অনেক সময় লোকে প্রবল, উন্নতিশীল দলের নিন্দা করে থাকে।'

নিম্নশ্রেণীর উন্নতিবিধান সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। মহারাজ

কহিলেন, “নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সংস্কৃত-শিক্ষার আবশ্যক। অল্প ব্যাকরণ পড়িয়ে গীতাদি-শাস্ত্র খানিকটা বুঝিয়ে দিলে উচ্চবর্ণের আহাম্মুকি আর বুজরুকি তারা শাস্ত্র quote (উদ্ধৃত) করে ধ্বংস করে দিতে পারবে। রামমোহন রায় যদি সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষার বাহন করতে চেষ্টা করতেন, তা হলে দেশে শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ত। ওতে জাতীয় ঐক্যবিধানের সহায়তা হত। সেই সময়ে সংস্কৃতের খুব চল ছিল—সংস্কৃতভাষায় সংবাদপত্রাদি চলত। ম্যাক্সমুলারের ‘India : what can it teach us ?’ (ভারত আমাদের কি শিখাতে পারে ?) বইখানি পড়। রামমোহন রায় ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করে দেশটাকে ৫০ বছর পিছিয়ে দিয়েচেন—স্বামিজী বলেছিলেন।

“আর্য সমাজ নানাস্থানে কেন্দ্র করে খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি জাতিকে হিন্দু করবার চেষ্টা করচে। হিন্দুসমাজ থেকেও একটি মিশন ঐ কাজ করচে। তবে আর্য সমাজের তুলনায় এদের কাজ কম। হয়তো এরূপভাবে এখন চলবে—এ একটা stage (অবস্থা)—কালে সকলেই হিন্দুধর্ম নেবে। যথাসময়ে [রামকৃষ্ণ] মিশনের কাজ দেখা যাবে।”

দেশবিদেশের আচারের কথা উঠিয়াছে। মহারাজ বলিতেছেন,—‘য়ুরোপীয়েরা বাইরের পরিষ্কারটাই দেখে। ফ্রান্সে এক বড় হোটেলে স্নানের ব্যবস্থা আছে—ঘরে গিয়ে দেখি, একটা বহুকালের অব্যবহৃত টব ধবধবে তোয়ালে মণ্ডিত! টবের ভিতরটা মহা অপরিষ্কার।

“ওদের দেশে থুথু দ্বারা কখন কখন বাসন পরিষ্কার করে। জুতা ব্রাশ করবার সময় কালিতে জলের ভাগ কম থাকায় থুথু দ্বারা জলের অভাব দুর করচে দেখেচি। বাঙ্গলাদেশেই কেবল জলের ছড়াছড়ি। কাশ্মীর, রাজপুতানায় বালির দ্বারা বাসন সাফ হয়, জলের নাম নাই।

বৃন্দাবনের দিকে, হাগা ঘটি হাগা হাতে বালির দ্বারা মেজেই ইন্দারায় ফেলচে। হাতে মাটি দেয় না—কি নোংরা দেশ! হরিদ্বারে মেয়েরা ছাদের উপর শৌচাদি করে। মাড়োয়ারীদের নোংরাস্বভাব প্রসিদ্ধ।

"একএক দেশে একএক সময়ে মদ্যাদির খুব রেওয়াজ থাকে। রামায়ণে সীতাদেবীর মদমাংস মানত করার কথা আছে। মহাভারতে আছে, সঞ্জয় দূত হয়ে গিয়ে দেখেন, স্বয়ং কর্তা নেশায় বিভোর—মাথা দ্রৌপদীর কোলে, পা অর্জুনের কোলে।

"বেদে, সোমরস কেউ খেয়ে ফেল্লে তা শোধন করার মন্ত্র আছে। যজ্ঞকালে পুরোহিত সোমরস দেবতাকে উৎসর্গ করবার পূর্বেই হয়তো খানিকটা খেয়ে ফেলত। নতুবা, শোধনের মন্ত্র থাকবে কেন? ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি দেশ মদে ভাসচে। ওদিকে আবার আমেরিকায় অনেক Prohibition States (মদ্যপান-নিষেধাজ্ঞা-বিশিষ্ট প্রদেশ) রয়েচে। একএক যুগে নেশার অভ্যাস দেশময় ব্যাপ্ত, অতএব দোষের নয়। অন্যসময় অতিশয় গর্হিত কাজ।

"চিকাগো-সভায় কেউ কেউ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিল যে, স্বামিজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি নন—হিন্দুরা মদ, গোমাংস খায় না, কিন্তু তিনি খান। এসমস্ত কথা যখন হচ্ছিল তখন একজন ওদেশের লোক বলে, 'স্বামিজীর পূর্বপুরুষরা মদ, গোমাংস দুইই খেতেন—এ সত্য কথা, কিন্তু স্বামিজী ঐ দুটোর একটাও স্পর্শ করেন না!'

"রাজপুতানার রাজারা বন্যবরাহ শিকার করতে ভালবাসে, ঐ মাংসে তাদের বিশেষ রুচি। বন্যকুক্কুট অনেকস্থলে—শাস্ত্রেও—শুদ্ধ-মাংস বলে গণ্য। সজারু আর গোধা শুদ্ধ মাংস। কামাখ্যায় পায়রা বলি দেয়; বিন্ধ্যাচলে কুক্কুটবলি। বাঘও নাকি বলি-মধ্যে গণ্য! ভুবনেশ্বরের ওদিকে লোকে খুব ইঁদুর খায়—এমন কি, কাঁচা ইঁদুরের মাংস পর্যন্ত।"

মহারাজ একদিন রোমের কথা বলিতেছেন,—"পোপের palace-এর (প্রাসাদের) মধ্যে, যে সিঁড়ির সাহায্যে যীশু পাইলেটের বাড়ী ঢুকেছিলেন সেই সিঁড়ি রয়েচে। বিশেষ ভক্ত যাঁরা, তাঁরা হাঁটু গেড়ে ঐ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে থাকেন।

"পোপের প্রাসাদে রাফেল-অঙ্কিত সব ছবি যেন সদ্য আঁকা মনে হয়, খ্রীষ্টের লীলা সব আঁকা। Mosesএর (মুশার) প্রকাণ্ড মূর্তি। State carriage (রাজশকট) রয়েচে, ব্যবহার নাই। যখন পোপ একাধারে রাজা আর ধর্মমূর্তি ছিলেন, তখন ব্যবহার হত। বিশত্রিশ হাজার লোকের বসবার মত amphi-theatre (রঙ্গমঞ্চ) রয়েচে—সেখানে পশুর লড়াই, বিধর্মী বধ, মানুষে পশুতে লড়াই হত।

"একটি প্রটেষ্টাণ্ট ইংরাজ-মেয়ে blessings (আশীর্বাদ) পাবার সময় আর আর ক্যাথলিকদের সঙ্গে হাঁটু গেড়ে অপেক্ষা করছিল। পোপ মাথায় হাত দিয়ে প্রত্যেককে আশীর্বাদ করে যাচ্চেন, ঐ মেয়েটির কাছে এসে তাকে অন্য সকলের মত আশীর্বাদ করলেন না। তাকে হাত দিয়ে একটি ক্রস দেখিয়ে, পরবর্তী লোকটিকে পূর্ববৎ মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মেয়েটি পোপের লোক চেনবার অসাধারণ ক্ষমতার কথা আমাকে বলেছিল।

"ওদের মধ্যেও জন্মান্তরবাদ আছে। বাইবেলে দেখা যায়, প্রফেট এলাইজা John the Baptist (দীক্ষাদাতা জন) হয়ে এসেছিলেন। যীশু জন্মাবার আগেই, Messiah (ত্রাণকর্তা) শীঘ্রই আসচেন ঘোষণা করে, 'জন' বহুলোককে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ওদের দীক্ষা-ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়—বিশিষ্ট সাধুব্যক্তির নিকট নিজের দোষ অকপটে বলা আর উপদেশ নিয়ে সাধনভজন করা। ক্যাথলিকদের মধ্যে উপবাস খুব চলিত আছে। ওরা মালা জপে।

"সেকালে নীতিজ্ঞান কম ছিল। বেশ্যাবৃত্তি বা বেশ্যাগমন দোষের

ছিল না। সক্রেটিসের যত discourse (আলোচনা) বেশ্যাবাড়ীতেই হত। কারণ, সেখানেই অনেক পণ্ডিতলোকের সমাগম হত। আমাদের দেশেও প্রায় সেইরূপই। অনেক পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে এই দোষ অমার্জনীয়ভাবে রয়েচে। যেমন শঙ্খাসুর-কাহিনী। শঙ্খাসুর খুব বড় বীর, স্ত্রী খুব সতী। বিধান ছিল, যিনি ঐ স্ত্রীর সতীত্ব হরণ কববেন, তার হাতে শঙ্খাসুর বধ হবে। স্বয়ং বিষ্ণু অসুর-স্ত্রীর সতীত্ব হরণ করে শঙ্খকে নাশ করলেন। বিষ্ণুর কাণ্ডটা দেখে বিষ্ণুভক্তি থাকে কি? তবে এর আর একটি ব্যাখ্যা হতে পারে। বুদ্ধ, ধর্ম আর সঙ্ঘ—'সঙ্ঘ' থেকে 'শঙ্খ' অপভ্রংশ। সঙ্ঘকে শক্তিহীন করতে না পারলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কাটানো যায় না। তখন বৌদ্ধ ধর্মের পতন আরম্ভ হয়েচে, বিষ্ণু-অবতার সঙ্ঘের শক্তি হরণ করলেন। এটিই হয়তো শঙ্খাসুর-বধ কাহিনীর allegorical explanation (রূপক ব্যাখ্যা)। গয়াসুর-কাহিনী বুদ্ধদেবেরই কথা। গয়াসুর এত পবিত্র হয়ে উঠলেন যে তাঁকে দেখামাত্র লোক পবিত্র হয়ে যেত। দেবতারা ভয় পেলেন। তাঁর পবিত্র দেহের উপর যজ্ঞ করবার অভিপ্রায় দেবতারা প্রকাশ করলে গয়াসুর বল্লেন, 'তথাস্তু।' তাঁদের নিগূঢ় ইচ্ছা বুঝেই গয়াসুর চিরশয্যা গ্রহণ করলেন। একটা সর্ত করতে হয়েছিল,—'যেদিন পিণ্ড না পড়বে, সেইদিনই উঠব।' তাই পাণ্ডারা যাত্রী না এলে নিজেরাই পিণ্ড দেয়।"

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের কথায় মহারাজ কহিলেন, "শঙ্করাচার্য কখনই বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতির উপর কটাক্ষ করেন নাই, এখানে তিনি একান্ত উদার। তবে philosophy (দর্শন) নিয়ে আলোচনা কালে তিনি অদ্বৈতবাদ ঘোষণা করেছিলেন।

"বৌদ্ধধর্মে কর্মকাণ্ডের কথা বিশেষ নাই, জ্ঞানকাণ্ডের কথাই আছে। সিংহলের বৌদ্ধরা হীনযানী। ওরা আসল বৌদ্ধধর্মের অনুসরণ করে,

মূর্তিপূজাদি করে না। চীন, জাপান, তিব্বতে মহাযান-সম্প্রদায়। মহাযানীদের প্রধানগ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতা। গৃহস্থের জন্যে কয়েকটি নীতিকথা মাত্র বলে সন্ন্যাসীর জন্যে নির্বাণলাভের নানা stage (ক্রম) আর উপায় বর্ণিত হয়েচে। নির্বাণ-প্রাপ্তের লক্ষণসকলেরও উল্লেখ আছে।

"বৌদ্ধধর্ম সাধুসন্ন্যাসীর দিক থেকে দেখলে জ্ঞানপ্রধান; শান্তভাবের উপাসনা—সর্বেন্দ্রিয়নিরোধপূর্বক ধ্যান। গৃহস্থের পক্ষে ঐ ধর্ম—কর্মকাণ্ড।"

একজন ম—র একটি উক্তি উত্থাপন করিলেন।...মহারাজ শুনিয়াই বলিলেন, 'অমন কোন কথা স্বামিজী বলেচেন কিনা আমার জানা নাই। ম—র কথা এক গ্রেণ salt (লবণ) না দিয়ে, a few grains of salt (কয়েক গ্রেণ লবণ) দিয়ে নিতে হবে। সে কি যে বলে—বানিয়ে বলে, না কি, কে জানে!'

আলোকরশ্মির refractionএর (বক্রীভবনের) কথা হইতেছে। একখানি লাঠির কিয়দংশ জলের মধ্যে, অপরাংশ ঊর্ধ্বে—মনে হয় যেন লাঠিখানি ভাঙ্গিয়া দুইভাগ হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। মহারাজ বলিতেছেন, "Refractionএর (বক্রীভবনের) জন্যেই mirage বা মরীচিকা হয়। পুরীতে দেখেচি সমুদ্রটা যেন বেড়ে গিয়েচে। যেখানে হেঁটে বেড়ানো যায়, মনে হয় যেন সমুদ্র সেখানেও বেড়ে চলেচে। বালুর নিকটের বায়ু হতে যেন আগুনের শিখা উঠচে—যেমন কলকের উপর গরম টিকে থেকে আগুন উঠে।

"গুজরাটে ট্রেণে চলেচি, মাইলের পর মাইল রাস্তার ধারে জলরাশি, তার মধ্যে গাছপালার প্রতিবিম্ব! এতজল কোথা থেকে এল? পরে বুঝলুম এরই নাম মরীচিকা।

"জ্ঞানলাভের পর জগৎ এই মরীচিকাবৎ—থেকেও নেই, অর্থাৎ

অসার। যেমন, মরীচিকায় জল দেখা গেলেও লোকে ঠিক জানে, জল নেই, তেমনি নামরূপ থাকলেও ভ্রমজ্ঞান-জনিত বলে বোধ হয়।

"প্রথম, ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া চাই। নির্বিশেষ ব্রহ্মকে জানবার পর যখন পুনরায় মনবুদ্ধির এলাকায় আসতে হয়, তখন জগৎ ব্রহ্মজ্ঞ হওয়ার পূর্বে যেমন ছিল তেমনি প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু ওতে আসক্তি হয় না। ভ্রম দূর না হওয়ার পুর্বে লোকে মরীচিকাতেই জলপ্রত্যাশা রাখে; সম্যক জ্ঞান হলে মরীচিকা দেখে থাকে বটে, তবে জলের প্রত্যাশা ছেড়ে দেয়।

"Science (বিজ্ঞান) অনেক জিনিষের প্রতি আসক্তি কমিয়ে দেয়। ধর 'রং'এর ব্যাপার। বাস্তবিক কোন পদার্থেরই নিজস্ব রং নেই। সূর্য্যরশ্মিতে সাতটি মূল রং আছে; কোন বস্তুর উপরে সূর্যরশ্মি পড়লে সেই বস্তু ঐ সাতটি রঙের কতকগুলিকে আত্মসাৎ করে, আর কতকগুলিকে করে না। যেগুলি পরিত্যক্ত হয় তাদের দ্বারাই ঐ বস্তু রঞ্জিত হয়।

"আমরা সুন্দর রূপ দেখে মুগ্ধ হই। যে মূলনীতির উপর রূপের বাহার নির্ভর করে, সেদিকে লক্ষ্য করলে বস্তুর উপর থেকে আসক্তি উঠে যায়। কারণ, রূপের বাহার সূর্য থেকে প্রাপ্ত। এখন যেটিকে সুন্দর দেখছি, অবস্থাভেদে তার সৌন্দর্য লুপ্ত হতে পারে, আর হয়েও থাকে।

"অপর উদাহরণ 'স্পর্শ'। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের একটিমাত্র ইন্দ্রিয়—স্পর্শ। দেখা, শোনা, গন্ধ পাওয়া, জিহ্বার রসবোধ—এসবই স্পর্শ ছাড়া হয় না। গীতায়ও আছে,—যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ-যোনয় এব তে। একই শব্দ স্থানকালপাত্রভেদে নানাভাবে প্রতীত হয়।

"মন যখন অন্য ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে তখন শব্দ থেকেও না থাকার

সমান। স্বামিজীকে দেখেচি, যখন তিনি পড়তেন তখন তাঁর নিকট গোলমাল করলেও শুনতে পেতেন না।

"কাল মঠে muscle control (পেশীর সংযম) দেখালে। এ বাস্তবিকই অদ্ভুত। সংযত না থাকলে ঐ শক্তি লোপ পাবে। শরীরের উপর কতটা মন ওর দিতে হয়েচে। আমাদের দেশে আগে ঐসব ব্যাপার খুব ছিল। এমন সব নর্তকী ছিল যারা ইচ্ছামত হাতের গয়না কব্জীর গয়না নাচাতে পারত, অথচ হাত একেবারেই নড়ত না। শরীরের উপর মন সর্বদা দিলে ক্রমশঃ পতনই হয়।"

অনেক সুপণ্ডিত, তীক্ষ্নবুদ্ধি লোকও অনুপযুক্ত গুরুর আশ্রয় লয় দেখা যায়। তাহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া মহারাজ বলিলেন, 'সম্ভবতঃ যোগবিভূতি দেখে মুগ্ধ হয়। যারা প্রকৃতই ধার্মিক তাঁরা জ্ঞান ভক্তি যোগবিভূতি কিছুই লোককে দেখাতে চান না। গুরুকে খুব দেখেশুনে নিতে হবে। যোগীন-স্বামীকে ঠাকুর বলেছিলেন, গুরুকে রেতে দেখবি, দিনে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।'

একজন গন্ধি-বাবার গন্ধ দান করবার ক্ষমতার কথা কহিলেন। মহারাজ বলিতেছেন, "আমার বাবার নিকট হোসেন নামে এক ফকিরের কথা শুনেচি। তাকে কোন জিনিষ আনতে বল্লে সে ঘরের কোণে গিয়ে 'হস্‌রৎ হস্‌রৎ' বলে ডাকত। তখন উপর থেকে ধূলো বালি তার হাতের উপর পড়ত, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থিত বস্তুও আসত। নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য, অন্যান্য বস্তুও, সে আনতে পারত।...

"দক্ষিণদেশে ঘুরবার সময় স্বামিজী একজনের অলৌকিক শক্তির কথা শুনে, কিছু দেখাবার জন্যে তাকে পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু সে রাজী হয় না। পরে একদিন তার খুব জ্বর। জ্বর সারাবার জন্যে স্বামিজীকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। স্বামিজী ঠাকুরের নাম স্মরণ করে 'জ্বর সেরে যাবে' বলে দিতেই জ্বর ছেড়ে গেল। ময়লা এক-

খানা কাপড় পরে, চাদর গায়ে সে স্বামিজীর নিকট বসল। তারপর চাদরের নীচে থেকে নানাপ্রকার জিনিষ বের করতে লাগল। শেষে একঝোড়া শিশিরে ভেজা, সদ্যফোটা গোলাপফুল বেরিয়ে এল!

"ভূতানন্দেরও অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে থাকত। প্রাতে উঠে মণিরামপুর গিয়ে শৌচ করত। হাতে মাটি দিত কাঁকুড়গাছি এসে—আমরা দেখেচি। তারপর বিকালে ৪টার সময় অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে ১০।১৫ জনের উপযুক্ত খাবার খেত।...

"বাঘা নামে এক কুকুর মঠে ছিল। ভারী অত্যাচারী হওয়ায় তাকে একদিন মঠের নৌকায় পার করে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, সে খেয়া-নৌকায় পার হয়ে আবার মঠে এসেচে। মাঝি বল্লে,—কুকুরটিকে নামিয়ে দেবার যতই চেষ্টা করেচি, ততই সে ঘেউ ঘেউ করে কামড়াতে এসেচে। তারপর তাকে উড়াতাড়া না করায় চুপ করে বসেছিল।

"গ্রহণের দিন গ্রহণ লাগার অল্প পরেই বাঘা গঙ্গাস্নান করলে, আর গ্রহণ ছাড়তে সকলের আগে মুক্তিস্নান করে এল।

"সকলেই বাঘাকে ঢিল ছুঁড়ে মারত। স্বামিজী খুব ভোরে উঠতেন। উপরকার bath roomএ (স্নানঘরে) যাবার সময় কুকুরটা স্বামিজীর নিকটে এসে অতি কাতরস্বরে যেন কাকুতি মিনতি করতে লাগল। স্বামিজী বল্লেন, 'বাঘা বুঝেছিল যে আমি এদের সর্দার, আমি রাখলে অন্যে তাড়াতে পারবে না। তোরা ওকে আর কিছু বলিস না।' স্বামিজী অন্ধকারে বাঘার উপর পা দিয়েছিলেন, কিন্তু বাঘা কিছু বলে নি।

"যত সাহেব সুবো মঠে আসত, বাঘাই তাদের অগ্রগামী হয়ে নিয়ে আসত। তখন guest house (অতিথিশালা) ছিল না। সাহেব-সুবো ক্যাম্প ফেলে থাকত; বাঘা দিনরাত ওদের পাহারা দিত।

"একদিন মঠে আসচি, দেখি বাঘার মৃত শরীর জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। ভাবলুম, ও এতদিন মঠে রইল, ওকে মঠেই পুঁতে রাখলে ভাল হত। কিছুক্ষণ পরে দেখি, ভাঁটার টানে বাঘার শরীর মঠের ঘাটের নিকট ফিরে এসেচে। তখন তাকে মঠের ধারে গঙ্গাতীরে পুঁতে রাখা হল।'

৺পুরীর কথা

৺জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে কথা চলিয়াছে। মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—"এই মন্দির বৌদ্ধ-মন্দির। মধ্যে এর উপর শঙ্করাচার্যের প্রভাব ছিল, শেষে রামানুজের অধিকারভুক্ত হয়। খাওয়াছোঁয়া বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা বৌদ্ধ-প্রভাবের চিহ্ন। বিমলার মন্দিরে পূজার তিনদিন বলি দেওয়া, বিবিধ মনোহর বেশ করা—শঙ্করাচার্যের অধিনায়কত্বে তান্ত্রিক প্রভাবের চিহ্ন। এই মন্দির শঙ্কর-শিষ্যদের বিশেষ মঠ। গাড়ী গাড়ী বেলপাতা দিয়ে পূজার্চনা হত। সুভদ্রা-মূর্তি নামে, কিন্তু 'ভুবনেশ্বরী'-মন্ত্রে এঁর পূজা হয়। বুদ্ধ, ধর্ম আর সঙ্ঘ—'ধর্ম' স্ত্রীরূপে গৃহীত হত। সেইটিই ভুবনেশ্বরীরূপে—সুভদ্রা-নামে—চলচে।

"জগন্নাথের ভোগে ৫৬ রকমের জিনিষ ব্যবহৃত হয়। ভোগ নানাবিধ—(১) দৃষ্টি-ভোগ, (২) উষ্মা ভোগ, (৩) আত্মবৎ ভোগ। বৈষ্ণবমতে আত্মবৎ ভোগ। একজন লোকের খেতে যে সময় লাগে অন্ততঃ সেই সময়টা পর্যন্ত দরজা বন্ধ থাকে। ঐ মতে একই ভোগে নানা দেবতার ভোগ চলতে পারে। রাধারাণী, শ্রীকৃষ্ণ আর সখাসখীর ভোগ এক ভোগেই হয়—একটা ভোগেই দীর্ঘ সময় লাগে। দ্বিতীয় মতে ভোগের উষ্মা ভাগ [তেজ-অংশ, সার ভাগ] দেবতা গ্রহণ করেন।

"জগন্নাথের বিছানার নিকট পান্তাভাত, দই ইত্যাদি রাখা হয়, রাত্রিতে যদি ঠাকুরের খেতে ইচ্ছা হয়! 'দামোদর' প্রভুর একটি নাম।

"একবার একটা পাথর মন্দিরের পয়োনালী বন্ধ করে দিয়েছিল,

কিছুতেই আর পরিষ্কার করা যেত না। একটা বজ্রপাত হয়ে সেই পথ পরিষ্কার হয়ে গেল—এটি সত্য ঘটনা।

"জগন্নাথ-দাস নামে এক মহাত্যাগী ভক্তের সঙ্গে জগন্নাথের লীলা-খেলার অনেক কাহিনী আছে। ঐ সাধুর আমাশয় হয়েচে—স্বয়ং জগন্নাথ তাঁকে শৌচ করিয়ে দিচ্ছেন। তা দেখে সাধু বলচেন,—'কেনই বা রোগ দেওয়া, কেনই বা এ কষ্ট করা!' একদিন ঐ সাধুকে সঙ্গে নিয়ে নিকটে এক বাগানে ফল-চুরির উদ্দেশ্যে গমন; তাড়া খেয়ে সাধুকে রেখে জগন্নাথের পলায়ন। 'ভাল রে ভাল, আমাকে ফুসলে এনে বিপদে ফেলে নিজে পলায়ন!' তাড়াতাড়িতে প্রভু ওড়না ফেলে এসেছিলেন।

"আমাদের ঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসবের মত অত বড় অন্নকূট ভারতের কোথাও নেই। জগন্নাথক্ষেত্রে প্রসাদ বিতরণের আয়োজন অবশ্য অদ্ভুত। ছত্রিশ জাতির ছোঁয়ামেলা, অথচ সকলেই ভক্তিভরে প্রসাদ নিচ্চে!

"এই ঠাকুর প্রথম শবরদের ছিলেন। বনে জঙ্গলে লুকিয়ে ওরা তাঁর পুজা করত। পরে এক ব্রাহ্মণ সন্ধান পেয়ে ওদের সঙ্গে মিশে তাদের এক মেয়ে বিয়ে করে। তারা লোকটির পীড়াপীড়িতে চক্ষু বেঁধে তাকে ঠাকুরের স্থানে নিয়ে গিয়ে ঠাকুর দেখায়। সে কৌশলে কাপড়ে সরষে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল আর সেই সরষে পথে ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছিল। পরে সে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে সঙ্গে নিয়ে, সরষে-গাছ লক্ষ্য করে ঠাকুরের স্থানে পৌছে দেখে,—ঠাকুর ভূমিকম্প হওয়ায় অদৃশ্য হয়েচেন! ভক্ত-রাজার কাতর প্রার্থনার ফলে দৈববাণী হল,—'চক্রতীর্থে সমুদ্রতরঙ্গে যে কাষ্ঠ ভেসে আসবে, তদ্দ্বারা মূর্তি গড়িয়ে প্রতিষ্ঠা করলে তাতে আমি আবির্ভূত হব।'

"সত্যই কাঠ ভেসে এল, কিন্তু এত শক্ত যে ভেদ করা অসম্ভব।

তখন বিশ্বকর্মা ছদ্মবেশে মূর্তি গড়বার ভার নিলেন। চুক্তি রইল, —যে ঘরে মূর্তি গড়া হবে, সেই ঘরের দরজা বন্ধ থাকবে, মূর্তি গড়া শেষ হলে খোলা হবে। তার আগে কেউ ঘরে ঢুকলে মূর্তি যতদূর গড়া হয়েচে সেইরূপই থাকবে। দুইএক দিন ঠুকঠাক শব্দ শোনা গেল, তারপর পনরদিন কাজের কোনই সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। রাজা কারিকর মরে গেচে মনে করে, দরজা খুলে দেখেন, কারিকর সেখানে নেই, মূর্তিও অসম্পূর্ণ। এমন সময় বিশ্বকর্মা উপস্থিত হয়ে বল্লেন, 'তুমি অত ব্যস্ত হলে কেন? আমি বিশ্বকর্মা, দুচার দিনেই মূর্তি সম্পূর্ণ করে দিতুম।' দৈবাদেশে, ঐ অসম্পূর্ণ মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করা হল। স্কন্দ-পুরাণের 'সূত-সংহিতায় এই কাহিনীটি রয়েচে।

"কিন্তু আসল কথা ও নয়। বুদ্ধ, ধর্ম আর সঙ্ঘ—এই তিন symbol (প্রতীক) ঐ তিন মূর্তি। অক্ষয় দত্তের 'উপাসক-সম্প্রদায়ে' এবিষয়ে বেশ বর্ণনা আছে। কত ঝড় ঐ মন্দিরের উপর দিয়ে গেচে।

" 'সূর্যনারায়ণ' নামে একখানা পাথর পাণ্ডারা দেখায়। খুব নিরীক্ষণ করে দেখলে দেখবে, আর একটি প্রকাণ্ড পাথরকে ঢাকা দিয়ে ঐ পাথর দাঁড় করানো হয়েচে। আমরা যখন প্রথম যাই, তখন 'সূর্যনারায়ণই দেখেছিলুম। পরে একখানা বই পড়ে আসল বিবরণ অবগত হলুম। দ্বিতীয়বার গিয়ে বাস্তবিকই সূর্যনারায়ণের পেছনে বুদ্ধমূর্তি দেখলুম।

"বৌদ্ধ-প্রভাবের পরে শৈব-প্রভাব। মূর্তি-তিনটির পাশে একটি কুকুরের মূর্তি ছিল, বৈষ্ণবদের সময় সেটি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু দেয়ালে একটি কুকুরের মূর্তি আঁকা আছে। শৈব-সন্ন্যাসীদের হাতেই মন্দির-পরিচালনার ভার ছিল। বহু সন্ন্যাসী মন্দিরেই বাস করত। বৈষ্ণব-প্রভাবের সময় ওরা গোবর্ধন-মঠে আশ্রয় নিলে। পাণ্ডারা আজ তিলক কণ্ঠী ধারণ করে, কিন্তু অনেকেই শক্তি-মন্ত্রের উপাসক। এখন জগন্নাথের পুজা 'গোপাল'-মন্ত্রে ['নৃসিংহ'-মন্ত্রে?] হয়।"

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—গ্রহণের সময় পুরশ্চরণাদির বিধান রয়েচে কেন ?

উত্তর—একটা অস্বাভাবিক, অলৌকিক ঘটনায় মানুষ চিন্তান্বিত হয়। গ্রহণাদি-ব্যাপার প্রকৃতির পরিবর্তন আনে, তাকে সন্ধিক্ষণও বলা যায়। প্রকৃতির এক অবস্থা চলে গিয়ে আর এক অবস্থাপ্রাপ্তির ব্যবধানে মন অনেকটা শান্ত থাকে। এজন্যে ঐ কাল জপধ্যানের পক্ষে প্রশস্ত।

প্রঃ—কুণ্ডলিনী-শক্তিকে সর্পাকৃতি কল্পনা করি কেন? উঃ—ঠিক কারণ বলা যায় না। বহুজন্মের সংস্কার স্তূপীকৃত হয়ে আছে—মনে করা যায় যেন সাপের ভীড়ের মত। অথবা, যখন কুণ্ডলিনী জাগেন, তখন সাপ যেভাবে এঁকেবেঁকে চলে সেরূপভাবে উঠেন।

প্রঃ—ঠাকুরকে কেন অবতারবরিষ্ঠ বলা হয়? উঃ—একঘেয়ে নয় —সকল temperament suit করে (সকল প্রকৃতির উপযোগী)। অন্য অবতারের সঙ্গে তুলনা হচ্চে না, প্রকাশ নিয়ে বিচার। এই অবতারে প্রকাশ অধিক।

প্রঃ—নিরাকার-ধ্যান কাকে বলে? উঃ—ভূতশুদ্ধির সময় সহস্রারে যে পরমাত্মার ধ্যান হয়, সেইটিই ঠাকুরের নিরাকার-ধ্যান।

প্রঃ—জপধ্যান ভাল লাগে কি প্রকারে? উঃ—অভ্যাসের ফলে। সাত্ত্বিকসুখের লক্ষণ জান তো?—অভ্যাসাৎ রমতে যত্র।

প্রঃ—শুধু মন্ত্রজপ দ্বারা—অর্থবোধ না করে বা একাগ্রমনে না করে—সিদ্ধিলাভ হয় কি? উঃ—তন্ত্রে তো বলেচে 'জপাৎ সিদ্ধিঃ।' হয় বৈকি।

প্রঃ—দুর্গা-প্রতিমায় সরস্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি মূর্তি জুড়ে দেবার প্রথা কবে থেকে হল? উঃ—পূজাবিধিতে বরাবরই ঐসব দেবদেবীর কথা আছে। ওঁরা প্রতিমারূপে না থাকলেও ওঁদের পূজার ব্যবস্থা রয়েচে। [সান্যাল মহাশয় বলিলেন, 'রাজা গণেশের সময় জুড়ে দেওয়া হয়।']

প্রঃ—বর্ণাশ্রম-ভেদ কি গুণগত না জন্মগত? উঃ—গুণ আর কর্ম এ দুটিই দেখতে হবে। জন্মগত জাতি দ্বারা বর্ণাশ্রম নির্ণীত হয় না। জ্যোতিষে ব্রাহ্মণবর্ণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ ইত্যাদি বলা হয়েচে। এ বর্ণ পিতামাতা বা জাতির উপর নির্ভর করে না। ধাতু, কাষ্ঠ ইত্যাদির মধ্যেও বর্ণ-ভেদ আছে। বর্ণভেদ সর্বত্র। Heredityর (বংশানুক্রমিকতার) কিছু প্রভাব থাকতে পারে—একথা অবশ্য অস্বীকার করা চলে না।

প্রঃ—শরীরের কোন অংশবিশেষে কি মনের অবস্থান? উঃ—শিরদাঁড়ার মধ্যে ভ্রূমধ্য-চক্র থেকে নাভিচক্র পর্যন্ত স্থানে মনের বাস।

প্রঃ—মন কি কতকগুলি nervesএর সমষ্টি? উঃ—না। nerves (স্নায়ুসমষ্টি) থেকে সূক্ষ্ম পদার্থ। দেহপাত হলে nerves (স্নায়ুসকল) পড়ে থাকে, কিন্তু মন দেহীর সঙ্গে চলে যায়। নাভিচক্র, হৃদয়পদ্ম, কণ্ঠ আর ভ্রূমধ্যস্থিত পদ্মে মনের বিভিন্ন কাজ হয়। ঐ সবই মনের modifications (অবস্থাভেদ)। সমস্ত impression (সংস্কার) ভিতরে রয়েচে; তারই নাম চিত্ত বা mind-stuff. বাহ্যজগৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিতরে নীত হলে যে vibration (আন্দোলন) হয়, অর্থাৎ এটি কি ঐটি ইত্যাকার সঙ্কল্প-বিকল্প—সেটি মনের এক অবস্থা। নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বা বুদ্ধি দ্বিতীয় অবস্থা। অহঙ্কার তৃতীয় অবস্থা।

প্রঃ—তন্মাত্রা কাকে বলে? উঃ—রূপরসাদির বোধ বা সম্যক স্ফুরণ কতকগুলি সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম stage বা অবস্থার মধ্য দিয়ে fully developed (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) হয়। ঐ অতিসূক্ষ্ম ভাবের নাম তন্মাত্রা।

প্রঃ—দ্রষ্টা এবং সাক্ষীর মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি? উঃ—সাক্ষী একেবারে impassive (উদাসীন) অবস্থা। দ্রষ্টা আর সাক্ষী কখন কখন একার্থবোধক। সাধারণতঃ দ্রষ্টৃভাবে যেন কিছু interest (কৌতূহল) আছে। আত্মস্থ অবস্থায় মনের লোপ হয়।

প্রঃ—শুধু কর্মের দ্বারা ভগবান লাভ হয়েচে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কি? উঃ—নিষ্কাম-কর্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে জ্ঞান বা ভক্তির উদয়। জ্ঞান আত্মায় স্বভাবতই রয়েচে, চাপা পড়ায় প্রকাশ পাচ্চে না। চাপা সরিয়ে দেওয়া নিষ্কাম-কর্মের কার্য। মহাভারতে, পতিব্রতা রমণী যিনি সাধুকে ধর্মব্যাধের নিকট পাঠিয়েছিলেন, তিনি পতিসেবা-কর্ম দ্বারাই জ্ঞানলাভ করেছিলেন। কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। একজন নয়, 'জনকাদয়ঃ' শব্দ রয়েচে।

প্রঃ—'কর্ম' শব্দের অর্থ কি জপতপ? উঃ—না। তা হলে অর্জুনকে তো শ্রীকৃষ্ণ ঘণ্টা নাড়তেই বলতেন। তা না করে মহাযুদ্ধে লাগালেন।

প্রঃ—অর্জুন কি 'অহং'-জ্ঞানশূন্য হয়ে, ভগবচ্চালিত হয়ে কর্ম করেছিলেন? উঃ—তা নয় তো কি? বিশ্বরূপ-দর্শনের পরেও যদি 'অহং' থাকে, তবে আর কি হল? 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা' ইত্যাদি তো আছেই।

প্রঃ—'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা'—এই শ্লোকে 'স্মৃতি' শব্দের অর্থ কি? উঃ—গুরুর উপদেশ, শাস্ত্রের উপদেশ বিস্মরণ হয়েছিল। যে-সকল নীতি অবলম্বন করে অর্জুন আপনাকে উন্নীত করেছিলেন, মোহবশতঃ সেসব ভুলে গিয়েছিলেন। ভয়, ভালবাসা, ভক্তি ইত্যাদি মিলে অর্জুনের মোহ জন্মেছিল। এইটিই সহজ অর্থ। অদ্বৈতবাদীরা 'স্মৃতি' অর্থে 'আত্মজ্ঞান' বুঝিয়েচেন; তাঁরাও বেশ অর্থ লাগিয়েচেন।

প্রঃ—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'—এখানে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ কি? উঃ—ধর্ম—যাগযজ্ঞাদি কর্ম, পুরশ্চরণ, জপ ইত্যাদি। তিলকের মতে, ধর্ম—মহাভারতোক্ত পিতৃমাতৃ-সেবা, অতিথি-সেবা ইত্যাদি। এই অর্থ পরিত্যাজ্য, যেহেতু ঐসকল উপায় অবলম্বন করে অনেকে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিলক একদিক ঘেঁষা হয়ে কর্মযোগই গীতার প্রতিপাদ্য, ইহা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেচেন। গীতায় পুরুষ-

কারের ভারী প্রশংসা, ঐ পুরুষকারেরও যে সীমা আছে সে কথা এই শ্লোকে ইঙ্গিত করচেন।

অনেক শব্দের অর্থ বদলে গেচে। যেমন, কৃপণ = কৃপার পাত্র। কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ = দৌর্বল্য আমাকে কৃপার পাত্র করে আমার স্বভাব বদলে দিয়েচে।

প্রঃ—'পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ' ইত্যাদির অর্থ কি? উঃ—অপরে যদি তার ধর্ম উত্তমরূপে পালন করায় ফলে আনন্দ বা প্রশংসা পায় দেখ, তাতে তার পথ অবলম্বন করার ইচ্ছা তোমার হতে পারে। এরূপ করলে ক্ষতি হবে।

কর্মযোগ প্রথম ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই ছিল। গীতাতেই রয়েচে,—ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।

১৩৩৪ সালের স্নানযাত্রা। কেবলমাত্র মহারাজ ঘরে আছেন। সুযোগ বুঝিয়া, নিজের কথা বলিবার অনুমতি চাহিতেই কহিলেন, 'বল'।

প্রঃ—আমাকে যা সব করতে বলেচেন—কুণ্ডলিনী-জাগরণ, ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি—সেসব করচি, কিন্তু তেমন সরস হয় না। অনেক সময়েই mechanical (প্রাণহীন) হয়ে পড়ে। এর কি করি? উঃ—প্রত্যহ একই জিনিষ নিয়ে থাকলে কতকটা mechanical (প্রাণহীন) ভাব এসেই পড়ে। যেদিন যে সাধনটি ভাল লাগবে সেদিন অপর সাধনাংশ বাদ দিয়ে ঐটিই নিয়ে থাকবে। এরূপ করলে হয়তো তুচার দিন একটি সাধন বাদই থাকবে। পরে দেখবে, সেটি করতে গিয়ে সরসতা এসেচে। ধ্যানচিন্তা করবার আগে ঠাকুরকে বেশ করে ভেবে নেবে। তা হলে যা করবে তাই ফলপ্রসূ হবে। কখনো ভাববে, তিনি সর্বত্র সর্বঘটে আছেন—তাঁর মধ্যে ডুবে আছ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্—এই ভাবটা চিন্তা করবে।

তিনি তোমার সকল খবর জানেন, অতি গোপনভাবও তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে না। নিষ্ঠা আর অভ্যাসের ফল অবশ্যই পাওয়া যায়। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সাধন করলে মনের শক্তি বাড়ে, করতে করতে জিনিষও সরস হয়।

প্রঃ—ঠাকুরের বিষয় অনেক শুনেছি, অথচ ঠাকুরের লীলা স্মরণ করলে তাঁকে জীবন্ত বোধ হয় না—কি করি ? উঃ—কোন কিছু সরস করতে হলে heart and brain (হৃদয় ও মস্তিষ্ক)—দুয়ের সহ-যোগিতা থাকা চাই। কেবলমাত্র brainএর (বুদ্ধিবৃত্তির) আশ্রয় নিলে জিনিষ প্রাণশূন্য হয়ে পড়ে।

প্রঃ—কল্পনা-শক্তির অভাবেই কি এরূপ হচ্চে ? উঃ—ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রঃ—পূর্বে চাকরি ছেড়ে একান্তে ভজনসাধন করবার জন্যে মন ব্যাকুল হত। এখন সে ভাবটা একেবারেই নাই। তবে জপধ্যানে, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠে মন অধিক আকৃষ্ট হচ্চে। আগের মত ব্যাকুলতা এখন আসচে না কেন ? উঃ—তা নাই বা এল। শাস্ত্রে আছে, কোন কর্মের মধ্যে থেকে সাধনভজন করতে করতে যদি জ্ঞানলাভ হয়, তা হলেও সাধক অভ্যস্ত কর্ম ছাড়েন না। ধর্মব্যাধের কথা তো জান ? মাংসবিক্রয়রূপ হীন কাজকেও তিনি জ্ঞানলাভের পরেও হীন বা ত্যাজ্য মনে করেন নাই। তাঁর দিকে মন যখন রয়েচে, তখন অবস্থা-পরিবর্তনের আবশ্যকতা কি ? তাঁর ইচ্ছা ছাড়া যখন কিছুই হবার নয়, তখন নিজে মতলব না করে তাঁর উপর নির্ভর করা ভাল। তিনি যেমন ঘটাবেন নিজেকে তেমনি লাগাবে। তা ছাড়া, অন্য environmentএর (আবেষ্টনীর) মধ্যে পড়লে আবার নিজেকে adjust করতে (খাপ খাওয়াতে) বেগ পেতে হয়।

প্রঃ—বরাবরই দেখচি, ক্লাশে কেবল বক্তৃতা করে গেলে

কর্তব্যহানি হয়। ছেলেদের স্বাস্থ্যের, চরিত্রগঠনের জন্যে যত্ন নেওয়া আবশ্যক। এজন্যে অনেকটা সময় ঐ কাজে চলে যায়। তার ফলে ধ্যানকালে ছেলেদের কথা—কিসে তাদের কল্যাণ হয় মনে আসে। উঃ—তা তো আসবেই। তবে বৎসরে ছুটির দুইএক মাস সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কেবল ভগবচ্চিন্তা নিয়ে থাকতে হয়। তা হলে সব দিকই বজায় থাকে।

কর্মযোগের কথায় মহারাজ বলিতেছেন,—'ফলে তোমার অধিকার নাই। অর্থাৎ অনেক factorএর (কারক-ব্যাপারের) উপর কর্মের ফল নির্ভর করে, তোমার চেষ্টা একটিমাত্র factor (কারক)। একটি factor (ব্যাপার) সুসম্পন্ন হলেও অপরগুলির যোগাযোগ না ঘটলে কার্যসিদ্ধি হয় না। যেমন ধর,—একটি ছেলে বেশ উত্তর দিয়েচে। পরীক্ষক সাংসারিক কাজে উদ্বিগ্ন, এমন সময় কাগজ দেখার ফলে ছেলেটি ফেল হয়ে গেল। এখানে ছেলের কৃতকার্যতা কেবল তার চেষ্টা বা উদ্যমের উপরই নির্ভর করে না। এজন্যে নিজের কর্তব্য ষোল আনা করে, কি ফল হবে না হবে তাতে খেয়াল না দিয়ে, নিশ্চিন্ত থাকার অভ্যাসকেই কর্মযোগ বলে। ফলের আকাঙ্ক্ষা করলেই worries (উদ্বেগ) আসবে।'

প্রঃ—'সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী' শব্দে কি সকল কর্মত্যাগ বুঝায়? না 'অহং'-বোধ-শূন্য হয়ে কর্ম করা বুঝাচ্চে? উঃ—প্রাপ্ত-কর্তব্য যথাসাধ্য করে যাও। তা করতে গিয়ে নানারূপ plans (জল্পনা-কল্পনা) বা চেষ্টা তো হবেই। কিন্তু অন্য কাজ জুটিয়ো না। গায়ে পড়ে জোটানো দোষের। আর দেখাই যায়, কতকগুলি কাজের ভার নিয়ে কোনটাই ভাল করে করা যায় না।

মহারাজের সঙ্গে এই আমার শেষ আলোচনা।

শ্রীগুরুদাস গুপ্ত

শ্রীশ্রীসারদা দেবী

"এই গ্রন্থ মায়ের সর্বোত্তম জীবনীরূপে চিরকাল গণ্য থাকিবে। অবতার সম্বন্ধে এইরূপ গ্রন্থ লেখা তাঁর বিশেষ কৃপা ছাড়া সম্ভব হয় না।"—স্বামী প্রেমেশানন্দ।

"As a biography of authentic information the book is indeed a leading one and no praise is too much for it."—**Amrita Bazar Patrika.**

শ্রীশ্রীসারদামঙ্গল

"This handy volume treats of the principal events of Holy Mother's life beautifully depicted in simple Bengali verse. Ramkrishna said of Holy Mother: "She is Sarada, Goddess of learning, incarnated to impart knowledge". The author is Her direct disciple and that he inherits Her gift of 'knowledge' is evident from his skilful setting and knitting of facts in the most concise form. This precious attempt is the first of its kind and its plainly alluring style will, no doubt, facilitate an easy access into every hearth and home of Bengal."—**Hindusthan Standard.**

বাঙ্গলার দুই ঠাকুর

"উভয় অবতার-পুরুষের জীবন, সাধনা ও মত এইগুলির সামঞ্জস্য দেখাইতে গ্রন্থকার উভয়ের সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রায় সকল গ্রন্থ হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। যেভাবে তিনি উভয়ের জীবনের ঘটনার অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয়।...গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারশক্তি সমান প্রশংসার যোগ্য।"—**শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য** (আনন্দবাজার পত্রিকা)।
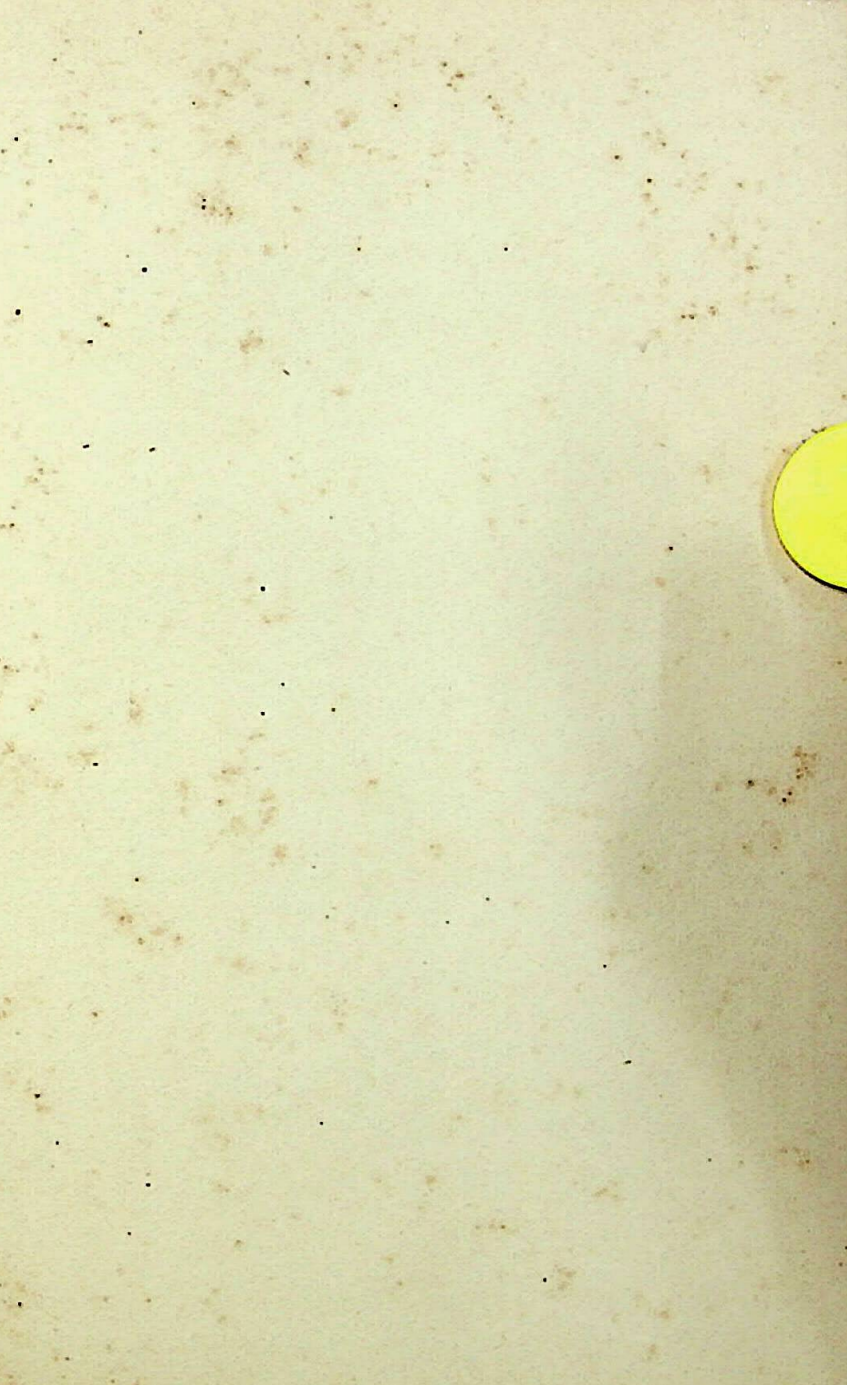
গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

১। শ্রীশ্রীসারদা দেবী (৪র্থ সংস্করণ) ... ৫৲

[সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য-লিখিত একমাত্র সম্পূর্ণ জীবনী—আদি ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক]

২। ছোটদের শ্রীসারদাদেবী (৩য় সংস্করণ) ॥৵৹

৩। শ্রীশ্রীসারদামঙ্গল ... ২৲

[সরলমধুর ছন্দে লেখা শ্রীশ্রীমার একমাত্র জীবনলীলা]

৪। স্বামী সারদানন্দের পত্রমালা (২য় সংস্করণ) ২৲

[জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-পথের সাধনরহস্য-মঞ্জুষাস্বরূপ]

৫। বাঙ্গলার দুই ঠাকুর ... ২॥৹

[শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার অন্তর্নিহিত অভিন্নত্ব—সাধনায়, সমন্বয়ে, স্বরূপপ্রকাশে]

৬। বাঙ্গলার তীর্থ-পরিক্রমা .... ২॥৹